প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

সোনার সিংহাসন সিয়োভরের রত্নভাণ্ডার মৃত্যুসাগরে ফ্রান্সিস সুলতান হানিফের রত্নভাণ্ডার
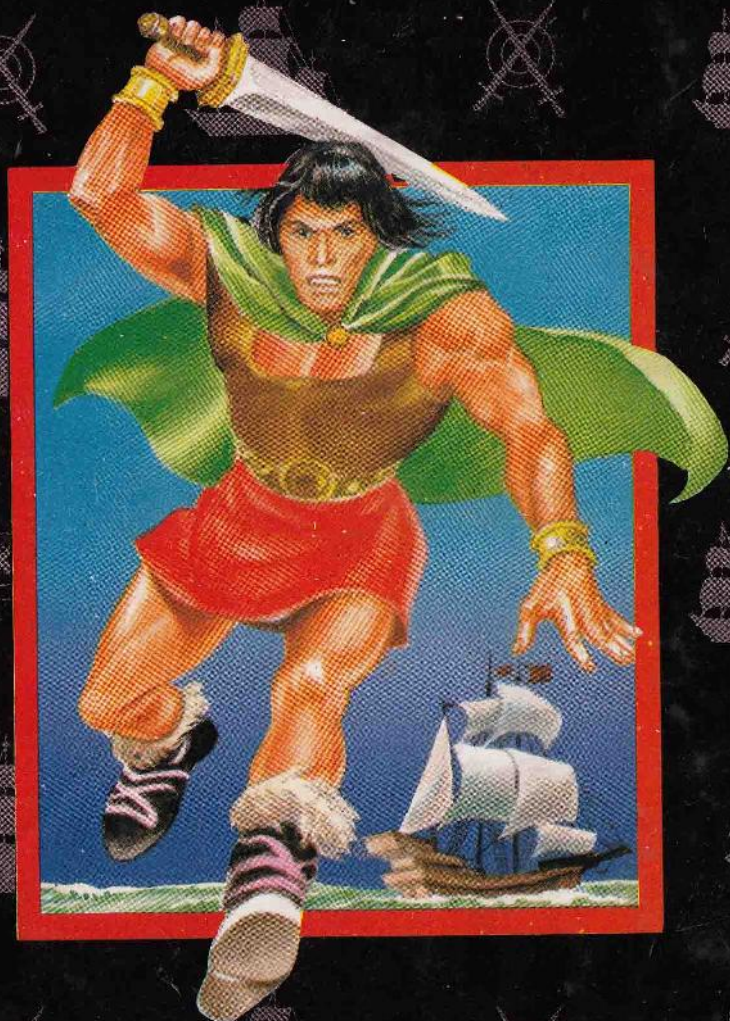
ফ্রান্সিস সমগ্র (৮)

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

FRANCIS SAMAGRA PART 8
By Anil Bhowmick
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রথম প্রকাশঃ

জানুয়ারী ২০০৫

পরিবেশক ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬৩। শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণে ঃ
ইন্দ্রলেখা প্রেস

একশত টাকা মাত্র
Rs. One hundred ten Only

ISBN 81-7334-122-2

আজকের দিনে যে জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর পরেই তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।''

রবীন্দ্রনাথ

নেশা সাহিত্য হলেও পেশায় শিক্ষক আমি। ছাত্রদের কাছেই প্রথম বলতে শুরু করি দুঃসাহসী ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের গল্প। দেশ, কাল, মানুষ সবই ভিন্ন, তবু গভীর আগ্রহ নিয়ে ছেলেরা সেই গল্প শুনতো। তখনই মাথায় আসে-ফ্রান্সিসদের নিয়ে লিখলে কেমন হয়। ''শুকতারা'' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদারকে একটা পরিচ্ছেদ লিখে পড়তে দিই। উনি সেটুকু পড়ে খুশী হন। তাঁরই উৎসাহে শেষ করি প্রথম খণ্ড ''সোনার ঘন্টা''। ''শুকতারা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভা বে প্রকাশিত হয় সেটা। পরবর্তী খণ্ড ''হীরের পাহাড়''ও ''শুকতারা''তেই প্রকাশিত হয়। পরের খণ্ডগুলো প্রকাশের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন 'উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির'-এর কর্ণধার কিরীটিকুমার পাল। উভয়ের কাছেই আমি ঋণী।

ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের দুঃসাহসিক অভিযানের সমগ্র কাহিনী একটি বইয়ের মধ্যে পেয়ে কিশোর কিশোরীরা খুশী হবে, এই আশাতেই ''ফ্রান্সিস সমগ্র'' খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অক্টোবর ২০০৫

অনিল ভৌমিক

এই লেখকের কয়েকটি বই

সোনার ঘণ্টা
হীরের পাহাড়
মুক্তোর সমুদ্র
তুষারে গুপ্তধন
— ফ্রান্সিস সমগ্র—১ম

রূপোর নদী
মনিমানিক্যের জাহাজ
বিষাক্ত উপত্যকা
চিকামার দেবরক্ষী
— ফ্রান্সিস সমগ্র—২য়

চুনীপান্নার রাজমুকুট
কাউন্ট রজারের গুপ্তধন
যোদ্ধামূর্তি রহস্য
রানীর রত্নভাণ্ডার
— ফ্রান্সিস সমগ্র—৩য়

যীশুর কাঠের মূর্তি
মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস
চার্লসের স্বর্ণসম্পদ
রূপোর চাবি
— ফ্রান্সিস সমগ্র—৪র্থ

ভাঙা আয়নার রহস্য
সম্রাটের রাজকোষ
রত্নহার উদ্ধারের ফ্রান্সিস
রাজা ওভিড্ডোর তরবারি
— ফ্রান্সিস সমগ্র—৫ম

চিচেন ইতজার রহস্য
পাথরের ফুলদানি
স্বর্ণখনির রহস্য
হীরক সিন্দুকের সন্ধানে
— ফ্রান্সিস সমগ্র—৬ষ্ঠ

সোনার ঘর
শায়িত দেবতাদের মন্দির
গর্ভগৃহে ধনভাণ্ডার
রাজা আলফ্রেডের স্বর্ণখনি
— ফ্রান্সিস সমগ্র—৭ম

সোনার সিংহাসন
সিগোভরের রত্নভাণ্ডার
মৃত্যুসাগরে ফ্রান্সিস
সুলতান হানিফের রত্নভাণ্ডার
— ফ্রান্সিস সমগ্র—৮ম

ফ্রান্সিস সমগ্র ১-৮

[illegible]

সোনার শেকল
সর্পদেবীর গুহা
মেরীর স্বর্ণমূর্তি
হাতিপাহাড়ের গুপ্তধন
[illegible]
[illegible]

সোনার সিংহাসন

অনিল ভৌমিক

সন্ধ্যে থেকেই বাতাস পড়ে গেছে। আকাশে গভীর কালো মেঘ জমছে অনেকক্ষণ থেকেই। ফ্রান্সিসরা ঝড়ের পূর্বাভাস ভালোই বোঝে। সন্দেহ নেই ঝড় বৃষ্টি হবে। ওরা সাবধান হল। জাহাজের পালে হাওয়া নেই। পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের কাছে এল। সঙ্গে সিনাত্রা। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় টোকা দিল। মারিয়া দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আকাশের অবস্থা ভালো নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় আসছে। কী করব? ফ্রান্সিস একটু ভাবল। বলল—একেবারেই সময় নষ্ট করা চলবে না। সবাইকে রাতের খাবার খেয়ে নিতে বলো। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ফান্সিস বলল—চলো। ডেক-এ যাবো।

—তাহলে ঝড় বৃষ্টি হবে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। সিনাত্রা বলল।

মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফান্সিসরা সিঁড়িঘরের দিকে চলল। ডেকএ উঠল। বন্ধুরা ভিড় করে এল। ফ্রান্সিস চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ঝড়ের পূর্বাবস্থা। দক্ষিণ দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হয়েছে। ভেজা হাওয়া ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস বলল—দূরে নিশ্চয়ই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। বেশি দেরি করা চলবে না।

তখনই মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রোর চড়াগলা শোনা গেল—ভাইসব—সাবধান—ঝড় আসছে। ফ্রান্সিস ডেক থেকে গলা চড়িয়ে বলল—দড়িদড়া ধরে ধরে পেড্রো নেমে এসো। একটু পরেই মাস্তুলের দড়িদড়া ধরে ধরে পেড্রো নেমে এল। পেড্রো পশ্চিমদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐদিকে ডাঙ্গা দেখেছি! তবে মাটি জঙ্গল আর পাহাড়ের মত কিছু।

—ফ্রান্সিস এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল। চারদিকে জড়ো হওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমরা পাহাড়ের দিকেই জাহাজ চালাবো।

—কিন্তু পাহাড়ের ধাক্কা লেগে—হ্যারি আর কথাটা শেষ করল না।

—উপায় নেই। ঝড়ের প্রচন্ড ঝাপটা থেকে বাঁচতে ঐ পাহাড়ের আড়ালে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তাহলে ফ্রেজারকে বলো। হ্যারি বলল। তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব সবাই রাতের খাবার খেয়ে নাও—যত তাড়াতাড়ি পারো। এবার ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে গেল। ফ্রেজার এদিক ওদিক হুইল ঘোরাচ্ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—ঝড় আসছে। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ফ্রান্সিস পশ্চিমদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐদিকে আবছা একটা পাহাড়ি এলাকা দেখা যাচ্ছে। ঐদিকেই জাহাজ চলাও। কাছাকাছি গিয়ে দেখা যাক ওটার আড়ালে জাহাজ ভেড়ানো যায় কিনা। এছাড়া ঝড় এড়ানোর অন্য কোন উপায় নেই।

ফ্রেজার জাহাজের মুখ ঘোরাল। জাহাজ চলল আবছা-দেখা পাহাড়ী এলাকার দিকে। ফ্রান্সিস ভুরু কুঁচকে দেখল—পাহাড়গুলোর মধ্যে মাঝেরটা বেশ উঁচু। অন্যগুলো ততটা উঁচু নয়। ওখানে কাছাকাছি গিয়ে বোঝা যাবে কোথাও আড়াল পাওয়া যায় কিনা।

ওদিকে বন্ধুরা সব তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেতে শুরু করল। ফ্রান্সিসও মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে খাবার ঘরে চলল। শাঙ্কো ততক্ষণে খেয়ে নিয়েছে। ও এসে হুইল ধরল। ফ্রেজার খেতে গেল। জাহাজ দুলতে দুলতে চলল পাহাড়ী এলাকার দিকে।

ততক্ষণে মাথার ওপর আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়ার গুরুগম্ভীর শব্দ।

সবারই রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গেল। সবাই ছুটোছুটি করে দ্রুত সব পাল নামিয়ে ফেলল। মাস্তুলের পালের কাঠামোর হালের দড়িদড়া টেনে ধরতে ধরতেই প্রচন্ড ঝড় জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। বেশ কয়েকজন ভাইকিং ছিটকে ডেকএর উপর পড়ে গেলো। অবশ্য পরেক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে জাহাজের দড়িদড়া টেনে ধরল। তখনই শুরু হল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। তারপরই মুষুলধারে বৃষ্টি শুরু হল। চারদিক যেন একটা সাদাটে আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেল। ঝড়বিক্ষুদ্ধ সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজ একবার ঢেউয়ের মাথায় ওঠে পরক্ষণেই ঢেউয়ের ফাটলে আছড়ে পড়ে।

জাহাজের এই দুলুনির মধ্যে মাস্তুলের দড়িদড়া ধরে ফ্রান্সিস ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুহাত দড়িদড়া থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে। বেশ কষ্টে ফ্রান্সিস সেই ধাক্কা সামলাচ্ছে আর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উঁচু পাহাড়টার দিকে।

কিছু পরে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা কমল। তখনই ফ্রান্সিস আব্‌ছা অন্ধকারের মধ্যে দেখল পাহাড়টায় একটা বড় বেশ উঁচু গুহামত। ফ্রান্সিস আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল—ও—হো হো। ঝড়ের শব্দের মধ্যেও সেই ধ্বনি কয়েকজন ভাইকিংএর কানে গেল। ওরাও চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো হো। এবার সবাই সেই ধ্বনি শুনল। সবাই মিলে ধ্বনি তুলল—ও হো হো।

ফ্রান্সিস জাহাজের মধ্যে টলতে টলতে ফ্রেজারের কাছে এল। চিৎকার করে বলল—ফ্রেজার—ঐদিকে দেখ। একটা বড় গুহা। দেখ ভালো করে। ফ্রেজারও তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকাল। গুহাটা আবছা দেখতে পেল। তখন বৃষ্টি আরো কমেছে।

এবার গুহাটা অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—দেখেছো?

—হ্যাঁ। দেখছি। ফ্রেজারও চিৎকার করে বলল।

—ঐ গুহার মধ্যে জাহাজটা ঢুকিয়ে দাও। সাবধান গুহার মুখে যেন ধাক্কা না লাগে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল । এবার ফ্রেজার দুলতে থাকা জাহাজটা চালিয়ে গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। দৃঢ়হাতে হুইলটা ঘোরাতে লাগল। দোল খেতে খেতে জাহাজটা গুহার মুখের কাছে এল। তারপর সাবধানে অন্ধকার গুহাটায় জাহাজ ঢুকিয়ে দিল। বোঝা গেল পাহাড়টা বেশ বড়। কিছুটা এগোতেই আর ঝড়ের ঝাপটা নেই। বৃষ্টি নেই। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল ও—হো—হো।

এখন জাহাজটা নিরাপদ। জলের ওপর গুহার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো গা। জাহাজটা অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেল। শান্ত পরিবেশে ঝড়ের অস্পষ্ট শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত সিক্ত ভাইকিংরা জাহাজের ডেক-এ এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল। বসে পড়ল। সবাই মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

জাহাজটা আরো ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার গাঢ় হল। ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল—ফ্রেজার জাহাজ থামাও। ঝড়বৃষ্টি থামলে জাহাজ গুহা থেকে বের করবো। ফ্রেজার জাহাজ থামাল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল—কিছুদূর কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠল। বেশ চমকে উঠল ফ্রান্সিস। তার মানে এখানে মানুষের বসতি আছে। ততক্ষণ আরো কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠল। ফ্রেজার বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—ফ্রান্সিস—অবাক কান্ড।

—হ্যাঁ! এখানে মানুষ থাকে। জানি না তারা কেমন মানুষ। ফ্রান্সিস বলল। ওদিকে ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ওরাও মশালের আলো দেখেছে।

এবার মশালের আলোয় সবাই দেখতে পেল কিছুদূরে একটা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের বেদী মত। তার ওপর একটা পাথরের আসনমত। তাতে কে

একজন বসে আছে। বেদীটার চারপাশে মশাল জ্বলছে। প্রায় পনেরো কুড়িজন কালো মানুষ বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রেজার মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস—এরা কারা?

—কালো মানুষ। পাথরের আসনে যে বসে আছে সে নিশ্চয়ই এদের রাজা। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

—এখানে কী করবে? ফ্রেজার জানতে চাইল।

—দেখি—এদের মতলব কী? ফ্রান্সিস বলল।

হঠাৎ মশালের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল একদল কালো মানুষ বর্শা দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁতরে ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে। সবাই দেখল সেটা। শাঙ্কো ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস কী করবে? আরো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—না। আত্মসমর্পণ। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। শরীরের এই অবস্থায় লড়াই করতে গেলে আমরা হেরে যাব। বেশ কিছু বন্ধু মারাও যাবে। তার চেয়ে দেখা যাক ওরা আমাদের নিয়ে কী করে। লড়াই না করলে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। শুধু বন্দী করবে। দেখা যাক আমাদের কোথায় কীভাবে বন্দী করে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে পালাবো। এখন লড়াই নয়।

ওদিকে হালের দড়ি বেয়ে কালো মানুষেরা ডেকএ উঠে আসতে লাগল। ওদের জলে ভেজা কালো কালো শরীরে মশালের আলো পড়ে চকচক্ করছে। এতক্ষণ বর্শা দাঁতে চেপে ধরে ওরা সাঁতরে এসেছে। এখন হাতে বর্শা উঠিয়ে ওরা দ্রুত ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। একজন বেঁটেমত যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বোঝা গেল সেই দলনেতা। গলা উঁচু করে ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—নেতা —কে? ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

বলল-আমি।

—বন্দী—তোমরা। দলপতি বলল।

—কেন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। ফ্রান্সিস পোর্তুগীজ ভাষায় বলল।

—লড়াই চাও? দলনেতা বলল।

—না। সুবিচার চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা নিকুম্বা-চল। দলনেতা বলল।

—রাজা নিকুম্বা কোথায়? ফ্রান্সিস জানাতে চাইল।

দলপতি আঙুল তুলে পাথরের বড় বেদীমত জায়গাটা দেখাল। বলল—সিংহাসন। তাহলে পাথরের সিংহাসনে যে বড় বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা লোকটি বসে আছে সেই রাজা নিকুম্ব।

—এখান থেকে সাঁতরে আমরা যাব না। জাহাজ ওখানে নিয়ে যাব। তারপর কাঠের পাটাতন পেতে ঐ বেদীতে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা বেশ —চল। দলপতি বলল।

—জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দাঁড় বাইতে হবে। ফ্রেজার বলল।

—না—তোমরা—আমরা। দল নেতা কয়েজনকে কী বলল। কয়েকজন দাঁড় ধরে নেমে গেল। তখনও কয়েকজন ভাইকিং ক্লান্তিতে ভেজা ডেকে-এর ওপরই শুয়ে বসে ছিল।

একটু পরেই জাহাজ আস্তে আস্তে চলল। সেই এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের বড় বেদীমত জায়গাটায় জাহাজ এসে লাগল। দলনেতা ভাইকিংদের উঠে যেতে ইঙ্গিত করল। ওদিকে কিছু কালো যোদ্ধা সিঁড়ি বেয়ে নেমে কেবিনঘর খাবার ঘরে নেমে গিয়েছিল। ওরা মারিয়াসহ রাঁধুনিদেরও ধরে নিয়ে এল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবো?

—আমাদের আর কিছুই করার নেই। এদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—বন্দীত্ব মেনে নেবে? মারিয়া বলল?

—উপায় নেই। এখন লড়াইয়ে নামালে আমরা কেউ বাঁচবো না।

নির্ঘাৎ মৃত্যু। এখন এদের কথা মতই চলতে হবে। বাধা দিয়ে লাভ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এরা তো যে কোন সময় আমাদের মেরে ফেলতে পারে। মারিয়া বলল।

—সেই ঝুঁকি নিতেই হবে। আগে এদের রাজার সঙ্গে কথা বলি। তখনই বুঝতে পারবো এরা আমাদের নিয়ে কী করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি এদের বিশ্বাস করি না। মারিয়া বেশ জোর দিয়ে বলল।

—এখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। এখন আমরা বন্দী। ভবিতব্য মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে দলপতির নির্দেশে ভাইকিংরা সার বেঁধে পাটাতন দিয়ে পাথরের বেদীমতন জায়গাটায় উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে সেই সারিতে দাঁড়াল।

কালো যোদ্ধাদের পাহারায় সবাই সেই বেদীমত জায়গাটায় উঠে এল। ক্লান্ত ভাইকিংরা কেউ কেউ বসে পড়ল।

এবার মশালের আলোয় রাজা নিকুম্বাকে অনেক স্পষ্ট দেখা গেল। রাজা নিকুম্বা পাথরের আসনে বসে আছে। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা বড় বড় চুল। কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। কুঁৎকুতে চোখের দৃষ্টি কুটিল।

দলপতি রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু মাথা নুইয়ে সন্মান জানিয়ে এক নাগাড়ে কী বলে গেল।

রাজা দু-একবার মাথা ওঠা-নামা করে কী বলল। দলপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। রাজার দিকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজাকে সন্মান না জানালে বিপদ হতে পারে। ও রাজার সামনে এসে মাথা একটু নুইয়ে সন্মান জানাল।

রাজা নিকুম্বা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—কে—তোমরা?

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন—এখানে? রাজা জানতে চাইল।

—আমরা দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই। গোপন ধন ভান্ডার উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—নিয়ে পালাও। রাজা নিকুম্বা বলল।

—না। সেই গুপ্ত ভান্ডারে যার অধিকার তাকে দিয়েদি। ফ্রান্সিস বলল

—বদলে—নাও—না। রাজা নিকুম্বা বলল।

—না। একটা তামার মুদ্রাও নিই না। ফ্রান্সিস বলল।

রাজার সঙ্গে ফ্রান্সিসের কথা হচ্ছে তখনই রানি এল। পরনে রাজার মতই ঢোলা হাতা হলুদ রঙের ময়লা পোশাক। যেমন কালো তেমনি মোটা। মাথায় ঝাঁকড়া লম্বা চুল। রাজার পাথরের আসনের পাশেই একটা ছোট পাথরের আসনে বসল। এসে অব্দি রানী হেসেই চলেছে। কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি। মারিয়াকে দেখে রানির হাসি বেড়ে গেল। রাজাকে ফিস্‌ফিস্ করে কী বলল। রাজা মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল—

কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী মারিয়া। ফ্রান্সিস বলল। রাজা রানীকে কী বলল। রানীর হাসি বেড়ে গেল। অবাক চোখে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। মারিয়ার গা জ্বলে গেল। কিন্তু কিছুই বলার নেই। এখন রাজা রানির দয়ার ওপর ওদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এবার রাজা একই গম্ভীরস্বরে বলল—জলদস্যু—তোমরা। ফ্রান্সিস একটু

চমকাল। পরক্ষণেই বলে উঠল—এই অপবাদ আমাদের অনেকেই দিয়েছে। কিন্তু আমরা জলদস্যু নই। আমরা কখনও কারো কাছ থেকে একটা স্বর্নমুদ্রাও জোর করে নিই নি। যে যেমন দিয়েছে নিয়েছি আমাদের খাদ্য পোশাকের জন্য।

—উঁহু। জাহাজ দেখা হবে—খুঁজে। দামি কিছু—। রাজা বলল। হ্যারি নিম্নস্বরে বলল—দামি কিছ্ছু নেই। ফ্রান্সিস কথাটা শুনল। বলে উঠল—জাহাজ তল্লাশী করতে পারেন। দামী কিছুই পাবেন না।

—দেখি। রাজা নিকুম্বা বলল। তারপর দলনেতার দিকে তাকিয়ে কী বলল। দলপতি কয়েকজন যোদ্ধাকে কী বলল। জনা ছয় সাতেক যোদ্ধা পাতা পাটাতনের দিকে গেল। পাঁটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরগুলোর তল্লাশী চালাতে লাগল। মারিয়া নিশ্চিন্ত ছিল সোনার চাকতিগুলো ওরা খুঁজে পাবে না। তবে ওর নিজের পোশাক ভাইকিংবন্ধুদের পোশাক ওরা চুরি করতে পারে। এর আগেও এরকম হয়েছে। ও ওদের জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইল কখন ঐ যোদ্ধারা ফিরে আসে।

প্রায় আধঘন্টা পরে জাহাজে তল্লাশী সেরে যোদ্ধারা দলপতির সঙ্গে ফিরে এল। মারিয়ার একটা নতুন পোশাক ভাইকিংদের কিছু নতুন পোশাক কয়েকটা তরোয়াল এসব নিয়ে যোদ্ধারা ফিরে এল। দলপতি রাজার কাছে গিয়ে কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে রাখা মারিয়ার গলার সোনার নেকলেসটা রাজাকে দিল। রাজা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে হারটা নিল। রানি হাসতে হাসতে রাজার হাত থেকে হারটা প্রায় কেড়ে নিয়ে হাতে জড়াল। রানি জানে না যে হারটা গলায় পরতে হয়। ফ্রান্সিস বুঝল এখন রাজারানির মন রেখে চলতে হবে। তাই মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া—হারটা রানির গলায় পরিয়ে দিয়ে এসো। মারিয়া শুনল কথাটা মৃদুস্বরে বলল—হতচ্ছাড়ি রানি।

—যাও। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল। মারিয়া আর আপত্তি করল না। আস্তে আস্তে রানির কাছে গেল। রানির হাত থেকে হারটা খুলে নিল। রানির ঝাকড়া চুল সরিয়ে গলায় পরিয়ে দিল। এবার রানি খুব খুশি। খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। এবার রাজা নিকুম্বা দলপতিকে কী বলল। রানি দু'হাত তুলে চিৎকার করে কী বলে উঠল। রাজা একটু চুপ করে থেকে দলপতিকে কী একটা আদেশ করল। দলপতি একবার মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ওর পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করে ডানদিকের গুহামুখ দিয়ে ভেতরে চলল। ফ্রান্সিসরাও দলপতির পেছনে পেছনে চলল। এই গুহায় রাজার প্রজাদের ঘরসংসার। সব নারীপুরুষ শিশুর দল। এখানেই রান্না খাওয়া দাওয়া শোয়া। সে সব সংসারের পাশ দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল। গুহার শেষে এলো

ওরা। সারা গুহাটাতেই এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় ফ্রান্সিস দেখল একেবারে গুহার শেষে ডানদিকে একটা বিরাট গর্তমত। উত্তপ্ত বাষ্প বেরুচ্ছে গর্তটা থেকে। ফ্রান্সিস মুখ নিচু করে দেখল—গর্তের নিচে জল ফুটছে। বোঝাই যাচ্ছে কী প্রচন্ড উত্তপ্ত সেই জল। দলপতি ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—রাজা—এই কুণ্ডে—তোমাদের শাস্তি—রানি বাঁচাল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা ওদের এই উষ্ণকুন্ডে ছুঁড়ে ফেলতে আদেশ দিয়েছিল। রানি আপত্তি করেছিল। তাই ওরা বেঁচে গেল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে হ্যারিকে বলল সেই কথা। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—অবধারিত প্রচন্ড যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলাম। রাজকুমারীর হার পেয়ে রানি খুশি হয়েছিল।

দলপতি বাঁদিকে ঘুরল। কিছু দূর থেকেই দেখা গেল লোহার গরাদ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায় এরকম একটা দরজা। দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। দু'জন বর্শাধারী যোদ্ধা দরজায় পাহারা দিচ্ছে।

দলপতি সবাইকে ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। এবার ফ্রান্সিস দলপতির সামনে গেল। মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। এই কয়েদ ঘরে থাকতে পারবেন না।

—নিরুপায়—রাজা নিকুম্বার হুকুম। দলপতি বলল।

—তাহলে রাজার কাছে নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা নিকুম্বা—বিশ্রাম।

ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—রাজার সঙ্গে তো এখন কথা হবে না। আজকের রাতটা কষ্ট করে থাকো।

—তোমরা কষ্ট করে থাকলে আমিও থাকবো। মারিয়া বলল।

—না না। কাল রাজার সঙ্গে কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া হামাগুড়ি দিয়ে কয়েদ ঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় দেখল বন্ধুরা বেশ চাপাচাপি করে বসেছে। বাসযোগ্য ঘর তো নয়। গুহারই একটা অংশ। ওরই মধ্যে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে গুহার এবড়ো খেবড়ো পাথুরে দেয়ালে গা ঠেকিয়ে বসল। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—এতো অন্ধকূপ। রাজকুমারী এখানে থাকতে পারবেন?

—রাজা নিকুম্বা এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কালকে সকালে রাজার সঙ্গে কথা বলবো। যে করে হোক মারিয়াকে আমাদের জাহাজে রাখতে হবে। খাবার টাবারও ওরাই দিয়ে আসবে। আজ রাতে আর কিছুই ব্যবস্থা করা যাবে না। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। এই বন্দী দশা কিছু বন্ধু মেনে নিতে পারছিল না। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—লড়াই করে জাহাজ নিয়ে পালালে হত।

ঐ গাদাগাদির মধ্যে বেশ কয়েকজন বন্ধু কোনরকমে আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সিস ওদের দেখিয়ে বলল—ঐ দেখ কী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। উঠে বসে থাকার সাধ্যটুকুও নেই। শরীরের এই অবস্থা নিয়ে লড়তে গেলে অনেক বন্ধুর মৃত্যু হত। আমি সেটা চাইনি।

—কিন্তু এখানে এভাবে বন্দী জীবন কাটাতে গিয়েও তো অনেকে মারা যেতে পারে। সিনাত্রা বলল।

—তার আগেই পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? সিনাত্রা বলল।

—পারতেই হবে। তখন সুস্থ সবল শরীর নিয়ে লড়াই করতে হবে। এখন সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা। বন্ধুদের বোঝাও সেটা। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি...বোঝাতে পারি কিনা। সিনাত্রা উঠে বন্ধুদের কাছে চলে গেল।

রাত বাড়ল। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন থেমে গেছে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে লড়াই করা সত্যিই সম্ভব ছিল না। এখন ভরসা ফ্রান্সিস। যদি পালানোর উপায় ভেবে দেখতে হয় সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সিসই একমাত্র পারবে।

একসময় লোহার গরাদে শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। প্রহরী দু'জন খাবার নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। পাথর কুঁদে থালা মত তৈরি করা হয়েছে। পাঁচটা করে রুটি ঐ থালায় খেতে দেওয়া হল। মাছের টুকরো বোধহয় ভাজাই হয় নি। আঁশটে গন্ধ। প্রায় কেউই কোনরকমে খেল। ফ্রান্সিস তখনও খায়নি। ও রান্নার অবস্থা বুঝতে পারল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—খেতে ভালো না লাগলে নাক টিপে খাও। পেটপুরে খাও। শরীরটা তেজি রাখো। কম খেয়ে শরীর দুর্বল হলে পালাবার শক্তি থাকবে না। বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কথা শুনল। কেউ আঁশটে গন্ধ সত্ত্বেও খাবার ফেলল না। পেট পুরেই খেলো সবাই। থালা কম। কাজেই দফায় দফায় খেতে হল।

সবার খাওয়া হলে প্রহরীরা এঁটো থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজায় তালা লাগিয়ে বর্শা হাতে পাহারা দিতে লাগল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবে ফ্রান্সিস?

—সব দেখিটেখি। উপায় একটা হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

—পাহারাদার তো মোটে দু'জন। খাবার দিতে তো ঐ দু'জনই আসে। ঐ দুটোকে কবজা করে পালানো যায় না? শাঙ্কো বলল।

—এখন নয়। এখন শুধু বিশ্রাম। দিন কয়েক চুপচাপ থাকো। পাহারাদাররা পাহারায় একটু ঢিলে দিক। ফ্রান্সিস বলল।—ভেবে দেখো তাহলে। এই কথা বলে শাঙ্কো নিজের জায়গায় চলে গেল।

একে শরীরের ক্লান্তি। তারপর এইভাবে গাদাগাদি করে থাকা, গুহায় অসহ্য

গরম। তাই সবাই ভালো করে ঘুমতে পারল না। হ্যারির কষ্ট হল সবচেয়ে বেশি। ও শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি খুব কষ্ট হচ্ছে? হ্যারি ম্লান হাসল। বলল—তা একটু হচ্ছে।

উপায় নেই। সহ্য কর। ফ্রান্সিস বলল।

আমার ভয় কি জানো? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—এই রোগ তো আমার আছে। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল। ফ্রান্সিস বেশ চমকাল। হ্যারির কাঁধে হাত রেখে বলল—আমার উরুর উপর মাথা রাখো।

না-না। হ্যারি মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস শুনল না। হ্যারির মাথাটা ধরে নিজের উরুর ওপর শুইয়ে দিল। মারিয়া দেখল সেটা। একটু এগিয়ে হ্যারির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—মারিয়া তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। হ্যারিকে আমি দেখছি। মারিয়া আপত্তি করল না। সরে এসে গুহার এবড়ো খেবড়ো পাথরের মেঝেয় মাথা রেখে আধশোয়া হল। ফ্রান্সিস বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওর এভাবে ঘুমোবার অভ্যেস আছে।

ভোর হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। একজন দু'জন করে বন্ধুরা ঘুম থেকে উঠতে লাগল। ওদের অস্বস্তি দেখেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল অনেকেরই ভালো ঘুম হয়নি। ততক্ষণে মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেছে। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—ঘুম হয়েছে?

—ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। মারিয়া বলল।

—সে কি! সারারাত ঘুম হয়নি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঐ সব মিলিয়ে ঘন্টা দুয়েক। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছুই বলল। হ্যারিরও তখনই ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের উরু থেকে মাথা তুলে হেসে বলল—আমার জন্যে তোমার বোধহয় ঘুম হয় নি।

—আমি গাছের গুড়ির মতো ঘুমিয়েছি। তোমার ঘুম হয়েছে তো? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। হ্যারি মাথা কাত করল।

গুহার মধ্যেই কোনার দিকে একটা পাথরের চৌবাচ্চা মত। তাতে জল রাখা। সবাই হাত মুখ ধুল।

কিছু পরে প্রহরীরা সকালের খাবার দিয়ে গেল। সেই দফায় দফায় পাথরের থালায়। পোড়া রুটি আর সবজির ঝোল। সবজির ঝোলের স্বাদটা ভালই। সবাই পেটপুরেই খেল।

ফ্রান্সিস প্রহরীটিকে বলল—তোমাদের দলনেতা কোথায়? প্রহরীটি কিছুই বুঝল না। এবার হ্যারি আকার ইঙ্গিতে দলনেতার কথা বোঝাল। এবার প্রহরীটি বুঝল। মৃদুস্বরে কী বলল। তারপর মাথা ওঠানামা করল। বোঝা গেল দলপতি আসবে।

এখানে তো অন্ধকারের রাজত্ব। রোদ নেই যে ফ্রান্সিসরা কত বেলা হল বুঝবে। তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে দলপতি এল। ফ্রান্সিস গরাদের কাছে এগিয়ে গেল। গরাদে গাল চেপে বলল—রাজামশাই সভায় এসেছেন?

—না—পরে। দলপতি বলল।

—এলে আমাকে বলবেন—রাজার সঙ্গে একটু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল। দলপতি মাথা ওঠা নামা করল। তারপর বলল—সকালে—খাবার—।

—হ্যাঁ খেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। দলপতি মৃদু হাসল।

দলপতি প্রহরীদের কী বলল। তারপর চলে গেল। ফ্রান্সিস ওর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দলপতি ফিরে এল। একজন প্রহরীকে কী বলল। প্রহরী সেই গুহার ঘরের দরজা খুলে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে এল। দলপতির পেছনে পেছনে চলল। গুহাপথে কালো মানুষদের পাতা সংসার। সে সবের পাশ দিয়ে চলল তিনজনে।

সেই বেদীমত উচুঁ জায়গায় পৌঁছাল দুজনে। ফ্রান্সিস দেখল রাজা নিকুম্বা পাথরের আসনে বসে আছে। বোধহয় বিচার চলছে। পাথরের ছোট আসনে রানি বসে আছে। গলায় মারিয়ার গলার হার। রানি আপন মনে হাসছে। হারটায় হাত বুলোচ্ছে। বোঝা গেল হার পেয়ে রানি খুব খুশি হয়েছে।

কয়েকজন কালো মানুষ রাজার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন একনাগাড়ে কী বলে যাচ্ছে। রাজা শুনছে। মাঝে মাঝে ভুরু কোঁচকাচ্ছে। লোকটির বলা শেষ হল। রাজা চিৎকার করে কী বলে উঠল। দুজন যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এসে দু'জন কালো মানুষকে ধরল। টেনে নিয়ে চলল ফ্রান্সিসরা যে কয়েদঘরে আছে সেইদিকে। রানিও হাসতে হাসতে ওদের পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস বুঝল—ওদের মৃত্যুদন্ড হয়েছে। নিশ্চয়ই ঐ উষ্ণকুন্ডে এদের ছুঁড়ে ফেলা হবে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতেই বোধহয় রানিও যাচ্ছে। ওদের মৃত্যু যন্ত্রণা রানি তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করবে। ফ্রান্সিস দু'চোখ বুঁজে একবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে।

এবার এক বৃদ্ধকে ধরে একজন যোদ্ধা রাজার সামনে নিয়ে এল। বৃদ্ধটি মাথা নিচু করে একনাগাড়ে কী বলে গেল। রাজা ডান হাত তুলে ইঙ্গিত করল।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এসে বৃদ্ধকে সরিয়ে নিয়ে এল। বৃদ্ধটি হাসতে হাসতে বার বার মাথা নিচু করে চলে এল।

বোধহয় বিচার পর্ব শেষ হল। দলপতি রাজাকে কাছে গিয়ে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া এগিয়ে গেল। একটু মাথা নিচু করে ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন ইনি সহ্য করতে পারবেন না।

—বন্দী—থাকতে—হবে। রাজা বলল।

—যদি রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে বন্দী করে রাখেন তাহলে আমরা বাধিত হব। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা? রাজা নিকুম্বা বলল।

—আমরা কয়েদঘরেই থাকবো। রাজকুমারীকে বন্দী রেখে আমরা পালাতে পারব না।

এই সময় রানি ফিরে এল। আগের মতই হাসতে হাসতে। এসে রাজার পাশে ছোট পাথরের আসনে বসল। রাজা রানিকে কিছু বলল। বোধহয় ফ্রান্সিসের আবেদনের কথাই বলল। রানি খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস মারিয়া কিছুই বুঝল না। এবার রাজা বলল—বেশ—পাহারা —থাকবে। ফ্রান্সিস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—তোমরা এত কষ্টের মধ্যে থাকবে আর আমি—মারিয়া বলল।

—ওসব ভাবনা ছাড়ো। এছাড়া কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

রাজা কী বলে উঠল। দু'জন যোদ্ধা বর্শা হাতে এগিয়ে এল। দলপতি মারিয়াকে বলল—জাহাজ—যাও।

দুজন যোদ্ধার পেছনে পেছনে মারিয়া পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে নিজেদের জাহাজের ডেক এ নামল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে কেবিনঘরে নেমে এল।

এবার ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকাল। বলল—আমাদের বন্দী রেখে আপনার কী লাভ। আমাদের জাহাজ তল্লাশী করেও মূল্যবান কিছু পাননি। এবার আমাদের মুক্তি দিন। রাজা ঝাঁকড়া-চুলো মাথা নেড়ে বলল— না। দলপতিকে বলল— কয়েদঘর। দলপতি ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। উপায় নেই। বন্দীদশাই মেনে নিতে হবে।

দলপতির সঙ্গে ফ্রান্সিস কয়েদঘরে ফিরে এল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—রাজা রাজি হল?

—হ্যাঁ। মারিয়া জাহাজেই থাকবে। কিন্তু আমাদের মুক্তি দেবে না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি কিছু বলল না। উপায় নেই। বন্দীদশা মেনে নিতেই হবে।

গুহাঘরে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে ফ্রান্সিসদের দিনরাত কাটতে লাগল। প্রায় অখাদ্য খাবার পানীয় জলের টানাটানি অসহ্য গরম—এসবের মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসদের বন্দীজীবন কাটতে লাগল।

দু'জন বন্ধু বিশেষ করে শরীরের দিক থেকে দূর্বল হ্যারি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। হ্যারির চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রচন্ড জ্বরে হ্যারি প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেল। ওদের এক বন্দি পোশাকের প্রান্ত ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে হ্যারির কপালে চেপে চেপে দিতে লাগল। অন্য দুই বন্ধু চুপ করে শরীরের অসুস্থতা সহ্য করতে লাগল।

ফ্রান্সিস গরাদের দিকে ছুটে গেল। হাতছানি দিয়ে প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী কাছে এল আকার ইঙ্গিতে দলপতিকে ডাকতে বলল। প্রহরীটি বুঝল সেটা। ও চলে গেল। ফ্রান্সিস গরাদের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছু পরে দলপতি এল। ফ্রান্সিস গরাদে মুখ চেপে বলল—আমাদের তিন বন্ধু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একজন বৈদ্য ডেকে দাও।

—খুব অসুখ? দলপতি বলল।

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। দলপতি বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে এসে বসল। অপেক্ষা করতে লাগল যদি কোন বৈদিটৈদ্যি আসে।

রাত হল। খাওয়ার সময় হল তখনও বৈদি এল না। প্রহরীরা দফায় দফায় ওদের খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস মনের এই উদ্বেগ নিয়েও পেট পুরে খেল। শরীর ঠিক রাখতে হবে।

একটু রাতে দলপতি এল। তার পেছনে একজন রোগা লিকলিকে কালো মানুষ। কোঁকড়ানো মাথার চুল দাড়ি গোঁফ। কাঁধে একটা মোটা কাপড়ের ঝোলা ঝোলানো। বোধহয় কাপড়টা জাহাজের পাল থেকে কাটা।

বৈদ্যি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল। পাথুরে মেঝেয় ঝোলাটা রাখাল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে হ্যারিকে দেখাল। বৈদ্যি হ্যারির কপালে হাত দিয়ে দেখল। হ্যারির গলায় হাত দিয়ে দেখল। দুচোখের পাতা টেনে দেখল। ফ্রান্সিস দুই অসুস্থ বন্ধুকেও দেখাল। বৈদ্যি তাদেরও দেখল। এবার ঝোলা থেকে দুটো চিনে মাটির বোয়াম বার করল। দুটো বোয়াম থেকে কাদার মত কালো দুটো জিনিস বাঁ হাতের তালুতে ঢালল তারপর দুটো হাতের তালু ঘষতে লাগল। কিছু পরে দেখা গেল

কাদার মত জিনিসগুলো শক্ত হয়ে গেছে। বৈদ্যি তাই থেকে বেশ কয়েকটা বড়ি বানাল। বড়িগুলো তিন ভাগ করল। ছটা করে ভাগ ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে দিল। প্রথমে একটা আঙ্গুল দেখাল। তার মানে একবার। তারপর তিনটে আঙ্গ ল দেখাল। তার মানে তিনবার করে। এবার একটু হেসে হাতের তালু দেখাল। বোধহয় অভয় দিল। তারপর বোয়াম ঝোলায় পুরে চলে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। ফ্রান্সিস একটু আশ্বস্ত হল। হয় তো এই ওষুধেই কাজ হবে।

দিন দুয়েকের মধ্যে অসুস্থ দুই বন্ধুর সুস্থ হল। হ্যারিও অনেকটা সুস্থ হল। বৈদ্যি অবশ্য দু'দিন ধরেই ওষুধ দিয়ে গেছে। কিন্তু হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিসের দুশ্চিন্তা গেল না। হ্যারি যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে? গভীরভাবে ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল কী করে এই কয়েদঘর থেকে পালানো যায়। এখানে দিনের পর দিন থাকলে কারো বাঁচার আশা নেই। এর মধ্যে ঘটল এক কান্ড। সেই রাতে দু'জন প্রহরী খাবার দিতে এসেছিল। সবারই খাওয়া হয়ে গেছে তখন। হঠাৎ সিনাত্রা পাগলের মতো এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে এক প্রহরীর চিবুকে প্রচন্ড জোরে ঘুঁষি মারল। প্রহরীটি ছিটকে দরজার উপরে পড়ল। সিনাত্রা দরজার দিকে দ্রুত গেল। কিন্তু পায়ের কাছে পড়ে থাকা প্রহরীটিকে ডিঙ্গোতে পারল না। অন্য প্রহরীটি ততক্ষণ দরজার কাছে এসে গিয়েছে। সে পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বর্শাটা তুলে নিল। বর্শার মুখ তাক করে ধরল সিনাত্রার দিকে। সিনাত্রা আর দরজা দিয়ে বেরোতে পারল না।

ঘুঁষিতে আহত প্রহরীটিকে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে প্রহরীটি চলে গেল।

কিছু পরে তিন-চার জন যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দলনেতা ফিরে এল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের একজন আমাদের এক প্রহরীকে আহত করেছে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। বলবার কিছু নেই। সিনাত্রা পাগলের মত যা কান্ড করলে এতে যে ওদের বিপদ বাড়ল সেটা বুঝল ও। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে ফ্রান্সিস এবার বলল—যা হবার হয়েছে। প্রহরীকে মারা উচিত হয়নি। অনুরোধ—রাজা নিকুম্বাকে কিছু বলো না।

—রাজা জানলে—উষ্ণকুন্ডে—মরণ। দলনেতা বলল।

—সেটা জানি বলেই বলছি রাজা যেন কিছু না জানে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—এবারের মতো—। দলপতি বলল। চারজন যোদ্ধাকে পাহারায় রেখে দলপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিস সিনাত্রাকে কাছে ডাকল। সিনাত্রা কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছো। বোকার মত। এখনও হ্যারি বন্ধুরাও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। এর মধ্যে এই কাণ্ড করে পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে। দু'জন প্রহরী থাকলে তবু পালনো সম্ভব ছিল। এখন সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

তোমার জন্যে। সিনাত্রা ঘাড় গোঁজ করে বসে ছিল। বলল—এখানে থাকলে এমনিতেই মরবো।

—না। তার আগেই পালাবো। তখন তোমার সাহস আক্রমনের ক্ষমতা এসব দেখিও। পরিকল্পনা করে কাজ করতে হয়। ভুলে যেও না রাজকুমারী জাহাজে বন্দী হয়ে আছে। তাকে নিয়ে পালাতে হবে। কাজটা সহজসাধ্য নয়। সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিলে। তোমার জন্য বিপদ বাড়ল। রাজা যদি এই ব্যাপারটা জানতে পারে আমাদের পালাবার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। উষ্ণকুন্ডে ছুঁড়ে ফেলবে আমাদের। তুমি একা পালাতে গিয়ে সবাইকে ভীষণ বিপদে ফেললে। এখন আমাদের জীবন সংশয়। বেঁচে থাকব কিনা জানি না। তবে তোমাকে বলি এরকম অবিবেচকের মত কাজ করে না। যাও—নিজের জায়গায় যাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের ভাগ্য ভাল দলপতি রাজা নিকুম্বাকে কিছু বলল না। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল ফ্রান্সিসরা। এবার এই অন্ধকূপ থেকে পালাবার উপায় ভাবতে হবে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। একটাই চিন্তা কী করে বন্ধুদের নিয়ে মারিয়াকে নিয়ে পালানো যায়। তবে লড়াই করে নয়। বুদ্ধি করে সবাইকে নিরাপদে নিয়ে কী করে এই দুঃসহ জীবন থেকে বাঁচা যায়।

প্রায় এক মাস কাটল। হ্যারি আর দুই বন্ধু এখন অনেক সুস্থ। কয়েদখানার পাহারাদারদের সংখ্যা দুজন কমানো হয়েছে। পাহারার কড়াকড়িটা কমেছে। ফ্রান্সিস পালাবার ছক ভাবছে গভীরভাবে। হ্যারি শাঙ্কোর সঙ্গে কথাও বলছে। কিন্তু বিনা বাধায় পালানো সম্ভব মনে হচ্ছে না।

এবার ফ্রান্সিস ভাবল ওদের মুক্তির ব্যাপারে রাজার সঙ্গে কথা বলবে। সকালের খাবার খাওয়া হলে ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকল। ইঙ্গিতে দলনেতাকে ডেকে দিতে বলল। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছু পরে দলপতি এল। বলল—কেন?

—রাজা নিকুম্বার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

—রাজসভায় চল। দলপতি মাথা নেড়ে বলল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিস হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। দলপতির পিছনে পিছনে চলল রাজসভার দিকে। কালো মানুষদের ঘর সংসারের পাশ দিয়ে হেঁটে রাজসভায় এল দুজনে।

তখন রাজসভায় একটা বিচার চলছিল। বিচার শেষ হলে দলপতি রাজার সামনে গেল। মাথা একটু নুইয়ে বোধহয় ফ্রান্সিসের কথা বলল। আজকে পাশের আসনে রানি নেই। ফ্রান্সিস একটু হতাশই হল। রানির জন্যই ওরা বেঁচে

গিয়েছিল। রানি থাকলে হয়তো ওদের স্বপক্ষে কিছু বলতো। এখন তো রাজা নিকুম্বা একা। রাজাকে বোঝানো মুশকিল হবে। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক মুক্তি মেলে কিনা।

রাজা ততক্ষণে ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করেছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল।

—বল। রাজা বলল।

—আমরা তো কোনভাবেই আপনাদের বা আপনার এই রাজত্বের কোন ক্ষতি করিনি। তবে আমাদের বন্দী করে রেখেছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল—জলদস্যু—আসবে—বিক্রি—। রাজা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে হাতের আঙ্গ ল গোল করে ঘুরিয়ে বলল—সোনা। ফ্রান্সিস বুঝল—ওদের জলদস্যুদের কাছে বিক্রি করা হবে। বদলে রাজা সোনার চাকতি পাবে। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। তবু হাল ছাড়ল না। বলল—আমরা নিরীহ। আপনাদের কোন অপকার করি নি। তবে আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রির জন্যে জলদস্যুদের হাতে তুলে দেবেন কেন?—সোনা—চাই। রাজা এবার একটু জোরেই হেসে উঠল। ফ্রান্সিসের মন নিরাশায় ভরে উঠল। বুঝল—কোন যুক্তিতর্কে লাভ হবে না। রাজা তার সিদ্ধান্তে অটল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

রাজা পাথরের সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিচারসভা শেষ। এবার ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল রাজার কোমরে একটা চামড়ার কোমর বন্ধনী। তাতে গোল গোল সোনা বসানো। তাহলে একটা গুহার রাজা হলেও রাজা সোনার মূল্য বোঝে। রাজা গুহার সামনের দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরে ফিরে এল। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—কথা হল?

—হ্যাঁ। আমাদের মুক্তি নেই। রাজা জলদস্যুদের কাছে আমাদের বিক্রি করবে বলে বন্দী করে রেখেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি? হ্যারি বেশ আশ্চর্য হল। বলল—রানী কিছু বলল?

—রানি ছিল না। আমি বোঝবার চেষ্টা করলাম। লাভ হল না। রাজা স্থির প্রতিজ্ঞ। আমাদের ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

বন্ধুরা সব কথা শুনল। শাঙ্কো এগিয়ে এল, বলল—ফ্রান্সিস—এখন আমরা আর ক্লান্ত নই। আমরা লড়াই করে পালাতে পারবো।

—না। সেই অসম লড়াইয়ে অনেকের প্রাণ যাবে। এটা আমি মেনে নেব না। ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিলে তবু তো আমরা বেঁচে থাকবো। একবার তো ক্রীতদাসের জীবন থেকে পালিয়েছি। সময় সুযোগ বুঝে আবার পালাবো। কিন্তু অসম লড়াইয়ে নামলে অনেকেই মারা যাবো। অপেক্ষা কর। দেখা যাক ঘটনা কোনদিকে গড়ায়? ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন দুপুরে। সবার খাওয়া হয়ে গেছে। প্রায় অখাদ্য খাবার। তবু ভাইকিংরা পেট পুরে খায়। ফ্রান্সিস বলে—শরীর ঠিক্ রাখো। পেটপুরে খাও।

ভাইকিংরা কেউ কেউ আধশোয়া হয়ে আছে। বেশিরভাগ বসে আছে। এইটুকু গুহাঘর। শোওয়া প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ প্রচন্ড দুলুনি। সেইসঙ্গে গুর্‌গুর্ শব্দ।

দুচারজন ভাইকিং উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। দুলুনিতে ছিটকে পড়ল। সমস্ত পাহাড়টাই দুলে উঠল। কয়েদঘরের বাঁ পাশের পাথুরে দেয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। নিচেই সমুদ্রের জল। ঢেউয়ের মাথায় রোদ ঝল্‌সাচ্ছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাইসব ভূমিকম্প। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওদিকে গুহাঘরের ভিতর থেকে স্ত্রী পুরুষ শিশুর আর্ত চিৎকার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মশাল নিভে গেছে।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে বন্ধুরা সবাই বাইরের সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরে দুপুরের রোদ। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস জল থেকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল—গুহা মুখের দিকে সাঁতরে চলো। আমাদের জাহাজ উদ্ধার করতে হবে।

সবাই গুহা মুখের দিকে সাঁতারে চলল। তখনই দেখা গেল ডানদিকে পাহাড়ের একটা অংশ ভেঙে পড়ল। গুর্ গুর্ শব্দ কমল। সমুদ্রের জলে ঢেউয়ের মাতামাতি। তার মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসরা সাঁতরে চলল।

গুহামুখের কাছে এল সবাই। একে একে গুহার মধ্যে ঢুকল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিক। সব মশাল নিভে গেছে। ততক্ষণে গুর্ গুর্ শব্দ থেমে গেছে।

শাঙ্কোই সবার আগে সাঁতরে যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারটা ওর চোখে সয়ে গেল। অস্পষ্ট দেখল রাজার সিংহাসন বসানো পাথরের বেদীটা ভেঙে দুভাগ হয়ে গেছে। কালো মানুষদের চিৎকার আর্তস্বর তখনো শোনা যাচ্ছে।

শাঙ্কো এবার স্পষ্ট দেখল ওদের জাহাজের গা। ও সাঁতারে গিয়ে জাহাজের ঝোলানো দড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসরাও এসে গেছে। আবছা অন্ধকারে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ফ্রান্সিস দড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। ও খুঁজছিল হ্যারিকে। একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি? একটু দূর থেকে হ্যারি বলল—যাচ্ছি। একটু পরেই হ্যারি এসে দড়ি ধরল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।

একটু বিশ্রাম নিয়েই শাঙ্কো দড়ি বেয়ে জাহাজের অন্ধকার ডেকএ উঠে এল। অস্পষ্ট দেখল—দু'জন প্রহরী মাস্তুল আঁকড়ে ধরে আছে। হাতে বর্শা

নেই। শাঙ্কো এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। দেখল একপাশে দুটো বর্শা পড়ে আছে। আসলে জাহাজের দুলনির জন্যে প্রহরী দু'জন টাল সামলাতে মাস্তুল জড়িয়ে ধরে আছে। এরকম দুলনি শাঙ্কোদের কাছে সমস্যাই নয়। ও দুলুনির মধ্যে ছুটে গিয়ে বর্শা দুটো তুলে নিল। প্রহরী দুজন এবার নিজেদের নিরস্ত্র অবস্থাটা বুঝল। কোন কথা বলল না।

শাঙ্কো সিঁড়িঘরে এল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে ফ্রান্সিস মারিয়ার কেবিন ঘরে এল। দরজা বন্ধ । শাঙ্কো দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল—রাজকুমারী—রাজকুমারী। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় শাঙ্কো দেখল মারিয়ার মাথার চুল উস্কো খুস্কো। ভয়ার্ত মুখ। রাজকুমারী শুধু বলল—ফ্রান্সিস?

—কিছু ভাববেন না। আমরা সবাই মুক্ত আর সুস্থ।

—ভুমিকম্প। ভয়ার্তস্বরে মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। এখন থেমে গেছে। শাঙ্কো বলল।

এরমধ্যে ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস ডেকএ দাঁড়িয়ে বলল—একদল দাঁড় ঘরে চলে যাও। জাহাজ উল্টো দিকে গুহার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একদল ভাইকিং চলে গেল দাঁড় বাইতে।

জাহাজ চালক ফ্লেজার ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—

—ফ্রান্সিস সর্বনাশ হয়েছে।

—কী হয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হালের ওপর পাথরের চাঁই ভেঙে পড়েছে। হাল ভেঙে গেছে।

—ঠিক আছে। তুমি যেভাবে পারো গুহা থেকে জাহাজটা বের কর। ফ্রান্সিস দ্রুত বলল।

—দেখি। ফ্লেজার চলে গেল।

ওদিকে দাঁড় বাইতে থাকায় জাহাজটা একটু নড়ল। তারপর গুহার মুখের দিকে চলল। শাঙ্কো মারিয়াকে নিয়ে ডেকও উঠল। মারিয়ার মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়া ভীষন ভীত হয়ে পড়েছে। মারিয়ার ডান হাতটা ধীরে ধীরে ফ্রান্সিস একটু চাপ দিল। মারিয়ার ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করল। বলল—কোন ভয় নেই। আমরা সবাই নিরাপদ। এক্ষুনি জাহাজ বাইরের সমুদ্রে বেরিয়ে আসবে। তুমি বরং কেবিনঘরে যাও। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নাও।

—না। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব। মারিয়া বলল।

—বেশ। ভূমিকম্প আমাদের উপকারই করেছে। কয়েদঘর ভেঙে পড়েছে। তাই আমরা নিরাপদে পালাতে পেরেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজের ওপর পাথর ভেঙে পড়েছে।

—হ্যাঁ হাল ভেঙে গেছে। ওটা আমরা সরিয়ে নেব। জাহাজের আর কোন ক্ষতি হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজটা আস্তে আস্তে গুহা মুখ থেকে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত সমুদ্রে পড়ল।

তখন বিকেল হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ফ্রেজারকে সঙ্গে নিয়ে হালের কাছে এল। সত্যিই হাল প্রায় ভেঙে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে পাথরের চাঁইটা বেশ বড়ই ছিল। হাল ভেঙে চাঁইটা গুহার জলে পড়ে গেছে।

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাল মেরামত করতে হবে। নইলে হাওয়ার ধাক্কায় জাহাজ যেদিকে খুশি যাবে। হুইলই ঘোরানো যাবে না। ফ্রেজার বলল।

—হ্যাঁ—দেখছি। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—কী বলছো?

—কয়েকজনকে নিয়ে কাঠ যন্ত্রপাতি বের কর। নইলে হাওয়ার ধাক্কায় কোন দিক ঠিক রাখতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। তারপর ছুটল বন্ধুদের জোগাড় করতে।

ওদিকে নজরদার পেড্রো কয়েকজনকে নিয়ে পাল টাঙাবার জন্যে পালবাঁধার কাঠামোয় উঠতে লাগল। ফ্রেজার ছুটে গিয়ে বলল—পেড্রো—এখন পাল টাঙিওনা। তাহলে জাহাজ এদিক ওদিক ছুটবে। সব দিকটিক গুলিয়ে যাবে। আগে হাল ঠিক হোক। তারপর পাল টাঙাবে। পাল ছাড়াও জাহাজ এদিক ওদিক ছুটল। ফ্রেজার অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখল। হাল মেরামত না হলে কিছুই করার নেই।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মারিয়া এসময় প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখে। আজও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু মনে দুশ্চিন্তা। বেহাল জাহাজ কোনদিকে চলছে যা মেরিই জানে। সূর্য অস্ত গেল। সন্ধে নামল। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

ওদিকে সিনাত্রা রাজা নিকুম্বার দুই প্রহরীকে ওদের কেবিন ঘরে বন্দী করে রেখে ছিল। দু'জনেরই হাত বাঁধা। এবার সিনাত্রা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—রাজা নিকুম্বার দুই প্রহরীকে বন্দী করে রেখেছি। কী করবে ওদের নিয়ে?

—এখন তো আমরা কোথায় এসেছি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন বন্দর টন্দর পাই। সেখানে ওদের দুজনকে নামিয়ে দেব। ওদের বন্দী করে রেখে কী লাভ। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে শাঙ্কো কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে হাল মেরামতির কাজ করতে লাগল। মশালের আলোয় কাজ চলল। বড় বড় কাঠের তক্তা এনে কেটে ঘষে হাল

সারাই হয়। কাজ চলল সারারাত। ফ্রান্সিসের নির্দেশ- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাল সারাই করতে হবে।

ভোর হল। তখনও শাঙ্কোরা কাজ করে চলেছে। সমুদ্রের উত্তাল হাওয়ায় জাহাজ এদিক ওদিক ছুটছে।

শাঙ্কোরা প্রায় দিন সাতেক রাতদিন খেটে জাহাজের হালটা মেরামত করল। ফ্রেজার হুইল চেপে ধরল। ফ্রান্সিস কাছেই ছিল। বলল—মোটামুটি উত্তরদিকটা ঠিক রেখে জাহাজ চালাও। ফ্রেজার সেভাবেই জাহাজ চালাতে লাগল।

জাহাজ চলল। দিন যায় রাত যায় ডাঙার দেখা নেই।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। তবে কি দিক্ হারালাম। ও ফ্রেজারের কাছে যায়। জিজ্ঞেস করে—ফ্রেজার আমরা কি দিক হারালাম?

—কতকটা তাই। ডাঙা না পেলে এভাবেই জাহাজ চালাতে হবে।

—উত্তরদিকটা ঠিক রেখে চালাও। ডাঙা পেতেই হবে। ঘাবড়ে যেও না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রেজার মাথা কাত করল। জাহাজ চলল।

সেদিন বিকেলে মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো চিৎকার করে বলল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে ডাঙা। ভাইকিংরা ভিড় করে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। সিনাত্রা চেঁচিয়ে বলল—কোন দিকে?

—ডান দিকে। পেড্রো চেঁচিয়ে বলল।

একটু পরেই ডানদিকে একটা সবুজ পাহাড় দেখা গেল। তারপর গাছগাছালি। ফ্রেজার ডাঙার দিকে জাহাজ ঘোরাল।

সমুদ্রের তীরভূমি দেখা গেল। মানুষজন দেখা গেল না। হ্যারি ছুটে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় এসে টোকা দিল।

—এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দরজা খুলে গেল। মারিয়া দাঁড়িয়ে।

—আমি সূর্যাস্ত দেখতে যাচ্ছি। মারিয়া চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—ডানদিকে ডাঙা দেখা গেছে। সমুদ্রতীর নির্জন। একটা ঘাসে ঢাকা সবুজ পাহাড় দেখা গেছে। হ্যারি বলল।

—চলো—ডেকএ যাই। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ডেকএ উঠে এল। সূর্য ডোবার আগে সমুদ্রতীর মোটামুটি দেখা গেল। টানা বালিয়াড়ি চলে গেছে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত। গাছগাছালি নেই তারপর একটানা চলে গেছে শুকনো গাছের সারি। দূর থেকে বোঝা গেল না কী গাছ ওগুলো।

সূর্য অস্ত গেল।

অন্ধকার নামল

—কী করবে? হ্যারি বলল।

—এই রাতে নামা চলবে না। বিদেশ বিভুঁই। বিপদে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রেজারকে গিয়ে বলল—জাহাজটা কাছাকাছি নিয়ে চলো।

—তীরে জাহাজ ভেড়ানো যাবে না। জল অগভীর। ফ্রেজার বলল। তারপর জাহাজ থামাল। শাঙ্কোরা জাহাজের পালগুলো গুটিয়ে ফেলল। জাহাজ অনড় দাঁড়িয়ে রইল।

—কাল সকালে খাবার খেয়ে নামব। আজকে জাহাজ এখানেই থাকুক। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। হ্যারি বলল।

রাতের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের কেবিনঘরে এল।

—কী করবে ঠিক করলে? মারিয়া জানতে চাইল।

—বেশ কিছুদিন পর ডাঙার দেখা পেলাম। কাল সকালে নামব। খোঁজখবর করব। ফ্রান্সিস বলল।

—অচেনা জায়গা! যদি বিপদ হয়? মারিয়া বলল।

—উপায় নেই। সেই ঝুঁকিটা নিতেই হবে। নাহলে কোথায় এলাম জানব কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

সকালে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস সমুদ্রতীরে নামবার জন্যে তৈরী হল। সঙ্গে শাঙ্কো আর সিনাত্রাকে নিল। হ্যারি যেতে চাইল। কিন্তু ফ্রান্সিস রাজি হল না। বলল—তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। কী রকম অবস্থায় গিয়ে পড়ব কে জানে। তারপর বলল—রাজা নিকুম্বার দুই প্রহরী রয়েছে জাহাজে। ওদের আসতে বলো। এখানেই ওদের নামিয়ে দেব।

হ্যারি গিয়ে প্রহরী দু'জনকে ডেকে আনল। ওরা পাহাড় জঙ্গল দেখে নামতে সাহস পেল না। একজন বলল—এখানে নামব না। কোন বড় বন্দরে আমাদের নামিয়ে দিও। এখানে কোন বাড়ি ঘরদোর আছে কিনা কে জানে। শেষে কোন বিপদে না পড়ি। এই প্রহরীটি মোটামুটি পোর্তুগীজ ভাষা বলতে পারে।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল—কোন বন্দরেই তোমাদের নামিয়ে দেব।

একটা নৌকা জলে নামানো হল। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে দড়ির মধ্যে পা রেখে নৌকায় নেমে এল। ফ্রান্সিস নৌকোয় রাখা বৈঠা তুলে নিল। নৌকো ছেড়ে দিল। ফ্রান্সিস নৌকো বাইতে লাগল। আস্তে আস্তে নৌকো গিয়ে তীরভূমিতে লাগল।

ফ্রান্সিসরা একে একে নেমে এল। নৌকোটা মাটিতে কিছুদূর টেনে এনে রাখল যাতে জোয়ার এলে নৌকোটা ভেসে না যায়।

বালিয়াড়ি ভেঙে চলল সবাই। কিছুদূর গিয়ে দেখল কাছেই কিছু পাথরের ঘর বাড়ি। ডানদিকে বুনো গমের ক্ষেত প্রায় সবুজ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশে তামাক পাতার ক্ষেত।

বাড়িগুলোর দিকে যেতে যেতে দেখল বাড়িগুলো ঘিরে কালো কালো লম্বা লম্বা নিস্পত্র কাঁটাগাছের সারি। জাহাজ থেকে ফ্রান্সিস এই গাছগুলো দেখেছিল। ফ্রান্সিস ভেবে পেল না কী করে এই কাঁটা গাছের বেড়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকবে।

বেড়াটার পাশে পাশে ওরা চলল। এক জায়গায় এসে দেখল প্রবেশদ্বার মত। ঐ কাঁটাগাছের কাঁটা ছেটে ফেলে লাঠির মত ব্যবহার করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস ঘরগুলোর দিকে তাকাল। কিন্তু জনপ্রাণী দেখল না। ও একটু অবাকই হল। এমন সময় একটা ঘরের সামনে বারান্দা মত জায়গায় একজন বৃদ্ধ এসে বসল। হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটা রেখে তার ভেতর একটা নল মত ঢোকাল। তামাক টানতে লাগল। হাঁ করে ধোঁয়া ওড়াতে লাগল।

—চলো। ঐ লোকটার কাছেই খোঁজ নেওয়া যাক। প্রবেশদ্বারের কাছের ডালগুলো সরিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। বারান্দায় সেই বৃদ্ধের কাছাকাছি এসেছে হঠাৎ একদল লোক সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল। গায়ের রং হলদেটে। বেঁটে। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা। হাতে ছুঁচোলোমুখ বর্শা। মুখে শব্দ করছে—বু-বু-বু-ম্।

ফ্রান্সিস হকচকিয়ে গেল। ফ্রান্সিস পিছন ফিরে বলল— দরজার দিকে— পালাও। তখনই কয়েকটা বর্শা ওদের দিকে উড়ে এল। ফ্রান্সিস কোনমতে পাশ কাটাল। কোন বর্শাই ওদের গায়ে লাগল না। শাঙ্কো বলে উঠল—পালাতে গেলে মরব। ফ্রান্সিসও বলল—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

যোদ্ধারা দ্রুত ওদের ঘিরে ফেলল। বর্শাগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল। লোকগুলোর পরনে শুকনো লম্বা ঘাসের ঘাঘরা মত। ওরা ফ্রান্সিসের গায়ে বর্শার খোঁচা দিতে দিতে ঘরটার দিকে যেতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে পাথরের বারান্দামত জায়গাটায় উঠে এল। যোদ্ধাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে কিছু বলল। বৃদ্ধ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চিৎকার করে কী বলে উঠল। তারপর ফ্রান্সিসদের আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল—পিতালি। ফ্রান্সিসরা কথাটার কোন অর্থই বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বুঝল বৃদ্ধ— ওদের সর্দার। সে তাদের অভিযুক্ত করেছে। ফ্রান্সিস পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—আমরা বিদেশি— ভাইকিং। এখানে খোঁজখবর নিতে এসেছি যে আমরা আমাদের দেশ থেকে কতদূরে আছি। বৃদ্ধ এবার ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল—না—বন্দী।

—কী করবে? শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

—আবার বন্দী দশা মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল। ওদের ঘিরেছিল যারা এবার বর্শা দিয়ে তারা খোঁচা দিয়ে দিয়ে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। কয়েকজন যোদ্ধা ওদের বাড়িটার পেছনদিকে নিয়ে চলল। পেছনে আসতে দেখা গেল একটা ঘরের দরজা। সেই শুকনো গাছের। দরজা বুনো শুকনো লতাগাছে বাঁধা। একজন যোদ্ধা গিয়ে লতা খুলল। বর্শার খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফ্রান্সিসদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বাইরের আলো থেকে অন্ধকারঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস স্পষ্ট কিছু দেখতে পারছিল না। অন্ধকার একটু সয়ে আসতে দেখল ঘরটা বেশ বড়। ছাদ লম্বা লম্বা শুকানো ঘাসের। তার ওপর পাথর চাপানো। একপাশে একটা মাটির জালায় জল রাখা। ঘরটা বড় দেখেই বুঝল অনেক বন্দী রাখার ব্যবস্থা। এখানে কত জন আর বন্দী হয়।

পাথরের মেঝেয় লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস পাতা। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো সিনাত্রা বসে পড়ল।

—আবার বন্দী হলাম। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। এবার পালানোর কথাটা ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে পালাতে? সিনাত্রা বলল।

—অবশ্য পারব। তবে উপায়টা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। সর্দারের হাবভাব যা বুঝলাম এমনিতে আমাদের মুক্তি দেবে না। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো বলল—সর্দার আমাদের দেখিয়ে বলল—পিতালি। কথাটার অর্থ কি?

—শত্রু। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা শত্রু হলাম কী করে। শাঙ্কো বলল।

—তার মানে এদের শত্রু আছে। বোধহয় আমাদের সেই শত্রুই ভেবেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুই বুঝতে পারছি না। সিনাত্রা বলল।

—মনে হয় এরা শত্রুর আক্রমনের আশঙ্কা করছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতে দূরের পাহাড়টার দিক থেকে অনেক মানুষের চিৎকার শব্দ ভেসে এল। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে বুনো গমের ক্ষেত দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরেই দেখা গেল সেই গম ক্ষেত মাড়িয়ে বর্শাহাতে একদল যোদ্ধা ছুটে আসছে। এখানকার যোদ্ধারাও ততক্ষণ ধ্বনি তুলেছে—বু-উ-উ-উ-ম্। তারাও বর্শাহাতে লড়াই করার জন্যে তৈরী হল।

গমক্ষেত পার হয়ে ঐযোদ্ধার দল আসতেই এখানকার যোদ্ধার দল ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গম ক্ষেত তছনছ করে শুরু হল দু'দলের লড়াই। দু'দলই

বর্শা দিয়ে লড়াই করছে। তুমুল লড়াই চলল। গমক্ষেত ভরে উঠল আর্তচিৎকার আর গোঙানিতে। পাহাড়ের দিক থেকে আগত যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। কাঠের গরাদের ফাঁক দিয়ে লড়াই দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস মন্তব্য করল—পাহাড়ের দিক থেকে যারা এসেছে ওরা হেরে যাবে। ওরা সংখ্যায় কম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এদিকের যোদ্ধাদের হাতে হয় আহত হতে লাগল নয় তো মরতে লাগল। ওরা পিছু হটতে লাগল। কিন্তু যারা বেঁচে রইল গমক্ষেতের দিক দিয়ে পাহাড়ের দিকে পালাতে লাগল। এরা পিছু ধাওয়া করল। আরোও মরল। জীবিতরা কোনরকমে পালাল।

বিজয়ী এরা বর্শা উঁচুতে তুলে ধ্বনি তুলল—বু-উ-উ-উ-ম্। ফ্রান্সিস বলল—থাক ---নতুন কারো কাছে আর বন্দী হয়ে থাকতে হবে না। এরা আমাদের নিয়ে কী করে দেখা যাক।

যোদ্ধারা ফিরে এল। যুদ্ধজয়ের আনন্দে উল্লাস চলল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—এরা তো জিতল। কিন্তু আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আমাদের কপালে মুক্তি নেই।

—একেবারে হতাশ হয়ো না। একটা না একটা উপায় হবেই। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

রাতে প্রহরীরা ফ্রান্সিসদের খেতে দিল। গোল রুটি আর সামুদ্রিক মাছের ঝোলমত। মাছও ভাজা নয় আগুনে পোড়ানো। ফ্রান্সিসরা ক্ষুধার্ত ছিল। পোড়া মাছ রুটি পেট পুরেই খেল।

এদিকে বন্দী শত্রুদের জন্য দশেককে নিয়ে আসা হল। সর্দারের হুকুমে তাদের ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ওদের খেতেও দেওয়া হল। ঘরটা বড় বলেই ফ্রান্সিসদের খুব একটা অসুবিধা হল না। সবাই কোনরকমে শুতে পারল।

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয় নি। পালানোর উপায় ভাবছে। শত্রুদের কয়েকজনকে ফ্রান্সিস কাছে ডাকল। লোকটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল লোকটির মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা নয়। ছড়ানো কাঁধ পর্যন্ত। গালে হলুদ সাদা উল্কি আঁকা। ফ্রান্সিস বলল—তোমরা পিতলি? লোকটি মাথা ওঠানামা করল। ফ্রান্সিস বলল—ভাই-সর্দার আমাদের সন্দেহ করেছে তোমাদের সঙ্গে যোগ আছে। অথচ আমরা বিদেশী ভাইকিং। এখানকার কিছুই চিনি না আমরা। লোকটা বোধহয় আন্দাজে কিছু বুঝল। কিছু বললও। ফ্রান্সিস সে কথার কিছুই বুঝল না। তবে এটা বুঝল যে এরা অত্যন্ত ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছে। বুঝল না সর্দার এদের নিয়ে কী করবে?

পরদিন ফ্রান্সিস সবে সকালের খাবার খেয়েছে। সর্দার এল। এখন আর সর্দার তামাক টানছে না। কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে সর্দার দাঁড়াল। তারপর পিতলিদের দিকে তাকিয়ে বলল—পিতলি। তারপর একনাগাড়ে কিছু বলল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল পিতলিদের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও বুঝল পিতলিদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। হয়তো মেরেই ফেলা হবে। তাই কাঠের গরাদের কাছে মুখ নিয়ে বলল—

—পিতালিদের নিয়ে কী করবে?

—শাস্তি—হত্যা। সর্দার বলল।

—পিতলিরা আপনাদের শত্রু ঠিকই। তবে বন্দীদের হত্যা করা উচিত নয়। এরা তো অসহায়। ফ্রান্সিস বলল।

সর্দার মাথা নেড়ে বলল—না—হত্যা।

—আমাদের বন্দী করে রেখেছেন কেন? আমাদের মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—পিতলির বন্ধু—তোমরা—পরে-হত্যা। সর্দার বলল।

—আমরা বিদেশী। জাহাজ চড়ে এসেছি। পিতলিদের নামও শুনেনি কখনো। বন্ধুত্ব তো দূরের কথা। হ্যারি বলল।

—আদেশ—হত্যা। সর্দার একই ভঙ্গীতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই সর্দার কোন অনুরোধই শুনবে না। একরোখা মানুষ। যে কোন সময় ওদের মেরে ফেলতে পারে। তবুও ফ্রান্সিস বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল—আমরা বিদেশী। আমাদের হত্যা করে আপনার কী লাভ?

—সিদ্ধান্ত—হত্যা। কথাটা বলে সর্দার আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—অবস্থা যা বুঝছি এই সর্দার একগুঁয়ে। আমাদের কোনো কথাই শুনবে না। হয়তো পিতলিদের সঙ্গে আমাদেরও হত্যা করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালানো যায় তার উপায় ভাবো। হ্যারি বলল।

—দেখি। তবে একটু সুলক্ষণ আছে। প্রহরী মাত্র একজন। পালাতে হলে একেবারের চেষ্টাতেই পালাতে হবে। না পারলে বিপদের আশাঙ্কা বাড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই চেষ্টাই দেখ।

সেদিন রাতের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস জেগে বসে আছে। নানা চিন্তা মাথায়। ফিরতে দেরি হচ্ছে। মারিয়া বন্ধুরা জাহাজে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় পড়েছে। এদিকে পালাবার উপায়ও ভেবে পাচ্ছে না।

কয়েদঘরের কাঠের গরাদের বাইরে তাকাল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না পড়েছে গম ক্ষেতে। প্রহরীকে দেখল। একটা বর্শায় ভর দিয়ে সে একটা পাথরের ওপর বসে আছে।

এই সময় শাঙ্কো আস্তে আস্তে ওর কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল---ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। চোখ মেলে তাকাল। শাঙ্কো ফিস্ ফিস করে বলল।---কাঠের গরাদ দেখলাম লোহার মত শক্ত। ওটা কাটতে সময় লাগবে। কিন্তু গরাদে বাঁধা বুনো লতাগাছ কাটা যাবে। ফ্রান্সিস আস্তে উঠে বসল। ফিস্‌ফিস করে বলল---পরীক্ষা করে দেখেছো?

—হ্যাঁ। তখন প্রহরীটি খেতে গিয়েছিল। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু একরাতের মধ্যেই কাটতে হবে। পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—পারবো। আমি দুটো লতার বাঁধন কেটেছি। বেশি কাটিনি। খাবার দিতে এসে প্রহরীদের সন্দেহ হতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে কাল রাতে প্রহরীরা খাবার দেওয়ার পর কাজে লেগো। ভোর হওয়ার আগেই পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন। বেশ রাত তখন। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস করে বলল---সজাগ থেকো। ঘুমিয়ে পড়ো না। কিন্তু ঘুমের ভান করে থেকো। পিতালি বন্দীরা ফ্রান্সিসের নির্দেশ বুঝল না। ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

একসময় ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কাঠের গরাদের কাছে গেল। চাঁদের আলোয় দেখল---প্রহরী একটা পাথরে বসে আছে। হাতের বর্শাটায় ভর রেখে। বোঝাই যাচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস করে ডাকল—শাঙ্কো।

শাঙ্কো তৈরীই ছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গেল। বুকের পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বার করল। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুনো লতার বাঁধন কাটাতে লাগল। একটু শব্দ হতে লাগল। কিন্তু তাতে প্রহরীর তন্দ্রাভাব কাটল না। একইভাবে ঝিমুতে লাগল। একটার পর একটা লতার বাঁধন কাটতে লাগল শাঙ্কো। ফ্রান্সিস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রহরীটির দিকে। প্রহরীটির কোন নড়াচড়া নেই। গমের ক্ষেতের ওপর দিয়ে মুক্ত হাওয়া জোরে বইছে। আরামে প্রহরীটি বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

কাঠের ধাঁচায় বাঁধা চার পাঁচটা কাঠের গরাদ শাঙ্কো খুলে ফেলল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসে প্রহরীটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনেই মাটির ওপর পড়ে গেল। প্রহরীটি কোন শব্দ করার আগে বুনো লতার ফাঁস প্রহরীটির মুখ চেপে বেঁধে দিল। প্রহরীটির মুখ দিয়ে কোঁ কোঁ শব্দ বেরিয়ে আসছিল। শাঙ্কো ওর গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় কষালো। শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। শাঙ্কো দ্রুত হাত দুটো লতা দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলে উঠল---পালাও। জেগেই ছিল। শাঙ্কোর কথা কানে যেতেই হ্যারি দ্রুত কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল---গম ক্ষেত পার হয়ে---পাহাড়ের দিকে। ফ্রান্সিসের এই দিক নির্দেশের কারণ ছিল। কারণ সামনের দিকে কাঁটাগাছের বেড়া। দরজাও ছোট।

সবাই গমক্ষেতের দিকে ছুটল। ওদিকে পিতালির কয়েকজন দেখল কয়েদ ঘরের দরজা খোলা। ফান্সিসরা গমক্ষেত দিয়ে পাথড়ের দিকে ছুটেছে। ওরা অন্য বন্ধুদের ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তারপর সবাই ফ্রান্সিসদের পিছু পিছু ছুটল।

গমের গাছে ফ্রান্সিসদের বুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। ওরা প্রানপণে ছুটছে পাহাড়টার দিকে। চাঁদের আলোয় চারদিক বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

গমের ক্ষেত শেষ। শুরু হল পাথর ছড়ানো মাটি।

সবাই যখন পাহাড়টার নিচে পৌঁছাল তখন ওরা ভীষণ হাঁপাচ্ছে। পিতলিরাও পৌঁছল তখন। ফ্রান্সিস বলল—দাঁড়াও। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একজন পিতালিকে জিঞ্জেস করল—সমুদ্র কোন দিকে? সেও হাঁপাচ্ছে তখন। সে মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিসের কথাটা বুঝল না। ফ্রান্সিস এবার হাত দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ইঙ্গিত করল। এবার লোকটা বুঝল। হাত তুলে পূর্বদিক দেখাল। একটা বনভূমির ওপারটা দেখাল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—পূর্বদিকে ছোটো। কিছুটা ছুটে গিয়ে বনভূমিতে ঢুকল। যাহোক গাছের আড়াল পেল। দূরে সর্দারের এলাকা থেকে খুব অস্পষ্ট হৈহল্লার শব্দ ভেসে এল। ফ্রান্সিসরা এখন নিরাপদ।

ঘন বনভূমি। গায়ে গায়ে গাছগাছালির জটলা। সেই গাছ গাছালির মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা ছুটল। ঠিক ছুটতে পারছিল না। পায়ের নিচে মাটি জলে ভেজা। পেছল। সাবধানে গাছের গুড়িতে পা রেখে রেখে ছুটতে হচ্ছিল। যে কোনসময় পিছলে পড়ে যাওয়ার সমস্যা। কাজেই ফ্রান্সিসদের ছোটার বেগ কমে আসছিল।

একসময় বনভূমি শেষ। সামনেই সমুদ্র। তখন সূর্য উঠছে। পূব আকাশে কমলা রঙের জোয়ার। সূর্য উঠল। সকালের নরম আলোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ওরা ছুটল।

মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে ওরা। কিছুদূর যেতেই দেখল তীরভূমির কাছে ওদের জাহাজ নোঙর করা আছে। তিনজনেই আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। জাহাজ থেকেও ধ্বনি উঠল —ও—হো—হো।

নৌকা তীরের বালিয়াড়িতে তোলা। ফ্রান্সিসরা দ্রুতহাতে নৌকা টেনে নিয়ে জলে ভাসাল। ফ্রান্সিস বৈঠা তুলে নিল। নৌকা জাহাজের দিকে চলল। নৌকা জাহাজের গায়ে লাগল। দড়ির মই খোলা হল। ফ্রান্সিসরা একে একে জাহাজে উঠে এল।

তখনই দেখা গেল সেই সর্দারের যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে তীরভূমির বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে ছুটে আসছে।

ওরা সংখ্যায় তিরিশ চল্লিশজন। তীরে জলের কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। জাহাজ বেশ কিছুটা দূরে। ওখান থেকেই কয়েকজন বর্শা ছুড়ল। কিন্তু বর্শা গুলো জলে পড়ল। ওরা হতাশ চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল---ফ্রান্সিস---লড়াই।

---না। আমরা চলে যাব। তারপর ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল---নোঙর তোল। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চালাও। ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। একবার ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজ চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। হ্যারি বেরিয়ে এল। বলল—এবার কী করবে?

—ডাঙা খুঁজবো। দেখি—কবে ডাঙার দেখা মেলে। তারপর বলল—নজরদার পেড্রোকে ডেকে নিয়ে এসো। পেড্রোকে আনা হল। ফ্রান্সিস বলল—পেড্রো—ভালোভাবে নজর রাখো। --ডাঙার দেখা পাও কিনা।

জাহাজ চলল। পেড্রোও মাস্তুলের ওপর থেকে নজর রাখল কোনদিকে ডাঙার দেখা পায় কিনা।

জাহাজ চলেছে। দিন যায় রাত যায়। ডাঙার দেখা নেই । পেড্রো তীক্ষ্ন নজর রেখে চলেছে।

সেদিন গভীর রাত। আমাবস্যার রাত। চারিদিক ঘন অন্ধকার। আকাশে উজ্জ্বল তারার ভিড়। চাঁদও নেই। ক্ষীণ আলোয় যাহোক চারিদিক খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কেবিনঘরে ডেকএর ওপরেও কয়েকজন ভাইকিং ঘুমিয়ে আছে। সমুদ্রের ফুর ফুরে হাওয়ায় তাদের ঘুম বেশ গভীর। রাতে খাওয়ার পর একটু তন্দ্রা মত এসছিল। সেটা কাটিয়ে উঠলেও রাত একটু বাড়তে পেড্রো নিজের আসনে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুতেই জেগে থাকতে পারল না। ফ্রান্সিস ওকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে। বিশেষ করে রাতে এবং অন্ধকার রাতে ও যেন বেশি সজাগ থাকে। অন্য কোন জাহাজ বিশেষ করে জলদস্যুদের জাহাজ যেন ওদের জাহাজ দখল করতে না পারে। পেড্রো সেইসব ভুলে গেল সেই রাতেই। কাজেই লক্ষ্য করল না একটা জাহাজ ওদের জাহাজের দিকে দ্রুত আসছে। জাহাজটাও বড় নয়। কাছে আসতেই জাহাজের মাস্তুলের উড়তে থাকা সাদা পতাকা নামিয়ে ফেলা হল। উড়ল কালো পতকা। মাঝখানে মড়ার মাথা আর হাড়ের ঢ্যাঁড়া আঁকা। বোঝাই গেল জলদস্যুদের জাহাজ।

পেড্রো তখন গভীর ঘুমে। ও আর বন্ধুদের সজাগ করতে পারল না। জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা একটু ঝাঁকুনি খেল। কেবিনঘরে কয়েকজনের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ে জাহাজের গায়ে। তখন একটু ঝাঁকুনি লাগেই। ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

একদল জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকএ উঠে এল। যারা ডেকএ ঘুমিয়ে ছিল তাদের গায়ে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙাল। ঘুম ভেঙে ওরা উঠে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের দল দাঁড়িয়ে। ওরা ভীত হল। আবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লাম। আবার জাহাজের কয়েদঘরে বন্দীর জীবন। একজন বলশালী জলদস্যু এগিয়ে এল। স্পেনীয় ভাষায় চাপাগলায় বলল—টুঁ শব্দটি করবে না। এখানেই বসে থাকো।

এবার কিছু জলদস্যু এখানে পাহারায় রইল। বাকিরা সিঁড়ি দিয়ে নিচের কেবিনঘরের দিকে। দু'জন অস্ত্রঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। বাকিরা কেবিনঘরে ঢুকে ঢুকে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ভাইকিংদের ঘুম ভাঙাতে লাগল।

সিনাত্রার একটু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দরজা দিয়ে জলদস্যুদের ঢুকতে দেখেই ও বিপদ আঁচ করল। ও বিছানা থেকে গড়িয়ে এক কোনায় পড়ল। জলদস্যুরা বন্ধুদের ঘুম ভাঙিয়ে বন্দী করে নিয়ে চলে যেতে সিনাত্রা একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ কানে আসছে। জলদস্যুদের নজর এড়ানো গেছে।

ও কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘরের সামনেই দেখল দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে পাহারাত। এরা জলদস্যু হলেও লড়াইয়ের কায়দা কানুন ভালোই জানে।

সিনাত্রা ফিরে এল। সিঁড়ি দিয়ে ডেকএ উঠে এল। দেখল বন্ধুদের সব ডেকএ বসিয়ে রেখেছে। একজন জলদস্যু ওকে তরোবারি দেখিয়ে বসতে ইঙ্গি ত করল। সিনাত্রা কোন আপত্তি না করে বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ল।

ওদিকে নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় ওর আসনে ঘুমিয়ে ছিল। একজন জলদস্যু সেখান থেকে উঠে পেড্রোর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিল। ঘুম ভেঙে পেড্রো লাফিয়ে উঠল। বুঝল বিপদ যা হবার হয়ে গেছে। এখন জলদস্যুদের পাল্লায় পড়েছে। ওরা যা বলবে মেনে নিতে হবে। পেড্রো জলদস্যুদের পিছনে মাস্তুলের থেকে নেমে এল। বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ল।

চারজন জলদস্যু ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিনঘরের দরজার কাছে এল। দরজায় ধাক্কা দিল না। ধাক্কা দিলে ভেতরের লোক সাবধান হয়ে যেতে পারে। আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিল। মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও আর ফ্রান্সিসকে ডাকল না। ভাবল—হ্যারি এসেছে। মারিয়া দরজা খুলতেই খোলা তরোয়াল হাতে চারজন জলদস্যু লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের তখন ঘুম ভেঙে গেছে। ও বিছানার তলা থেকে তরোয়াল বের করবে বলে হাত বাড়াল। মারিয়া ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল। চেঁচিয়ে বলল—না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল।

একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। লোকটার পোশাক-টোশাক দেখে বোঝা গেল লোকটি মাতব্বর গোছের কেউ। লোকটি হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। বললে—কে গান গাইবেন? আসুন। রাজার হুকুম। ফ্রান্সিস সিনাত্রাকে এগিয়ে দিল। সিনাত্রা আর আপত্তি করল না। বেদীর দিকে এগিয়ে গেল মাতব্বরের সঙ্গে।

নাচগান থামতে মাতব্বরটি বেদীতে উঠে এল। চেঁচিয়ে বলল—একজন বিদেশী ভাইকিং এখানে এসেছে। সে একটি গান গাইবে। মাতব্বরটি দেশীয় ভাষায় বলল ফ্রান্সিস আন্দাজে বুঝল।

সিনাত্রা মঞ্চে উঠল। তারপর গান শুরু করল—

সাগরে চলো ভাই
সাগর আমাদের মা—
অন্য কেউ নাই—
চলো সাগর যাই।

মুহূর্তে গান জমে উঠল। কেউই গানের মানে বুঝল না। কিন্তু সুর আর সিনাত্রার সুন্দর গলা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হল। গান শেষ হল। শ্রোতাদের মধ্যে হর্ষ ধ্বনি শোনা গেল। আবার যদি গাইতে বলে এই ভেবে সিনাত্রা দ্রুত বেদী থেকে নেমে এল।

রাজা আসারিয়া ইশারায় সিনাত্রাকে কাছে ডাকল। সিনাত্রা এগিয়ে গেল। রাজা সিনাত্রার পিঠ চাপড়ালেন। রানিও হেসে কিছু বললেন। ফ্রান্সিস বুঝল সিনাত্রার গান শুনে দু'জনে খুশি হয়েছেন। সিনাত্রা ফ্রান্সিসদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আবার বাদ্য বেজে উঠল। এবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানারঙের পোশাক পরে বেদীতে উঠে নাচতে গাইতে লাগল। আসর জমে উঠল।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সেনাপতি রাজারানির আসনের কাছে এল। রাজা রানিকে কিছু বলল। রাজা রানি দ্রুত রাজবাড়ির দিকে চলে গেলেন। ফ্রান্সিসরা বুঝল নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে।

সেই মাতব্বরটি তক্ষণে মঞ্চে উঠে এসে নাচ গান থামিয়ে দিল। চিৎকার করে বলে উঠল—সাবধান—সবুজ রাজা আমাদের দেশ অক্রমন করেছে। সবাই যে যার বাড়ির দিকে যাও।

দর্শকদের মধ্যে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। সবাই যে যার বাড়ির দিকে ছুটল। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল। কিছু দর্শক ভিড়ের চাপে মাটিতে পড়ে গেল। আহত হল। ফ্রান্সিস বলল—লড়াই শুরু হবে। চলো অতিথি শালায় ফিরে যাই।

অতিথিশালায় ওরা ফিরে আসছে তখনই চাঁদের আলোয় দেখল

পশ্চিমদিকের রাস্তায় লড়াই শুরু হয়েছে। তরোয়ালের ঠোকাঠুকি আর্তনাদ গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ঢুকল। হ্যারিও ওদের পেছনে পেছনে গেল। বিছানায় বসতে বসতে শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—এখনই বাইরের রাস্তায় গেলে বিপদে পড়বো। যা বুঝতে পারছি এখন বটতলার কাছাকাছি লড়াই চলছে। নিরস্ত্র অবস্থায় ওদিকে গেলে মারা যেতে পারি। এখানেই অপেক্ষা করি। দেখি লড়াইয়ে কারা জেতে। ফ্রান্সিস বলল।

বাইরে তুমুল লড়াই চলছে তখন। ফ্রান্সিসরা চুপ করে বসে রইল। বাইরে চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি চলল।

প্রায় ঘন্টাখানেক লড়াই চলল। আস্তে আস্তে চারিদিক শান্ত হয়ে এল। দ্বারী ঘরে ঢুকে একটু দূরে বসে ছিল। ফ্রান্সিসরা দ্বারীকে বলল—দেখ তো ভাই লড়াই থামল কিনা। দ্বারী দরজার কাছে গেল। চারিদিক ভালো করে দেখে ফিরে এল। মাথা নেড়ে বলল—আমরা হেরে গেছি। সবুজ রাজার সৈন্যরা দুটো বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। তখন সত্যি মানুষদের ভয়ার্ত চিৎকার ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—তুমি ভাই পালিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—না। সেনাপতি আপনাদের দেখাশুনোর জন্যে রেখে গেছেন। আমি হুকুম মানবো। ফ্রান্সিস আর কিছুই বলল না। ফ্রান্সিসরা ঘুমের আশা ছাড়ল। তিনজনে সারারাত জেগে রইল।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। চারদিক শান্ত। তার মধ্যে মাঝে মাঝে সবুজ রাজার সৈন্যদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ভোর হল। হঠাৎ বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস ভাবল—আবার বন্দী জীবন শুরু হবে। হয়তো সবুজ রাজার সৈন্যরা আসছে। ফ্রান্সিসের অনুমানই ঠিক হল। রাজা আসারিয়া ঘরে ঢুকলেন। পেছনে পাঁচজন খোলা তরোয়াল হাতে সবুজ পোশাক পরা সবুজ রাজার সৈন্য। রাজাকে ওরা ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু'জন যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে দরজার সামনে দাঁড়াল। একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাকই হল। বলল—তোমরা কে?

—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। সিনাত্রা বলল।

—ঠিক আছে। সকালে তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

—বেশ। সিনাত্রা বলল। যোদ্ধাটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—মানাবর রাজা আপনি এখানে বসুন। রাজা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। রাজার মুখ শুকনো। মাথার চুল উস্কোখুসকো। বোঝাই যাচ্ছে সারারাত ঘুমোন নি। ফ্রান্সিস বলল—আপনি ভাল আছেন তো?

—শরীর ঠিক আছে। কিন্তু হেরে গেলাম। মন ভালো নেই। রাজা বললেন।

—রানি কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—অন্দর মহলে—নজর বন্দী। রাজা বললেন।

—সেনাপতি? ফ্রান্সিস বলল।

—জীবিত সৈন্যদের নিয়ে আমি তাকে পালাতে বলেছি। আমি আর রক্তপাত চাইনি। রাজা বললেন।

—কিন্তু এই অতিথিশালায় আপনাকে বন্দী করল কেন? শাঙ্কো বলল। রাজা ম্লান হেসে বললেন—আমার রাজত্বে কয়েদঘর নেই। আমি মানুষের সততায় বিশ্বাস করি। ফ্রান্সিস রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করল। এমন একজন উদার মনের মানুষ আজ অসহায়।

—আপনি হেরে গেলন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমার সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি আর মৃত্যু চাইনি। ওদের হার স্বীকার করতে বলেছি। আর বলেছি সেনাপতির সঙ্গে পালিয়ে যাও। সবুজ রাজাকে তো জানি। ওঁর মতো নৃশংস রাজা কাউকে বেঁচে থাকতে দিতে পারেন না। এই নিয়ে সবুজ রাজা চারবার আমার রাজত্ব আক্রমন করল। আমার বীর সৈন্যদের কাছে তিনবার হেরে ফিরে গেছেন। এবার আর ফেরাতে পারলাম না। একটু থেমে রাজা বলতে লাগলেন—আমার সৈন্য সংখ্যা কম ছিল। গতবছর এখানে অনাবৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার অনেক বীর সৈন্য মারা গেছে। আসার সময় সমুদ্রতীরে একটা জাহাজ বোধহয় দেখেছো।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কোন লোক ছিল না। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। জাহাজটা ওখানকার জেলেরাই দেখাশোনা করে। এই জাহাজে করে বিদেশ থেকে খাদ্য আনিয়েছিলাম। তাতে সবাইকে বাঁচাতে পারিনি। শুনলে অবাক হবে সবুজ রাজার দেশেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তিনি তাঁর বহু প্রজাকে আমার রাজত্বে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সেই ক্ষুধার্ত প্রজাদের ঠেলে ঐ রাজত্বে পাঠিয়ে দিইনি। বরং ওদের আশ্রয় দিয়েছি—খাদ্য দিয়েছি। একটু থেমে বললেন—ঐ যে বললাম আমার অনেক বীর সৈন্য সেই-দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল। সবুজ রাজা জানতেন সেটা। বুদ্ধি করে তাই এবার আমাদের দেশ আক্রমন করলেন। কম. সৈন্য নিয়ে লড়াই করে এবার আমরা হেরে গেলাম। আমার সৈন্যরা প্রানপণ লড়াই করেছে। আমি ওদের লড়াই চালাতে দিইনি। রাজা থামলেন।

—বাকি সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি কোথায় গেছেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলেন।

—ঐ উত্তরের পাহাড়ের দিকে। ঐদিকে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে বোধহয়। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। ওখানে যাবো। সেনাপতি আর সৈন্যদের খুঁজে বার করব। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এখান থেকে পালাবে কী করে? রাজা বললেন।

—এখান থেকে অনেক কঠিন পাহারার মোকাবিলা করেছি আমরা আর পালিয়েছি। এই ঘরের তো দরজাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো চেষ্টা করে। রাজা একটু হতাশার সুরেই বললেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনাকে মুক্ত করবই। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আসারিয়া আর কিছু বললেন না।

সকালের খাবার দিয়ে গেল প্রহরীর একজন। রুটি আর আনাজপাতির ঝোল। এটা রাজার খাদ্য নয়। বন্দীর খাদ্য। কিন্তু রাজা নিঃশব্দে খেলেন। অন্য খাবার চাইলেন না।

একটু পরে একজন বেশ মোটা লোক এল। তর কোমরে তরোয়াল ঝুলছে। গায়ে সবুজ ঢোলা হাতা জামা। প্রহরীরা একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। বোঝা গেল— লোকটি সেনাপতি।

ঘরে ঢুকে সেনাপতি বলল—সবাই চলুন। রাজ দরবারে।

রাজাকে নিয়ে ফ্রান্সিসের ঘরে থেকে বেরিয়ে এল। প্রহরীদের পাহারায় রাজবাড়ির সামনে এল সবাই। বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকল। দুটো ঘর পেরিয়ে রাজসভাকক্ষ। দুটো কাঠের আসন পাতা। তাতে গাঢ় লাল রঙের মোটা কাপড় পাতা। আসনে সবুজ রাজা বসা। দুপাশের আসনের একটায় সেনাপতি গিয়ে বসল। অন্যটা একজন বৃদ্ধ বসে। তিনি বোধহয় মন্ত্রী। সবুজ রাজার ঝকঝকে সবুজ রাজপোশাক। সন্দেহ নেই কাপড়টা বেশ দামি। একটু ভারি গলায় রাজা বলল—এসো—আমাদের প্রিয় বন্ধু রাজা আসারিয়া। রাজা আসারিয়া কোন কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়ালেন। সবুজ রাজা তাকে বসতেও দিল না।

সবুজ রাজা মন্ত্রীর দিকে তাকাল। বলল—মন্ত্রী মশাই— বলুন তো রাজা আসারিয়া কী শাস্তি দেওয়া যায়।

—ফাঁসি দিন। মন্ত্রী মৃদু স্বরে বলল।

—ওটা তো অল্পক্ষণের শাস্তি। আমি চাই একটু কষ্ট ভোগ করে মরুক। বেশ তরোয়াল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বর্শা দিয়ে শরীরটা এফোঁড় ওফোঁড় করে— কথাটা শেষ না করে সবুজ রাজা হা হা করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস ভাবল রাজা আসারিয়া ঠিকই বলেছিলেন সবুজ রাজা নৃশংস। রাজা আসারিয়া কোন কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—যাক গে—যে কথা বলছিলাম। তোমার এক পূর্বপুরুষ রাজা সামেনা জলদস্যু ছিল। তাই কিনা? সবুজ রাজা বলল।

—হ্যাঁ। উনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। রাজা বললেন।

—সে যাক। কিন্তু জলদস্যুতা করে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিল। জনশ্রুতি বলে সে এই রাজ্যেরই পাতালঘরে তার ধন সম্পদ গোপনে সে রেখে গেছে। সবুজ রাজা বলল।

—হ্যাঁ আমরাও শুনেছি। রাজা আসারিয়া বলল।

—সেই ধনসম্পদ কোথায় আছে? সবুজ রাজা প্রশ্ন করলেন।

—আমি জানি না। রাজা আসারিয়া বললেন।

—তুমি খোঁজখবর করনি? সবুজ রাজা জানতে চাইল।

—না। প্রয়োজন মনে করিনি। রাজা বললেন।

—কেন? সবুজ রাজা একটু ক্রুদ্ধ হয়েই বলল।

—ওটা অভিশাপ্ত ধনসম্পদ। নিরীহ জাহাজযাত্রীদের জাহাজ লুঠ করে আনা ধন সম্পদের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। রাজা আসারিয়া দৃঢ়স্বরে বললেন।

—কিন্তু আমার আছে। তোমার রাজত্ব এই জন্যেই বার বার জয় করার চেষ্টা করেছি। এবার জয়ী হয়েছি। এখন এই রাজ্য আমার। আমি এখন এই রাজ্যের রাজা। তোমার সিংহাসনে বসে আছি। আমি সেই গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করতে চাই। সবুজ রাজা বলল।

—বেশ। চেষ্টা করুন। রাজা আসারিয়া বললেন।

—কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। সবুজ রাজা বলল।

—আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব? কারণ আমি সেই ধনসম্পদ সম্বন্ধে নিজেই কিছু জানি না। রাজা আসারিয়া বললেন।

—অসম্ভব। নিশ্চয়ই জানো। সবুজ রাজা গলায় জোর দিয়ে বলল।

—বললাম তো জানি না। শুধু জানি একটা পাতাল ঘর আছে।

—কোথায় সেই পাতাল ঘর? সবুজ রাজা প্রশ্ন ছুঁড়ল।

—আমি কিছুই জানি না। রাজা আসারিয়া মাথা নেড়ে বললেন।

—তুমি আমার কাছে সত্য কথাটা লুকোচ্ছো।

—তরোয়াল আর বর্শার খোঁচা খেলে সব সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে। সবুজ রাজা বলল।

রাজা আসারিয়া কোন কথা বললেন। সবুজ রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—এখনও সত্যি কথাটা বলো।

—এখন তো এই রাজ্য আপনার। সন্ধান করুন সেই গুপ্ত ধন ভান্ডারের। সবুজ রাজা আবার চেঁচিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ। সারা রাজ্য আমি তোলপাড় করে ফেলবো। ঐ ধনভান্ডার আমার চাই।

শাঙ্কো চাপা গলায় বলল—ফ্রান্সিস চেষ্টা করবে? ফ্রান্সিস বলল—এই জঘন্য চরিত্রের লোকটার জন্য আমি এক আঙ্গুলও নাড়বো না। জাহান্নামে যাক। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দেশীয় ভাষায় কথা বলছিল। সবুজ রাজা এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী বলাবলি করছিলে তোমরা?

—বলছিলাম—আপনি মহান রাজা। ফ্রান্সিস বলল।

—রসিকতা? সবুজ রাজা হো হো করে হেসে উঠল। হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বলল —জানো—এই মূহূর্তে তোমার মুন্ডু নামিয়ে দিতে পারি।

—আমি নিরস্ত্র। কাজেই—ফ্রান্সিস আর কথাটা শেষ করল না।

—যদি তোমাকে তরোয়াল দেওয়া হয়। সবুজ রাজা বলল।

—তাহলে মুন্ডু বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতাম। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস। কিন্তু ফ্রান্সিস সবুজ রাজাকে সহ্য করতে পারছিল না। এবার সবুজ রাজা বলল—তোমরা বিদেশী?

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

—এখানে কী করে এলে? সবুজ জিজ্ঞেস করল।

—জাহাজে চড়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—শুনেছি তোমরা সমুদ্রে জলদসুতা কর। সবুজ রাজা বলল।

—একথাটা অনেক জায়গায় অনেকবার শুনেছি আমরা। কথাটা গায়ে মাখি না। শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের ফাঁসিতে লটকালে কেমন হবে? সবুজ রাজা একটু হেসে বলল।

—আপনি জয়ী রাজা। আমাদের নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু জানতে চাইছি আমরা কী অপরাধে অপরাধী? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আসারিয়ার হয়ে আমার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছো তোমরা। সবুজ রাজা বলল।

—আমরা অতিথিশালায় ছিলাম। একমুহূর্তের জন্যেও ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। সবুজ রাজা গলায় জোর দিয়ে বলল।

—আপনার সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করুন। উনি আমাদের লড়াইয়ের সময় দেখেছেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল। সবুজ রাজা সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—না মান্যবর রাজা—আমি ওদের লড়াই করতে দেখিনি।

—যাকগে—তোমাদের কালকেই ফাঁসি দেওয়া হবে।

—কারণটা জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—তোমাদের সাহস তো কম নয়। আমার মুখের ওপর কথা বলছো। বেশ গলা চড়িয়ে রাজা বলল। শাঙ্কো আবার মৃদুস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। এবার রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—রাজা আসারিয়া আর এই তিন জনকে হত্যার আদেশ দিলাম।

—রানির প্রতি কী সাজা হল? রাজা আসারিয়া বললেন।

—রানি অন্তঃপুরে বন্দিনী হয়ে থাকবে। কথাটা বলে রাজা গট্ গট্ করে চলে গেল।

চার পাঁচজন সৈন্য এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে অতিথিশালায় নিয়ে এল। ঘরের বাইরে দু'জন প্রহরী দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল রক্ষী শুয়ে গোঙাচ্ছে। শাঙ্কো ওর কাছে এল। বলল—কী হয়েছে তোমার?

—পালিয়ে ছিলাম। কিন্তু সবুজ রাজার সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে মেরেছে। তবে একেবারে মেরে ফেলেনি। রক্ষী আস্তে আস্তে গোঙাতে লাগল। রাজা আর ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল।

—কী দেখলে বাইরে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সাংঘাতিক ব্যাপার। সবুজ রাজার সৈন্যদের অত্যাচার চরমে উঠছে। স্ত্রীলোক শিশুরা—কেউ বাদ যাচ্ছে না। নির্বিবাদে সবাইকে হত্যা করছে। যারা কোনরকম বেঁচেছে তারা উত্তরে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। সবুজ রাজার সৈন্যরা এখন হত্যা করার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কপাল জোরে আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি। রক্ষী বলল।

—সবুজ রাজার মত ওর সৈন্যরাও নৃশংস। রাজা আসারিয়া মৃদুস্বরে বললেন। শাঙ্কো ভাবল সুযোগ পেলে এই প্রহরীদের হত্যা করবে।

ফাঁসির কথা শুনে সিনাত্রা খুবই ভেঙে পড়ল। একটু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—ফ্রান্সিস— আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

—কিছু ভেবো না। অত হতাশ হয়ে পড়লে কোন কাজই হয় না। শাঙ্কো বলল।

—আমরা ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবো? সিনাত্রার কণ্ঠে সংশয়।

—শোন সিনাত্রা—ফ্রান্সিস বলল—মনে জোর রাখো। শুধু শরীরের জোরে সব কাজ হয় না। পালানোর ছক আমার কষা হয়ে গেছে। শুধু নরহত্যা আমি চাই না। সেটাই করতে হবে। বাধ্য হয়ে। রাজা আসারিয়া ফ্রান্সিসের কথা শুনলেন। আস্তে বললেন—তাহলে আমরা বাঁচবো?

—হ্যাঁ মান্যবর রাজা। ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করুন। তবে সব কাজ আমাদের যত দ্রুত সম্ভব সারতে হবে। সবুজ রাজা আমাদের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। কালকেই কাজেই আজ রাতেই পালাতে হবে ফ্রান্সিস বলল। রাজা ফ্রান্সিসের কথা ঠিক বুঝলেন না। তবে আর কোন কথা বললেন না।

রাত হল। একটু রাতে ফ্রান্সিসদের খাবার এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—কেউ ঘুমবে না। মান্যবর রাজা আপনিও ঘুমুবেন না।

—বেশ। রাজা মৃদুস্বরে বললেন।

একসময়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। খোলা দরজার কাছে গিয়ে বলল—একবার ঘরে এসো তো?

—কেন? কী হল? প্রহরীটি জিজ্ঞেস করল।

—মশালগুলো নিভিয়ে দিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? বেশ তো আলো পাচ্ছো। প্রহরীটি বলল।

—আলো চোখে লাগছে। ঘুম আসছে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। যেমনটি চাও। প্রহরটি বলল। তারপর তরোয়াল কোমরে গুঁজে ঘরের মধ্যে ঢুকল। উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মশাল দুটো নিভিয়ে দিল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এক লাফে উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। তারপর অন্ধকারে নিশানা ঠিক করে প্রহরীটির বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিল। প্রহরীটির মুখ থেকে কোন শব্দই বেরুলো না। ও বিছানার ওপর পড়ে যাচ্ছিল। শাঙ্কো ওকে চেপে ধরে বিছানার ওপর আস্তে শুয়ে দিল। কোন শব্দ হল না।

ততক্ষণে ফ্রান্সিস বাইরে চলে এসেছে। অন্য প্রহরীটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে দ্রুত তরোয়াল তুলে প্রহরিটির বুকে বসিয়ে দিল। একটা মৃদু 'ওক্' শব্দ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। দু'একবার এপাশ ওপাশ করে প্রহরীটি স্থির হয়ে গেল।

শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—বাইরের আলোটা? ফ্রান্সিস বলল—ওটা থাক। নইলে সৈন্যদের সন্দেহ হবে। মান্যবর রাজা সিনাত্রা—বাইরে আসুন সব। ঐ জঙ্গলের দিকে ছুটুন সবাই।

বাইরে চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। তবে আবছা সবকিছু দেখা যাচ্ছে।

রাজবাড়ির আড়ালে আড়ালে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে ছুটল সবাই। রাজ বাড়ির আড়াল ছাড়িয়ে রাস্তায় নামল সবাই। এইভাবে পালানো যাবে রাজা আসারিয়া ভাবতেও পারেন নি। সেটাই ঘটল। রাজা মনে মনে ফ্রান্সিসের বুদ্ধির প্রশংসা করলেন।

রাস্তার ডানদিকেই বনভূমির শুরু। সবাই রাস্তা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এতক্ষণে আড়াল পাওয়া গেল। দূরে রাজবাড়ির কাছে হৈ হল্লা ডাকাডাকি শোনা গেল। ওরা বুঝেছে বন্দীরা পালিয়েছে। তাদের সঙ্গে রাজাও পালিয়েছেন।

বনে ছাড়া ছাড়া গাছ। ছুটতে সুবিধে হচ্ছিল। গুঁড়িতে পা রেখে ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে চলল সবাই।

এবার ফ্রান্সিস থামল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। কম বেশি সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মান্যবর রাজা এখানে বা পাহাড়ে কোথাও আশ্রয় নেবার মত জায়গা আছে?

—আছে। মনে হয় সেনাপতি বাকি সৈন্যদের নিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে। রাজা বললেন।

—কোথায় সেটা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একটা বড় ঘর এই বনে তৈরী করিয়েছিলাম। আমার ঈশ্বরচিন্তার ঘর। মাঝে মাঝে রাজবাড়ি ছেড়ে এখানে এসে থাকি। ঈশরের ধ্যান করি। কিছুদিন থেকে আবার রাজবাড়িতে ফিরে যাই। রাজা বললেন।

—ঘরটা খুঁজে পাবেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কেন জানি না সেই ঘরের চারপাশের গাছগুলো মরে গেছে। সেই জায়গাটা দেখলেই বুঝতে পারবো। রাজা বললেন।

—তাহলে চলুন। খুঁজে দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল এবার। রাজা হাত তুলে ডানদিক দেখালেন. ডানদিকে চলল সবাই।

হঠাৎ দেখা গেল কিছু মরা গাছ। তখনই অস্পষ্ট দেখা গেল একটা বড় টানা ঘর।

সবাই ঘরটার দরজার কাছে এল। ঘরে ঢোকার দরজাটা হাঁ করে খোলা। সবাই ঘরটায় ঢুকল। অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে আসতে দেখা গেল ঘরের একপাশে একটা বড় বিছানা আর কয়েকটা কাঠের আসন। ঘরে কেউ নেই।

—বোঝা যাচ্ছে সেনাপতি এখানে আশ্রয় নেন নি। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল—সেনাপতি ঠিক কাজই করেছেন। এখানে আশ্রয় নিলে সহজেই ধরা পড়তেন। সবুজ রাজা নিশ্চয়ই সেনাপতি ও সৈন্যদের খোঁজে এখানে তার সৈন্য পাঠাবে। এই বাড়িটার চারপাশে মরা গাছের বন। সহজেই ঘরটা নজরে পড়ত। এখন সেনাপতি অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন সেটা আপনি বুঝতে পারছেন? ফ্রান্সিস রাজা আসিরিয়াকে জিজ্ঞেস করল।

—না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—যাক গে। রাত আর বেশি বাকি নেই। এখানেই বাকি রাতটা কাটাই। কাল সকালে সেনাপতির খোঁজ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল—সবাই যতটা পারো ঘুমিয়ে

নাও। রক্ষীকে বলল—তোমার শরীর ভালো নেই। তুমি বিছানায় শোও। রাজাকে বলল—বিছানা বড়। আপনিও বিছানায় শোন। পরিশ্রান্ত রাজা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রক্ষীও শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা চেয়ার-টেবিলে বসল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওরা এভাবে ঘুমুতে অভ্যস্ত। ফ্রান্সিসও একটা চেয়ার বসল। চোখ বন্ধ করল। কিন্তু ঘুমোল না।

পাখির কিচিমিচির ডাকে ঘুম ভাঙল সকলের। ফ্রান্সিস বলল—এখনই চলো সব। সেনাপতি আর সৈন্যদের খুঁজে বার করতে হবে। ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ঐ দুটো পাহাড়ের কোথাও গুহাটুহা আছে?

—আমি ঠিক বলতে পারছি না। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। চলুন খুঁজে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই বনের মধ্যে দিয়ে উত্তরমুখো চলল। কিছু পরেই বন শেষ। সামনে দুটো পাহাড়। ডানদিকের পাহাড়টা সবুজ ঘাসে ঢাকা। বাঁদিকের পাহাড়টার অন্যরূপ। পাহাড়টায় গাছ নেই, ঘাস নেই। রুক্ষ ধূসর রঙের পাহাড়। দুটো পাহাড়ের বৈপরীত্য লক্ষ্য করল ফ্রান্সিস। বুঝল গুহা থাকলে বাঁদিকের রুক্ষ পাহাড়টাতেই আছে। ডানদিকের পাহাড়ে গুহাটুহা থাকার সম্ভাবনা কম।

ও বাঁদিকের পাহাড়টার দিকে চলল। কিছুদূর যেতেই সামনে দুই পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকামত। ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে উপত্যকটায় নামল সবাই। চারদিকে তাকিয়ে সবাই গুহামুখ খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোন গুহামুখ দেখল না।

—মান্যবর রাজা—ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—আপনি জোর গলায় সেনাপতিকে ডাকুন। রাজা দুই হাতের তালু গোল করে ডাকলেন—

—সেনাপতি—কোথায় আছেন? পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল—

—এন-এন-এন। কিছুক্ষণ রাজা অপেক্ষা করলেন। পরে আবার ডাকলেন। প্রতিধ্বনিত হল এন-এন-এন। কিন্তু সেনাপতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—চলুন—পাহাড়ের ওপাশে যাই। ফ্রান্সিস বলল। সবাই পাহাড়টা ঘুরে ওপাশে গেল। রাজা আবার ডাকলেন। কিন্তু সেনাপতির কোন সাড়া নেই।

আরো কিছুটা গিয়ে এবার ফ্রান্সিস ডাকল—

—সেনাপতি—মান্যবর রাজা এসেছেন। বারকয়েক ডাকতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল কিছুটা উঁচুতে একটা পাথরের চাঁই নড়ছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—ঐখানে গুহা আছে। চলুন।

সবাই পাথরের ওপর পা রেখে রেখে সেই পাথরের চাঁইটার সামনে এল। ততক্ষণে পাথরের চাঁইটা অনেকটা সরে গেছে। গুহার মুখ দিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে এল। সঙ্গে দুজন সৈন্যও বেরিয়ে এল।

সেনাপতি এগিয়ে এসে বলল—আসুন মান্যবর রাজা—

আমরা এই গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছি। শুনলাম আপনি বন্দী হয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। তারপর ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বললেন—এদের জন্যে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

সবাই গুহার মধ্যে ঢুকল। কয়েকজন সৈন্য মিলে পাথরের চাঁইটা দিয়ে গুহামুখ আটকে দিল। অবশ্য একেবারে বন্ধ করে দিল না। কিছুটা ফাঁক রাখল বাতাস চলাচলের জন্যে।

গুহার মধ্যে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল বেশ কিছু সৈন্য গুহার পাথুরে মেঝেয় শুয়ে বসে আছে। গুহার মাঝখানে তরোয়াল-বর্শা স্তূপ করে রাখা। একপাশে রান্নার জায়গা।

একটা মোটা কাপড় গুহার মেঝেয় দেয়াল ঘেঁষে পাতা ছিল। সেনাপতি রাজাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাল। রাজা চুপ করে বসে রইলেন।

ফ্রান্সিসরাও বসল। ফ্রান্সিস পাথুরে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। শুনল রাজা আর সেনাপতির মধ্যে কথাবার্তা চলছে। সেনাপতি বলল—মান্যবর আপনার শরীর ভালোতো?

—হ্যাঁ শরীর ভালো। কিন্তু মন ভালো নেই। কী করে সবুজ রাজার দখল থেকে রাজ্য উদ্ধার করবো তাই ভাবছি। রাজা বললেন। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস উঠে বসল। আস্তে আস্তে রাজার কাছে গেল। বলল—মান্যবর, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার জাহাজ সমুদ্রের যে ঘাটে আছে আমার বন্ধু সেখানে যাবে। আমাদের জাহাজ থেকে আমার সব বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসবে। আমরা কৌশলে লড়াই করবো যাতে অল্প সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে জেতা যায়।

—আমি তো কোন আশা দেখছি না। রাজা বললেন।

—নিরাশ হবেন না। আমি ফ্রান্সিস—প্রতিজ্ঞা করছি আপনার রাজত্ব আপনাকে ফিরিয়ে দেব। রাজা কিছু বললেন না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের কাছে ফিরে এল। বলল—শাঙ্কো সিনাত্রা—আমি স্থির করেছি এই মহানুভব রাজা আসারিয়ার হয়ে আমরা লড়াই করবো। শাঙ্কো তুমি আজকেই সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রতীরে যাও। কাল রাতে বন্ধুদের নিয়ে এখানে চলে এসো।

—একটা কথা ফ্রান্সিস—শাঙ্কো বলল—সেনাপতির যে সৈন্যদের দেখছি তারা তো সংখ্যায় বেশি নয়। আমাদের বন্ধুরা এসে যোগ দিলেও সংখ্যাটা তো তেমন বাড়বে না।

—সবুজ রাজার সৈন্যদের ওপর আমরা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাবো। বুদ্ধি করে ওদের হার মানাবো। সামনা সামনি লড়াইতে যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা মন্দ বলোনি। ওভাবেই লড়াই চালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

সকালের খাবার দেওয়া হল। গাছের লম্বাটে পাতার ওপর পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল। রাজা আসারিয়া এমন খাবারে অভ্যস্ত নয়। তবু বিনা দ্বিধায় খেলেন।

সারাদিন কাটল। গতরাতে ভালো ঘুম হয় নি। ফ্রান্সিসরা দুপুরে ঘুমিয়ে নিল।

সন্ধ্যের পরে পরেই যা রান্না হয়েছিল শাঙ্কো সেইটুকুই খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ ছোরাটা পাথরে ঘষে ধার করল।

একটু রাত হতেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। রাজা আসারিয়া বলে দিয়েছিলেন বনের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণমুখো গেলেই সমুদ্রতীরে যাওয়ার রাস্তাটা পাওয়া যাবে। শাঙ্কো অন্ধকার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দিক ঠিক করে চলল।

যেতে যেতে রাত শেষ হয়ে এল। ভোর হবার কিছু আগে শাঙ্কো সমুদ্রের ধারে পৌঁছল। দেখল ওদের জাহাজের পাশেই রাজার জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে।

সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িতে তুলে রাখা নৌকোটা টেনে নিয়ে জলে ভাসাল। দাঁড় টেনে চলল। অস্পষ্ট চাঁদের আলো। শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকোটা জাহাজের গায়ে ভেড়াল। দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধল। তারপর হালের দড়িদড়া ধরে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

কয়েকজন বন্ধু ডেক-এ ঘুমিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে বিস্কো ছিল। শাঙ্কো ঠেলা দিয়ে বিস্কোর ঘুম ভাঙাল। বিস্কো ধড়ফড় করে উঠে বসল। আবছা আলোয় শাঙ্কোকে চিনে ফেলে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—আরে শাঙ্কো। চারদিকে তাকিয়ে বলল—ফ্রান্সিস, সিনাত্রা? বিস্কোর কথা শুনে অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেছে তখন। ওরাও ফ্রান্সিসদের কথা জিজ্ঞেস করল।

—ফ্রান্সিস সিনাত্রা ভালো আছে। এখন হ্যারিকে ডাকো। কথা আছে। শাঙ্কো কথাটা বলে ক্লান্ত দেহে ডেক-এ বসে পড়ল। বিস্কো ছুটল হ্যারিকে ডাকতে।

একটু পরেই হ্যারি ছুটতে ছুটতে এল। বলল শাঙ্কো—।

—সব বলছি। শাঙ্কো হাতের চেটো তুলে বলল। ততক্ষণে মারিয়াও ছুটে এসেছে। অন্য বন্ধুরা আসতে লাগল।

তখন শাঙ্কো সব ঘটনা বলল। তারপর বলল—

—তোমরা সন্ধ্যেবেলা সবাই তৈরী হয়ে নেবে। একটু রাতে অন্ধকারে আমরা সেই পাহাড়ে যাবো। বনের মধ্যে দিয়ে।

—আবার লড়াই হবে? মারিয়া মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যাঁ। সবুজ রাজা নৃশংস। তাকে তাড়াতেই হবে। শুনলেন তো সবুজ

রাজা আমাদের ফাঁসি দিতে চেয়েছে। রাজা আসারিয়া একজন উদার মনের রাজা। তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমরা এসব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শুয়ে বসে দিন কাটানো ওদের ধাঁতে নেই। লড়াইয়ের মধ্যে থাকতেই ওরা ভালবাসে। বীর জাতির এটাই লক্ষণ।

সন্ধ্যের পরই খেয়ে নিল সবাই। একটু রাত হতেই সবাই তরোয়াল কোমরে গুঁজে বেরিয়ে ডেকএ উঠে এল।

দু'টো নৌকাতে চড়ে দফায় দফায় ওরা সমুদ্রতীরে উঠল। তারপর রাস্তা ধরে চলল। হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো চাপা স্বরে বলল—এই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হতে হবে। পা চালাও। সবাই দ্রুত হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল নয়। তবে চারপাশ মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

এবার রাস্তার ধারেই বনভূমির শুরু হল। শাঙ্কোর পিছনে পিছনে সবাই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু হল।

এক সময়ে ওরা রাজা আসারিয়ার সেই ঘরের কাছে এল। এবার ঘর পার হয়ে উত্তর মুখো পাহাড়ের দিকে চলল। পাহাড়ের তলায় যখন পৌঁছল তখনও ভোর হয়নি। সবাই কম বেশি হাঁপাচ্ছে তখন।

গুহামুখের কাছে পৌঁছাল সবাই। গুহামুখের পাথরের চাঁইয়ের ফাঁকে মুখ রেখে শাঙ্কো বেশ জোরেই ডাকল—ফ্রান্সিস? নানা চিন্তায় ফ্রান্সিসের ঘুম প্রায় হয়-ই নি। প্রথম ডাকটাই ওর কানে গেল। ও উঠে পড়ল। কয়েকজন সৈন্যকে ঠেলা দিয়ে তুলল। ওদের নিয়ে গুহামুখে পাথরের চাঁই সরাল। ভাইকিং বন্ধুরা একে একে গুহার মধ্যে ঢুকল।

রাজা আসারিয়া সারারাত ঘুমোন নি। জেগে বসে ছিলেন। তাঁরও চিন্তার শেষ নেই। তিনি ভাইকিংদের ঢুকতে দেখলেন। একটু আশ্বস্ত হলেন। যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ল। সবুজ রাজাকে হার স্বীকার করাতেই হবে। নিজেকে রানিকে মুক্ত করতে হবে।

সকাল হল। রাজার সৈন্যরা ভাইকিংরা গুহার পাথুরে মেঝেয় শুয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ঘুম ভেঙে দেখল রক্ষীটি নেই। রক্ষীটি ওর কাছেই শুয়ে ছিল। ও রাজাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—রক্ষীটি কোথায়? ও তো অসুস্থ ছিল।

—শেষ রাতে পালিয়েছে। অবশ্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কী করে খবর পেয়েছে ওর একমাত্র ছেলেকে সবুজ রাজার সৈন্যরা হত্যা করেছে। রাজা বললেন।

সকালের খাবার খাওয়ার পর ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, আমি আর শাঙ্কো সবুজ রাজার সৈন্যদের কাছে ধরা দেবো। তোমরা আমাদের পেছনে পেছনে বনের শেষে এসে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করবে। সবুজ রাজার কিছু সৈন্য যাতে বনের মধ্যে ঢোকে আমি সেই ব্যবস্থা করবো। তারা সংখ্যায় কম হবে। তোমরা বনের আড়াল পাবে। সেই সৈন্যদের হারাতে হবে। জোর লড়াই চালাবে। তারপর রাজবাড়ি আক্রমণ করবে। সবাই উঠে তৈরি হয়ে নাও।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে রাজার সৈন্যরা ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। তৈরি হয়ে কোমরে তরোয়াল গুঁজে নিল। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—মান্যবর আপনি এখানেই থাকুন। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—না। বিপদের মুখে তোমরা যাচ্ছো। আমিও যাবো।

—বেশ চলুন। কিন্তু সঙ্গে তরোয়াল নিন। আপনাকেও হয়তো লড়তে হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল। রাজা তাঁর তরোয়ালটা কোমরের খাপে ভরে নিলেন।

এবার সবাই আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। প্রায় অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলল সবাই।

বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে নিয়ে বন থেকে বেরোতে যাবে তখন হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—শুনলাম সবুজ রাজা নৃশংস। তোমাদের কোন বিপদ—তরোয়াল নাও।

কিছু ভেবো না। আমার ছক কষা হয়ে গেছে। জয় আমাদের হবেই। ফ্রান্সিস হ্যারিকে আশ্বস্ত করল। তরোয়াল ছাড়াই দুজনে চলল।

দুজনে বন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল। চলল রাজবাড়ির দিকে। এ সময়ই সবুজ রাজাকে রাজসভায় পাওয়া যাবে।

রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই সবুজ রাজার কয়েকজন প্রহরী ওদের দেখতে পেল। ওরা ছুটে এসে ওদের দুজনকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে বলে উঠল—আমরা নিরস্ত্র। তরোয়াল চালিও না। আমাদের সবুজ রাজার কাছে নিয়ে চল। রাজার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

—কী কথা? একজন প্রহরী জিজ্ঞেস করল।

—সেটা রাজাকেই বলবো। নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

সবুজ রাজা কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। সভাকক্ষে খুব ভিড় নেই। একপাশে কয়েকজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তরোয়াল কোষবদ্ধ। লড়াইয়ে জিতে গেছে। কাজেই ওরা নিশ্চিন্ত।

বন্দী ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে দেখে সবুজ রাজা হেসে উঠল। বলল—ধরা পড়েছো তাহলে? ফ্রান্সিসরা কোন কথা বলল না।

—এবার আর তোমাদের রেহাই নেই। ফাঁসিতে লটকাবোই। আমার দুজন সৈন্যকে তোমরা হত্যা করে পালিয়েছো। রাজা বলল।

—আমরা হত্যা না করলে ওরা আমাদের হত্যা করতো। আপনার সৈন্যরা আপনার মতই। বন্দী-টন্দী বোঝে না। সোজা মেরে ফেলে। ফ্রান্সিস বলল।

—এই দোষারোপের জন্যে এক্ষুণি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, তা জানো? সবুজ রাজা বেশ রেগেই বলল।

—তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খবর? সবুজ রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

—রাজা আসিরিয়া তার সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তা আমরা দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল। সবুজ রাজা বেশ চমকে উঠল। বলল—কোথায়?

—তার আগে বলুন সেটা জানালে আমাদের মুক্তি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে পরে দেখা যাবে। সবুজ রাজা বলল।

—তাহলে আমরাও সে সংবাদ দেব না। ফ্রান্সিস বলল।

—চাবুক মেরে খবর বের করবো। সবুজ রাজা গলা চড়িয়ে বলল।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে ডাকলো—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস একটু ভাবলো। বলল—

—ঠিক আছে। বলছি। ঐ বনের মধ্যে রাজা আসিরিয়ার একটা ঘর আছে।

—ঘর? বনের মধ্যে? সবুজ রাজা বলল।

—হ্যাঁ। সেই ঘরে রাজা আসিরিয়া সেনাপতি আর সৈন্যদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। সবুজ রাজা সেনাপতির দিকে তাকাল। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি সৈন্য নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি।

—বেশি সৈন্য নিয়ে যাবেন না। এখানে রাজবাড়িতেও তো সৈন্য রাখতে হবে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—সেনাপতি বেশ রেগে গেল। বলল—তুমি লড়াইয়ের কী বোঝ?

—তা ঠিক। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল। শাঙ্কো মৃদু হাসল। সেনাপতি বলছে ফ্রান্সিস লড়াইয়ের কিছু বোঝে না। সেনাপতি ছুটে চলে গেল।

তখনই কয়েকজন প্রহরী সেই রক্ষীটিকে নিয়ে এল। তার পোশাক ছেঁড়া। সারা গায়ে পিঠে চাবুকের দাগ। পিঠটা যেন ফুলে উঠেছে। গায়ে পিঠে জমাট রক্ত। ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে দেখতে পারল না। মাথা নিচু করল।

—অ্যাই? কী হয়েছে তোর? সবুজ রাজা ব্যঙ্গ করে বলল।

রক্ষীটি গোঙাতে গোঙাতে বলল—আপনার—সৈন্যরা—আমার একমাত্র— ছেলেটাকে—।

—মেরে ফেলেছে? সবুজ রাজা গলা চড়িয়ে বলল।

রক্ষী মাথা ওঠানামা করল। ফ্রান্সিস স্থির থাকতে পারল না। বলে উঠল—এ ভাবে মেরে ফেলা—। সবুজ রাজা চিৎকার করে উঠল—চোপ্। ফ্রান্সিস তবু বলল—ছেলেটাকে মারা হল। একেও বিনা দোষে এভাবে চাবুক—

—তাহলে একে মেরে ফেলি। সবুজ রাজা কথাটা বলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল কোষমুক্ত করল। চেঁচিয়ে বলল—তবে এটাও মরুক। মুহূর্তে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল রক্ষীটির বুকে।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল—শাঙ্কো। শাঙ্কো তৈরিই ছিল। জামার তলা থেকে দ্রুতহাতে ছোরাটা বের করল। প্রহরীরা রাজসভার লোকেরা কিছু বোঝার আগেই সবুজ রাজার ওপর শাঙ্কো ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমূল ছোরা বিঁধিয়ে দিল সবুজ রাজার বুকে। সবুজ রাজা উল্টে পড়ল সিংহাসনের ওপর। তারপর সিংহাসনসুদ্ধু উল্টে পড়ল মেঝেয়। তার হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস একলাফে ছুটে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। ওদিকে রক্ষীটিও মেঝেয় পড়ে মারা গেছে।

এতক্ষণে প্রহরীরা সচকিত হল। তরোয়াল কোষমুক্ত করে দুজন প্রহরী শাঙ্কোর দিকে ছুটে এল। ফ্রান্সিস এক ছুটে শাঙ্কোকে আড়াল করে দাঁড়াল। একজন প্রহরী ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে গিয়ে বাঁদিকে ঝুঁকে পড়ল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। প্রচন্ড জোরে তরোয়ালের ঘা মারল প্রহরীটির ডান কাঁধে। প্রহরীটি তরোয়াল ফেলে বাঁ হাতে ডান কাঁধ চেপে ধরল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালটা মেঝে থেকে তুলে নিল। বাঁ হাতে ছোরা আর ডানহাতে তরোয়াল নিয়ে শাঙ্কো প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই চালাল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রহরীরা হার স্বীকার করল। ফ্রান্সিসদের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল।

তখনই রাজবাড়ির বাইরে চিৎকার হৈহৈ শোনা গেল। একটু পরেই রাজবাড়ির দ্বারদেশে ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোও ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

দল বেঁধে খোলা তরোয়াল হাতে ভাইকিং বন্ধুরা রাজসভায় ঢুকে পড়ল। সঙ্গে রাজা আসিরিয়ার সৈন্যরাও ঢুকল। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের জয় হয়েছে।

হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে মৃদুস্বরে বলল—এই কেঁদো না। রাজা আসিরিয়া কোথায়?

—আসছেন। উনিও লড়াইয়ে পটু। হ্যারি বলল।

সিনাত্রা গড়িয়ে পড়া সিংহাসনের কাছে গেল। টেনে তুলে ওটা ভালোভাবে পেতে দিল। শাঙ্কোও ওকে সাহায্য করল।

কিছুপরে রাজা আসিরিয়া ঢুকলেন। তার পেছনে সেনাপতি।

রাজা আসিরিয়া সবুজ রাজাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—উনি কি মারা গেছেন?

—হ্যাঁ। তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে। মৃত সবুজ রাজার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাজা সিংহাসনে বসলেন। এবার ফ্রান্সিকে বললেন—তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তোমাদের জন্যে আমি শুধু জীবনই ফিরে পেলাম না আমার রাজত্বও ফিরে পেলাম। তারপর হেসে বললেন—

—আমার কাছে তো তোমাদের কিছু প্রাপ্য হয়।

—আমরা কিছুই চাই না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—কিছ্ছু না? রাজা বললেন।

—না—কিছ্ছু না। শুধু একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী? রাজা সাগ্রহে বলে উঠলেন।

—সেটা কালকে এখানে এসে বলবো। আমরা সবাই ক্লান্ত। আজকে আর কোনো কথা নয়। আপনিও অন্দরমহলে যান। রানিমা নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক-ঠিক। রাজা সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অন্দরমহলের দিকে চললেন।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ফিরে এল। একজন রক্ষী এসে বলল—আপনাদের দেখাশোনা করতে সেনাপতি পাঠালেন।

—ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিসের সেই মৃত রক্ষীর কথা মনে পড়ল। ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। দুপুরের খাওয়ার পরও বিশ্রাম নেওয়া চলল।

সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন বন্ধু তিয়ের নগর দেখতে বেরুলো। ওরা ফিরে এসে বলল—কী আর দেখবো। মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। সৎকার চলছে। আগুনে পোড়া বাড়িঘর। কান্নাকাটি। শাঙ্কো বলল—দুদিন আগেও কত বড় উৎসব হয়ে গেল এখানে। নাচ গান। সিনাত্রাও সেই আসরে গান গেয়েছে। আজ তো শ্মশানের মতই অবস্থা।

রাতে খাওয়ার পর ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। হ্যারি কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস?

—হুঁ। বলো। ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকালো।

—কালকে জাহাজে ফিরলে হয় না? হ্যারি বলল।

—না। একটা কাজ বাকি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কাজ? হ্যারি বলল।

—কালকে রাজসভায় রাজাকে বলবো। শুনো। ফ্রান্সিস বলল।

—বুঝেছি। হ্যারি বলল।

—কী বুঝেছো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর পেয়েছো। তাই কিনা? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—এই জন্যেই তোমাকে এত ভালো লাগে। ঠিক ধরেছো।

—আজ রাত হয়েছে। তুমি ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়ো। কালকে সব শুনবো। হ্যারি বলল। তারপর শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজসভায় এল।

রাজা আসিরিয়া কাঠের সিংহাসনে বসে ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন রাজাকে সবুজ রাজার অত্যাচারের কথা বলছিল। রাজা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—তুমি কিছু বলবে বলেছিলে।

—হ্যাঁ—আপনার পূর্বপুরুষ কোন রাজা তাঁর ধনসম্পদ এই রাজত্বের কোথাও গোপনে রেখে গেছেন। এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কিছুই জানি না। শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো অনেক ধনসম্পদ পাতালঘরে গোপনে রেখে গেছেন। রাজা বললেন।

—সেই পাতালঘর কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—জানি না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—আপনি সেই ধনসম্পদের খোঁজ করেন নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না। কারণ সেই ধনসম্পদ রাজা সার্মেনো জলদস্যুতা করে সঞ্চয় করেছিলেন। নিরীহ জাহাজযাত্রীদের রক্তে ভেজা সেই ধনসম্পদের ওপর আমার কোন লোভ নেই। রাজা বললেন।

—কেউ কি ধনভাণ্ডার খুঁজেছিল? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ তিনজন খুঁজতে সমুদ্রতীরের পাহাড়টায় গিয়েছিল। কিন্তু তারা জীবিত অবস্থায় ফেরেনি। রাজা বললেন।

—তাদের মৃতদেহও পাওয়া যায়নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—তারা সমুদ্রতীরের পাহাড়ের দিকে গিয়ে খুঁজেছিল কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমি তাদের বলেছিলাম অতীতের রাজবাড়ি ছিল ঐ পাহাড়ের কাছে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আমরা খুঁজে দেখতে চাই। আমাদের অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তিনজন ফেরেনি। তারপরেও তোমরা—রাজা বলতে গেলেন।

ফ্রান্সিস বাধা দিয়ে বলল—বেশ কিছু গুপ্ত ধনভান্ডার আমি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি। আশা করছি এই ধনভান্ডারও উদ্ধার করতে পারবো।

—বেশ। কথাটা বলে রাজা আসিরিয়া সেনাপতির দিকে তাকালেন। সেনাপতি পাশে রাখা কাঠের আসনের দিকে হাত বাড়াল। একটা ছোটো চৌকোনো চামড়া মেশানো কাগজ তুলে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস দেখল কাগজের মাঝখানে একটা শীলমোহর। দেখতে এরকম—
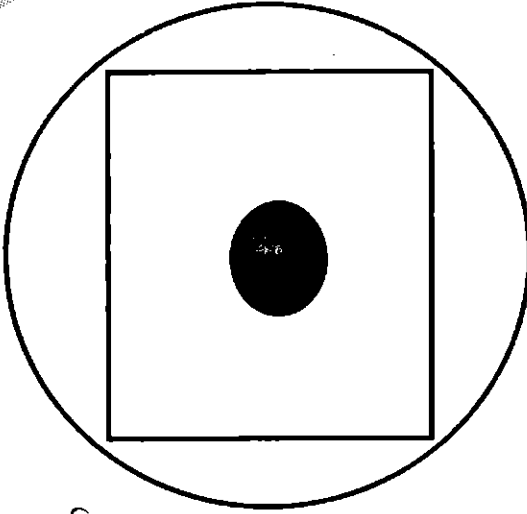
শীলমোহরের ছবি

নিচে স্পেনীয় ভাষায় লেখা—অনুমতিপত্র।

—এটা আপনার অনুমতির শীলমোহর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। এই অনুমতিপত্র নিয়ে আমার রাজ্যের যে কোন জায়গায় তোমরা অবাধে যেতে পারবে। এমনকি রাজঅন্তঃপুরেও যেতে পারবে। রাজা বললেন।

—এই শীলমোহর কি আপনিই প্রচলিত করেছেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। শুনেছি পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো এই শীলমোহর ব্যবহার করতেন। তখন থেকেই এই শীলমোহরের ব্যবহার চলে আসছে। এই শীলমোহর আমার সিংহাসনেও আছে। রাজা বললেন। রাজা আসনের ওপরের কাপড়ের ঢাকনা সরালেন। দেখা গেল সিংহাসনের মাথায় এই শীলমোহর কাঠ কুঁদে তোলা আছে। এখানকার সব আসনেই। তাছাড়া অন্দর প্রত্যেক পাথরের দেয়ালে এই শীলমোহর কুঁদে তোলা আছে। রাজা বললেন।

—আমি শীলমোহরের নকশাগুলো দেখতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে তো অনুমতিপত্র দেওয়াই হয়েছে। যাও। রাজা বললেন।

—তাহলে অন্দরমহলে একটু খবর পাঠান যে আমরা যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা একজন প্রহরীকে ডাকলেন। স্থানীয় ভাষায় কিছু বললেন। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছুপরে প্রহরীটি ফিরে এল। ফ্রান্সিসদের আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অন্দরমহলে ঢুকল। এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখল। সব পাথরের দেয়ালেই শীলমোহর কুঁদে তোলা। দেয়ালে ফুলপাতার নকশার মধ্যে ঐ শীলমোহরের নকশা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজসভায় ফিরে এল।

—দেখলে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ। ঐ শিলমোহরগুলো ভেঙে দেখা যায় কিনা সেটা পরে ভেবে দেখবো। এখনও আরো কিছু দেখার আছে। কাজেই আগেই দেয়াল ভাঙতে যাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওগুলো ভাঙতে গেলে সমস্ত দেয়ালই হয়তো ভেঙে পড়বে। রাজা বললেন।

—সাবধানে। হিসেব করে ভাঙতে হবে। তবে ওসব ভাঙার মধ্যে এখন যাচ্ছি না। বললাম না—আরো কিছু দেখতে হবে। ভাবতে হবে। এবার আমরা যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর দু'জনে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল।

দু'জনে অতিথিশালায় এল। বন্ধুরা জানতে চাইল ওরা দু'জনে রাজা আসিরিয়ার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলল। ফ্রান্সিস সব কথা বলল।

—তাহলে আবার অভিযান কর। শাঙ্কো খুশির স্বরে বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল। তারপর বলল—সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে। তারপর সমুদ্রতীরে পাহাড়ী এলাকায় যাবো। কারণ ওখানেই কোথাও পুরোনো রাজবাড়ি ছিল। ঐ এলাকাটা ভালো করে খুঁজতে হবে।

দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই তৈরি হল। ফ্রান্সিস বলল—সবাই তরোয়াল নিয়ে নাও। বলা যায় না সবুজ রাজার সেনাপতি হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে।

সবাই তরোয়াল কোমরে গুঁজে চলল। তিয়ারার লোকজন ফ্রান্সিসদের বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গেই দেখল কোথায় চলেছে ওরা? আবার লড়াই করতে যাচ্ছে নাকি?

পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছল সবাই। দেখল সমুদ্রের ধারেই কয়েকটা ছোট পাহাড়। মাঝখানের পাহাড়টাই সবচেয়ে উঁচু। ফ্রান্সিস স্থির করল পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে। তাহলেই চারদিক ভালো দেখা যাবে। ঐসব পাহাড়ের মধ্যেই নিচে কোথাও পাতালঘর থাকলে তার হদিশও পাওয়া যাবে।

এবারে পাহাড়ে ওঠা। মাঝখানে উঁচু পাহাড়টাকেই বেছে নিল ফ্রান্সিস। শাঙ্কো সিনাত্রা বিস্কোকে নিয়ে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠতে লাগল। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে ওরা পাহাড়টার চূড়ার কাছাকাছি এল। দেখা গেল চূড়ার কাছাকাছি কোনো পাথরের চাঁই নেই। তবে পাথরের খাঁজ রয়েছে। সেইসব খাঁজেই পায়ের ওপর ভর রেখে রেখে চূড়োয় উঠতে হবে।

—তোমরা থাকো। আমি একা উঠে সব দেখছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পাথরের খাঁজে খাঁজে দেহের ভর রেখে রেখে চূড়োয় উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে অন্য ছোট পাহাড়গুলো দেখল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ পাহাড়টার গোড়ায় আছড়ে পড়ছে। আট-দশ হাত উঁচু পর্যন্ত জল ছিটকে উঠছে। চোখ ফিরিয়ে আনতে তখনই দেখল কাছেই একটা গহ্বর নিচের দিকে নেমে গেছে। গহ্বরের গা খুব এবড়ো খেবড়ো নয়। কিছুটা বা মসৃণ। যেন কেটে করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস গহ্বরের ভেতরে তাকাল। অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ও ভাবল এই গহ্বরটা নিশ্চয়ই পাথর কেটে করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এই গহ্বরে কিছু আছে। হয়তো পাতালঘরটাই আছে।

ও চূড়ো থেকে নেমে এল। বন্ধুদের কাছে এসে বলল,

—সবকিছু দেখলাম। একটা গহ্বরও দেখলাম। কালকে ঐ গহ্বরে নামবো। শক্ত দড়ি আর মশাল চকমকি পাথর লোহার টুকরো আনতে হবে। এখন নেমে চলো।

সবাই পাহাড়ের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে নেমে এল।

—তোমার কি মনে হয় ওখানে কোন পাতালঘর আছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—গহ্বরে না নেমে বলতে পারছি না। তবে এখানেই তো পুরোনো রাজবাড়ি

ছিল। কাজেই গহ্বরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে ওখানে। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন দুপুরের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা আবার পাহাড়ী এলাকায় এলো। শাঙ্কোদের নিয়ে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠল। চূড়োর কাছাকাছি এসে শাঙ্কো সঙ্গে আনা দড়িটার একটা মাথা একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। অন্য মাথাটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস দড়ির মাথাটা কোমরে বাঁধল। সিনাত্রা চকমকি ঠুকে একটা মশাল জ্বালিয়ে দিল।

মশালটা বাঁ হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে গহ্বরে নামতে লাগল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ি ছাড়ছিল। গহ্বরে মশালের আলো পড়ল। চারপাশের পাথুরে প্রায় মসৃণ দেয়াল দেখা যেতে লাগল।

একসময় ফ্রান্সিসের পায়ে পাথরের মেঝে ঠেকল। ও দেখল একটা ঘর। মশালের আলো ফেলে ফেলে ঘরটার চারদিকে দেখতে লাগল। শুধুই একটা ঘর। তার জানালা দরজা নেই। তবে দেখে মনে হল এই ঘরটা ব্যবহৃত হত। এই ঘরটা কয়েদঘর হবার সম্ভাবনাই বেশি। ফ্রান্সিস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল যদি শীলমোহরের নকশা কোথাও খোদাই করা থাকে। না। সেরকম কোন নকশা কুঁদে তোলা নেই। আর কিছু দেখার নেই।

ফ্রান্সিস দড়িতে দুটো হ্যাঁচকা টান দিল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ি টানতে লাগল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস ওপরে উঠে এল। চূড়ো থেকে নেমে আসতে হ্যারি বলল—কিছু দেখলে?

—একটা পুরোনো ঘর। বোধহয় কয়েদঘর ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন চিহ্নটিহ্ন কিছু পেলে? হ্যারি জানতে চাইল।

—না। সেরকম কিছু নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে ওটা পাতালঘর নয়। হ্যারি বলল।

—তাই তো মনে হল। তবে পাহাড়গুলো খুঁজে দেখতে হবে। এরকম কোন ঘর পাওয়া যায় কিনা। গহ্বর গুহা সবই দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা পাহাড়ী এলাকায় ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোন গহ্বর বা গুহা পেল না। ফ্রান্সিস বলল—চলো সমুদ্রের দিক থেকে দেখি। সমুদ্রের দিকে গেল সবাই। সমুদ্রের জলের বড় বড় ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। জল ছিটকে উঠেছে। তার মধ্যে দিয়েই ওরা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলল।

বিকেলের ম্লান আলোয় হঠাৎ একটা গুহামুখ নজরে পড়ল। সমুদ্রের জলের বড় বড় ঢেউ সেই গুহামুখে আছড়ে পড়ছে। একদিকে ঢেউয়ের ছিটকানো জল অন্যদিকে পায়েব নীচে শ্যাওলাধরা পিছল পাথর। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওরা গুহামুখে এসে দাঁড়াল।

গুহামুখ দিয়ে বিকেলের নিস্তেজ আলোয় যতদূর দেখা গেল বোঝা গেল গুহাই। অন্য কিছু দেখা গেল না। গুহার ভেতরটা অন্ধকার।

—ভেতরে ঢুকে গুহাটা দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই। এখন একটা অজানা অচেনা গুহায় ঢুকবো? হ্যারি বলল।

—উপায় নেই। মারিয়া ওরা নিশ্চয় ভাবছে। তাই দেরি করতে চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলো। হ্যারি বলল।

সবাই গুহার মধ্যে ঢুকল। কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একটা লম্বাটে পুকুর মত। জল কতটা গভীর বোঝা গেল না। পুকুরটার ওপারে অন্ধকার গুহা।

—সিনাত্রা—একটা মশাল জ্বালো। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা চকমকি পাথর ঠুকে একটা মশাল জ্বালাল। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা কয়েকবার দুলিয়ে দুলিয়ে পুকুরটার ওপারে ছুঁড়ে ফেলল। এবার মশালের আলোয় ওপারটা দেখা গেল। টানা গুহা চলে গেছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—জলে নেমে ওদিকটা দেখে আসি। কতটা দূরে গেছে গুহাটা।

—কিন্তু আলো পড়ে গেছে। এখন ফিরে চলো। কালকে না হয়—হ্যারি বলতে গেল।

—না-না। এই ধনসম্পদ উদ্ধারের কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সাঁতরে কিছুটা যেতেই দেখলে আব্ছামত কী একটা চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। এবার অস্পষ্ট দেখল একটা বিরাট পাখ্না জল কেটে বেরিয়ে গেল। হাঙর! দেখল অতিকায় হাঙর একটু দূরে মোড় ঘুরল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বন্ধুদের দিকে যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরে চলল। তীরের পাথরে পা রেখে শরীরের এক ঝট্কা ওপরে উঠে এল। ও হাঁপাচ্ছে তখন। হ্যারি শাঙ্কো এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—কী হয়েছে?

—একটা অতিকায় হাঙর। বীভৎস। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল। এই কথা শুনে এক ভাইকিং বন্ধু জলের কাছে গিয়ে মুখ বাড়াল। জলে হাঙরের লেজটা ভেসে উঠেই প্রচন্ড জোরে আছড়ে পড়ল বন্ধুটির ওপর। মুহূর্তে বন্ধুটি ছিটকে জলে পড়ে গেল। জল আলোড়িত হল। জলে ঢেউ উঠল। পরক্ষণেই আর কোন শব্দ নেই।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—সবাই জলের ধার থেকে সরে এসো। ভয়ঙ্কর হাঙর। সবাই দ্রুত সরে এলো।

—এই হাঙরটা না মেরে ওপারে যাওয়া যাবে না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল।

বন্ধুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস আবার গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের এক বন্ধুকে এই ভয়ঙ্কর হাঙর মেরে ফেলেছে। আমি এটাকে নিকেশ করবোই। কাল দুপুরে আবার আসবো আমরা। এখন ফেরা যাক।

সারা রাস্তা কেউ কোন কথা বলল না। কারো মন ভালো নেই।

সন্ধের সময় সবাই অতিথিশালায় ফিরে এলো।

পরদিন সকালে হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজসভায় গেল। তখন বিচার চলছিল। বিচার শেষ হতে রাজা ফ্রান্সিসদের কাছে ডাকলেন।

—পাতালঘরের হদিশ করতে পারলে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—এখনও পারিনি। তবে দু'তিনটি জায়গা এখনও দেখা বাকি। তারপর ফ্রান্সিস গতকালের ঘটনা সব বলল। রাজা আসিরিয়া মাথা নেড়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

—মান্যবর রাজা—আমাদের দশ-পনেরোটা বর্শা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বর্শা নিয়ে কী করবে? রাজা বললেন।

—এই ভয়ঙ্কর হাঙরটা হত্যা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের কোন বিপদ না হয়। রাজা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

—না। আমরা সাবধানে কাজ সারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। প্রহরীকে পাঠাচ্ছি। ও বর্শা দিয়ে আসবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ফিরে এল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। প্রহরী বর্শা দিয়ে গেছে। সবাই বর্শা হাতে নিল। শুধু ফ্রান্সিস একটা তরোয়াল কোমরে গুঁজে নিল।

সবাই চলল সেই পাহাড়ের দিকে। উজ্জ্বল রোদের দিন।

ফ্রান্সিসরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তিয়েরাবাসীরা ওদের দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল সবুজ রাজা তো হেরে গেছে তবে ওরা কাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে?

ফ্রান্সিসরা পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছল। সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপ্টা পার হয়ে ওরা গুহামুখে এল। তারপর গুহায় ঢুকে সেই লম্বাটে পুকুরের সামনে এল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে একটু দূরে দাঁড়াল সবাই। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—একটা ভয়ঙ্কর হাঙরের সঙ্গে লড়াই আজ। বন্ধুর নির্মম মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার দিন আজ। একটু থেমে বলল—প্রথমে আমি একা জলে নামছি। হ্যারি চম্‌কে উঠে ফ্রান্সিসের হাত চেপে ধরল। বলল—পাগল হয়েছো। নিশ্চিত মৃত্যু।

—উপায় নেই। যখন সবাই মিলে বর্শা চালাবে তখন জল রক্তে লাল হয়ে যাবে। তখন নিশানা ঠিক রেখে আক্রমণ করা যাবে না। এখন আমি পরিষ্কার

জলে হাঙরটাকে দেখতে পাবো। আজকে রোদও উজ্জ্বল। ঠিক ওটার ফুস্‌ফুসে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিতে পারবো। তারপর সবাই মিলে আক্রমণ। তুমি নিশ্চিন্ত হও। হাঙরের সঙ্গে এর আগেও লড়েছি। আমি ওদের মতিগতি বুঝি। আক্রমণের ফন্দীফিকির জানি। ঠিক ঘায়েল করবো ওকে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমর থেকে খুলে দাঁতে চেপে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে জলে নামল। বন্ধুরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস হাত পা নেড়ে জলে শব্দ করল। তারপর ডুব দিল। দেখল একটু দূরে হাঙরের মুখটা। সত্যিই বীভৎস। মুখে গায়ে কালচে শ্যাওলা জমে গেছে। সাত আট হাত দূরে একটা বড় পাক খেয়ে হাঙরটা একটু দূরে চলে গেল। অভিজ্ঞ ফ্রান্সিস বুঝল এবার হাঙরটা আক্রমণ করবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও হাতে পায়ে জল ঠেলে নিচে চলে এল। তখনই হাঙরটা ছুটে ওর মাথার কাছে এল। হাঙরের বিরাট পেটটা দেখল ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস দাঁতে চেপে ধরা তরোয়ালটা খুলে হাতে নিল। এইবার হাঙরটা এসে ওকে আক্রমন করতে উদ্যত হল। ফ্রান্সিস তৈরী ছিল। হাঙরের বুকের ফুস্‌ফুস্‌ লক্ষ্য করে ফ্রান্সিস ওর তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। যতটা জোরে সম্ভব। রক্ত বেরিয়ে এল। হাঙরটা বোধহয় এরকম আক্রমন আশঙ্কা করেনি। ওটা পাক খেয়ে সরে গেল।

ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। ডুব সাঁতার দিয়ে দ্রুত পারের দিকে চলে এল। তারপর পারে উঠে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। —তোমার কিছু হয় নি তো? হ্যারি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা নাড়ল। বলল—ঠিক ফুসফুসে তরোয়াল বিঁধিয়েছি। এখন বর্শা দিয়ে ওটাকে মারতে হবে। সবাই তৈরী হও।

সবাই বর্শা হাতে জলের ধারে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঠে বলল—খুব কাছে যেও না। লেজের ঝাপটায় ফেলে দেবে। আর বর্শা হাত ছাড়া করোনা। কারণ অনবরত বর্শার ঘা মেরে যেতে হবে।

পাখ্‌না দিয়ে জল কেটে আহত হাঙরটা পারের দিকে এগিয়ে এল। সবাই বর্শার ঘা মারল হাঙরটার পিঠে। দু'একটা বর্শা একেবারে গেঁথে গেল হাঙরটার পিঠে। যেগুলো খুলে আনা গেল না। পুকুরের জল রক্তে লাল হয়ে উঠল। হাঙরটা একটু দূরে সরে গেল।

ফ্রান্সিস পার ধরে জলে নামল। জলে হাত পা নেড়ে শব্দ করে দ্রুত পারে উঠে এল। হাঙরটা ছুটে এল। পার থেকে ভাইকিংরা দ্রুত বর্শার ঘা মারল হাঙরটার পিঠে। হাঙরটা চিৎ হয়ে গেল। এবার ওটার বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিতে লাগল।

পুকুরটার জল লাল হয়ে গেল। জল তোলপাড় করে হাঙরটা ডুবে গেল।

সবাই পারের কাছে দাঁড়াল। বসে পড়ল কেউ কেউ।

—হাঙরটা কি করছে? শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল।

—বুঝতে পারছি না। জলে নেমে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ভুলে যেও না হাঙরটা আহত। ক্ষেপে আছে। হ্যারি বলল।

—ঝুঁকি নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বসে রইল।

এবার ফ্রান্সিস জলে নামল। ডুব দিল। জল রক্তে লাল। ভালো দেখা যাচ্ছে না। একটু অপেক্ষা করে ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেল। তখনই অস্পষ্ট দেখল ক্ষত বিক্ষত হাঙরের বিরাট দেহটা পাথরের মেঝেয় পড়ে আছে। অনড়। তখনও সারা গা পেট থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল হাঙরটা মারা গেছে। ও জলের ওপর ভেসে উঠল। হেসে বলে উঠল—একেবারে খতম। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস পারে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এখনও বেলা আছে। আর দেরি করবো না। এই জলাটা পার হয়ে ওপারে যাবো। তার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।

হাত পা ছড়িয়ে বসল সবাই। বিশ্রাম করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—রাজা আসিরিয়া বলেছিলেন না তিনজন পাতালঘরের খোঁজে বেরিয়ে জীবিত ফেরেনি। ওরা এই পুকুরের জল পর্যন্ত এসেছিল। হয়তো এটা পার হতে গিয়েছিল। হাঙরটা ওদের মেরে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পর ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—সবার যাবার দরকার নেই। আমি শাঙ্কো আর সিনাত্রা যাব।

—না ফ্রান্সিস—হ্যারি বলল—আবার ওখানে যদি কোন বিপদে পড়। আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। বন্ধুরাও অনেকে বলে উঠল—ফ্রান্সিস আমরাও যাব।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সিনাত্রাকে বলল—তিনটে মশাল জ্বালো। আমরা তিনজন জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যাবো।

সিনাত্রা তিনটে মশাল জ্বালল। তিনটে মশাল হাতে নিয়ে তিনজনে জলে নামল। বাকি বন্ধুরাও জলে নামল। তিনজনে বাঁহাতে মশাল জলের ওপর তুলে ডান হাতে সাঁতরে চলল ওপারের দিকে। বন্ধুরাও সাঁতরে চলল। বন্ধ গুহার শেষ প্রান্ত এসে দেখা গেল একটা পাথরের চাঁই।

ফ্রান্সিস মশালের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল পাথরের চাঁইটার ডানপাশে হাতখানেক ফাঁকা। পিছু ফিরে ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকাল। বলল—এই পাথরের চাঁইটা সরাতে হবে। সবাই হাত লাগাও। ফ্রান্সিস মশাল ধরে রইল।

শাঙ্কো আর সিনাত্রা সেই ফাঁকটায় হাত গলিয়ে টানল। বেশ ভারি পাথরের চাঁই। ওরা দুজনে কিছুক্ষণ টানল। ছেড়ে হাঁপাতে লাগল। আরো দু'জন বন্ধু এগিয়ে এল। চলল পাথরের চাঁইটা ধরে টানা।

একসময় পাথরের চাঁইটা আস্তে আস্তে সরে এল। এবার কয়েকজন মিলে পাথরের চাঁই অনেকটা সরিয়ে আনল। ফ্রান্সিস মশালের আলো ফেলে দেখল একটা মসৃণ কালো পাথরের দরজা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—পাথরের চাঁইটা আরো সরাও। চাঁইটা সবটা সরানো হতেই মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল—দরজাটায় একটা মস্তবড় লোহার কড়া ঝুলছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—বাকি দুটো মশাল নিয়ে এসো। শাঙ্কো আর সিনাত্রা মশাল নিয়ে এগিয়ে এল। তখনই দেখা গেল গোল কড়াটার মাঝখানে কীসের চিহ্ন। একনজর দেখেই ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠল—হ্যারি এটাই পাতালঘর। ফ্রান্সিসের কথা গুহায় প্রতিধ্বনিত হল। হ্যারি এগিয়ে এসে পাথরের দরজার গায়ে কুঁদে-তোলা শীলমোহর দেখে বলে উঠল—এটাই তো রাজা আসিরিয়ার শীলমোহর।

—হ্যাঁ। রাজা আসিরিয়ার পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো প্রচলিত শীলমোহর। এবার এই দরজা খুলতে হবে। সবাই হাত লাগাও।

চার-পাঁচজন বন্ধু এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস মশাল ধরে রইল। কিছুক্ষণ কড়া ধরে টানলে ওরা। ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। এবার আরো চার-পাঁচজন মিলে টানল। দরজার ডানদিকে ফাঁক দেখা গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলে উঠল—সবাই তাড়াতাড়ি সরে এসো। বিষাক্ত বাতাস বেরোতে পারে।

সবাই দ্রুত সরে এল। দরজার সেই ফাঁক লক্ষ্য করে ফ্রান্সিস মশালটা ছুঁড়ে দিল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠে ভেতরেও আগুন ছড়িয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে আগুন ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। সবাই দূরে সরে গিয়েছিল। কাজেই আগুন ওদের কোন ক্ষতি করতে পারল না।

ভেতরে আগুন নিভল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজার ফাঁকের কাছে গেল। চোখ কুঁচকে ভেতরে তাকাল। একটা ঘরমত দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট দেখা গেল ঘরের মাঝখানে একটা সিংহাসন। সিংহাসনের ওপর কিছু আছে।

ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভেতরে একটা ঘরমত দেখা যাচ্ছে। এখন দরজা সবটা খুলতে হবে। হাত লাগাও।

লোহার বড় কড়াটা ধরে আবার টানটানি শুরু হল। একসময় দরজা সবটা খুলে গেল। শাঙ্কোর হাত থেকে মশাল নিয়ে ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকে পড়ল।

এক আশ্চর্য দৃশ্য। সোনার মোটা পাতে মোড়া একটা সিংহাসন ঠিক ঘরের মাঝখানটায়। তার ওপর বসা অবস্থায় এক নরকঙ্কাল। হাত দু'টো হাতলে রাখা।

সবাই ঘরটায় ঢুকে পড়েছে তখন। দেখা গেল ঘরটার দেয়ালগুলো

মসৃণ পাথরের। তাতে নানা রঙের মূল্যবান হীরে মনিমানিক্য গাঁথা। সোনার সিংহাসনের গায়ে ফুল লতাপাতার কারুকাজ। সবাই অবাক হয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস কত গুপ্তধন খুঁজে উদ্ধার করেছে। সেই ফ্রান্সিসও এই দৃশ্য দেখে অবাক হল। বুঝল নরকঙ্কালটি রাজা সামেনোর। সবাই ধ্বনি তুলতে ভুলে গেল। কিন্তু হ্যারি উল্লাসধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। এবার সবাই আনন্দে গলা মেলাল। গুহার গায়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল।

এবার ফেরার পালা। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ফ্রান্সিস পাথরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জলে সাঁতার কেটে সবাই পারে এসে উঠল। তারপর গুহা থেকে বেরিয়ে এল। সবাই রাজবাড়ির দিকে চলল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখন রাজাকে পাতালঘর আবিষ্কারের কথা বলবে না?

—না। এখনই সব জানাবো না। কাল সকালে রাজসভায় বলবো। জানাজানি হয়ে গেলে অরক্ষিত গুহাটা দেখতে রাতেই লোকজন ছুটবে। আজ রাতটা চুপ করে থাকবো। কালকে রাজাকে বলবো আর সুরক্ষিত রাখতেও বলবো। আজ রাতটুকু বিশ্রাম। ঘুম। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রাজসভায় গেল।

আজকে কোন বিচার চলছিল না। রাজা আসিরিয়া ফ্রান্সিসকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল।

—পাতালঘর বোধহয় খুঁজে বের করতে পারো নি। রাজা বললেন।

—না। খুঁজে পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। রাজা অবাক।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা বলল। রাজা আসিরিয়া সব শুনে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। পরে বললেন,

—তোমরা বেশ চিন্তা করে কষ্ট করে আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনোর সম্পদ উদ্ধার করেছো। শত্রুর হাত থেকে আমার রাজ্য উদ্ধার করে দিয়েছো।—কী বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো।

—না মান্যবর রাজা। গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করতে আমরা ভালোবাসি। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি। সবুজ রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে আপনাকে সাহায্য করেছি, আপনি একজন মহানুভব রাজা বলে। কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার সব প্রজাদের রক্ষা করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা তো করেছো। সেটাই বা কম কী। রাজা বললেন।

—এবার তাহলে সমুদ্রতীরে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা সার্মেনো জলদস্যুতা করে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। আগেই বলেছি সেই ধনসম্পদের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। চাইলে তোমাদের সব দিয়ে দিতে পারি। রাজা বললেন।

—আমরা তো কিছুই নেবো না। তাই বলি ঐ সোনার সিংহাসন, মণিরত্ন বিক্রি করে যে অর্থ পাবেন তাই দিয়ে আপনার প্রজাদের মঙ্গল করুন। প্রজাদের জন্যে অনেক কিছুই করতে পারেন আপনি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন—ঠিক আছে। তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। প্রজাদের দুঃখদৈন্য দূর করতে এই মূল্যবান সম্পদ কাজে লাগাবো। তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি অতিথিশালায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের সব বলল। তারপর বলল—দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা সমুদ্রতীরের দিকে যাত্রা করবো। সবাই তৈরী হয়ে নাও।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারল ওরা। তারপর রাস্তায় নেমে এল। বালিভরা রাস্তা দিয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। যেতে যেতে দেখল তিয়েরাবাসীরা দলে দলে ছুটেছে সমুদ্রের ধারের পাহাড়ী এলাকার দিকে। পাতালঘর আবিষ্কারের কথা এখন বোধহয় তারা জেনে গেছে।

—এত লোক যাচ্ছে—রাজা নিশ্চয়ই গুহাটা পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। হ্যারি বলল।

—নিশ্চয়ই। সিংহাসনে বসা নরকঙ্কাল—এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ফ্রান্সিস বলল।

—অদ্ভুত বলে অদ্ভুত। আমি তো ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। হ্যারি বলল।

বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিস যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বালিয়াড়িতে দুটো নৌকোই তোলা ছিল। নৌকোয় চড়ে দফায় দফায় ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠতে লাগল।

জাহাজে ছিল মারিয়া, ভেন আর এক অসুস্থ বন্ধু। তিনজনেই রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া এবারও আমার হাত খালি। মারিয়া হেসে বলল—তোমরা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছো এটাই আমার কাছে অনেক। ফ্রান্সিস অসুস্থ বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করল—কেমন আছো?

ওদের বদ্যি ভেন বলল—ও এখন সুস্থ। তোমাদের সঙ্গে যেতে পারল না। খুবই দুঃখ ওর।

—পরের বার নিয়ে যাবো। আমরাও দুঃখ পেয়েছি। এক বন্ধুকে হারিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে শাঙ্কো তখন হাত পা নেড়ে মারিয়াকে পাতালঘর আবিষ্কারের কথা বলছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ পূর্ণগতিতে চলেছে। জাহাজের পালগুলো বেগবান হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। মোটামুটি উত্তর দিক ধরে জাহাজ চলছে। জাহাজচালক ফ্রেজারের লক্ষ্য স্বদেশে ফেরার। ডেক ধোওয়া মোছা সেরে ভাইকিংদের হাতে যথেষ্ট সময়। কারন দাঁড়ও বইতে হচ্ছে না বেশ খুশির মেজাজে ভাইকিংরা।

রাতের খাওয়া সেরে ডেক-এ নাচগানের আসর বসায়। ফ্রান্সিস ওদের উৎসাহই দেয়। আসরে মারিয়াকে নিয়ে আসে। নাচের আসরে দুজনে নাচেও। মারিয়া খুশি মনে এসব দেখে। হাসে। যাক্ মারিয়া খুশি। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হয়।

সিনাত্রা সুরেলা কণ্ঠে দেশের চাষীদের ভেড়াপালকদের গান গায়। দ্রুত লয়ের বিয়ের বাসরের গানও গায়। আসর জমে ওঠে। কাঠের ডেকেএ থপ থপাথপ্ পা ঠুকে ভাইকিংরা নাচে। শাঙ্কো খালি জীপে বাজায়। এভাবেই রাতের আসর জমে ওঠে।

মাঝে কয়েকদিন বাতাস পড়ে গিয়েছিল। তখন ভাইকিংদের ব্যস্ততা। পাল খাটাবার কাঠের কাঠোমোয় উঠে পাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যথাসাধ্য হাওয়া লাগাতে চেষ্টা করে। অনেকে দাঁড় ধরে গিয়ে দাঁড় টানে। তখন আর নাচের আসর বসে না। তখন শুধু কাজ। ছক্কাপাঞ্জা খেলা বন্ধ। সবাই ব্যস্ত। নাচগানের আসর আর বসে না। জাহাজের চলার বেগ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা চলে। দেশে ফিরে যাচ্ছে এই চিন্তা উৎসাহ জোগায়।

দিনকয়েক পরে বাতাসের বেগ বাড়ে। জাহাজ চলে দ্রুত গতিতে। আবার আনন্দ ভাইকিংদের মনে। জাহাজের কাজ কমে যায়। অবসর। আবার নাচ গানের আসর বসে। নেচে গেয়ে খুশির সময় কাটায় ওরা।

জাহাজ পুণগতিতে চলছে। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। এভাবেই দিন দশেক কাটল। ভাইকিংরা চিন্তায় পড়ে—পথ হারালাম না তো?

রাতে ফ্রান্সিসরা ডেকেএ উঠে আসে। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারিদিকে তাকায় যদি ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যায়। ওপরের দিকে তাকিয়ে নজরদার পেড্রোকে বলে— ঘুমিয়ে পড়ো না। নজর রাখো। পেড্রো মাস্তুলের ওপরে

নিজের গলা চড়িয়ে বলে— কিছ্ছু ভেবো না। ঠিক নজর রাখছি। হ্যারিও ডেকেএ উঠে আসে। ফ্রান্সিস বলে হ্যারি— চিন্তার কথা। এখনও ডাঙ্গার দেখা পাচ্ছি না।

—ঠিক ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যাবে। আট দশদিন কেটেছে মাত্র। কয়েকদিনের মধ্যেই ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যাবে। তাছাড়া খাদ্য জল সব মজুত আছে। আরোও কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। জাহাজ চলুক। হ্যারির কথা শুনে ফ্রান্সিসের উদ্বিগ্ন মন শান্ত হয়। ও কিন্তু শুধুমাত্র হ্যারির সঙ্গেই এসব কথা বলে। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এসব কথা বলে না। তাহলে মারিয়াও উদ্বিগ্ন হবে। সেটা মারিয়ার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন শেষরাতে মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ভাইসব-সাবধান জলদস্যুদের জাহাজ। এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিসকে খবর দাও। সবাই তৈরী হও। সামনে লড়াই।

ডেকের ওপর কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে শাঙ্কোও ঘুমিয়ে ছিল। পেড্রোর উঁচু গলায় কথায় ওর ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে জাহাজের রেলিংয়ের ধারে গেল। কিছুটা উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখল একটা জাহাজ দ্রুত গতিতে ওদের জাহাজের দিকে আসছে। জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজ।

শাঙ্কো আর একমূহুর্তে দেরি করল না। সিঁড়ির দিকে ছুটল। নিচে নামতে নামতে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—তৈরী হও—তৈরী হও। একটা জলদসুদের জাহাজ আসছে। লড়াই। অস্ত্র নাও।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস জলদস্যুদের জাহাজ আসছে শিগগির এসো।

ফ্রান্সিসসের ঘুম ভেঙে গেল। এক লাফে বিছানা থেকে নামল। বিছানার তলা থেকে তরোয়াল বের করল। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ততক্ষনে জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। ভাইকিংরা অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল বের করে ডেকএ উঠে আসতে লাগল।

অল্পক্ষনের মধ্যেই খোলা তরোয়াল হাতে ডেকএ এসে জড়ো হল সবাই। সবাই দেখল জলদস্যুদের জাহাজের ডেক-এ খোলা তরোয়াল হাতে জলদুস্যরা দাঁড়িয়ে। মাথায় কালো কাপড়ের ফট্টি। গাল অব্দি জুলপি মোটা গোঁফ। জলদস্যুর দল ভেবেছিল নিঃশব্দে জাহাজ দখল করবে। কিন্তু যখন দেখল ফ্রান্সিসরা ওদের দেখে ফেলেছে তখন ওরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী হল।

জলদস্যুদের জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। জলদস্যুরা তরোয়াল উঁচিয়ে লাফ দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসরা ওদের প্রথম আক্রমণ করল। শুরু হল লড়াই। জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের চেয়ে সংখ্যায় কম। তবে ওরা তো নৃশংস আর নির্ভীক। ওদের প্রাণেরও মায়া নেই। ওরা জানে মানুষ মেরে ফেলতে। কাজেই ওরা প্রথম উন্মাদের মত তরোয়াল চালাতে লাগল। দুজন ভাইকিং আহত হয়ে ডেক-এ পড়ে গেল। কয়েকজন ভাইকিং থমকে গেল। ফ্রান্সিস উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। এই ধ্বনি লড়াইয়ের ধ্বনি। মন্ত্রের মত কাজ হল। ভাইকিংরা নতুন উদ্যমে লড়াই চালাতে লাগল। কয়েকজন জলদস্যুকে আহত করল ওরা। ফ্রান্সিস নিপুনহাতে তারোয়াল চালিয়ে ঘুরে ঘুরে লড়াই করতে লাগল।

একজন জলদস্যু মারা গেল। দু'তিনজন আহত হল।

এমন সময় জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন তাদের জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে লড়াই দেখতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝল—ভাইকিংরা তরোয়াল চালনায় যথেষ্ট দক্ষ। জলদস্যুরা হেরে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন গলা চড়িয়ে বলে উঠল—লড়াই থামাও। সবাই চলে এসো। জলদস্যুরা লড়াই করতে করতে নিজেদের জাহাজে পালাতে লাগল।

ফ্রান্সিসও গলা চড়িয়ে বলল—যে ক'টাকে পারো আহত করো। জাহান্নামে যাক্ সব। ভাইকিংরা নতুন উদ্যমে জলদস্যুদের আক্রমন করল। এবার জলদস্যুরা বুঝল লড়াই করতে গেলে বাঁচার আশা নেই। ওরা দ্রুত লড়াই থামিয়ে নিজেদের জাহাজের ডেকএ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শেষ। নিহত আহত জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকএ পড়ে রইল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—এগুলোকে জলে ফেলে দাও। ভাইকিংরা সব ক'টা জলদস্যুকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলল।

জলদস্যুদের জাহাজের মুখ ঘুরল। আস্তে আস্তে জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজটা মাঝ সমুদ্রের দিকে চলে যেতে লাগল। লড়াইয়ে বিজয়ী ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচা গেছে এই ভেবে ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ফেলল। গলা চড়িয়ে ডাকল—পেড্রো? পেড্রো নিজের জায়গা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—কী বলছো? —অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। সময়মত জানানি দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

তখন ভোর হয়েছে। ভোরের নিস্তেজ আলো পড়েছে সমুদ্রে জাহাজে নির্মেঘ আকাশে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ডাঙা দেখা গেল। সেদিন ভোরে মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো গলা চড়িয়ে বলে উঠল—ভাইসব বাঁদিকে ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে—ডাঙ্গা। ডেক-এ ঘুম ভেঙে শাঙ্কো বসেছিল। ছুটল ফান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। ডানদিকে তাকিয়ে দেখল একটা খাঁড়িরমত। তার এ পাশে গভীর বন। ওপাশে পাহাড়। বুঝতে পারল না-এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। এপাশে একটা ঘাটমত দেখা গেল। এদিকে সমুদ্র গভীর। বড় বন্দর নয়। তবে জাহাজ ভেড়ানো থাকে।

হ্যারি এসে ওর পাশে দাঁড়াল। ওকে ফ্রান্সিস এসব কথা বলল। হ্যারি বলল—দেখা যাক জাহাজ ভেড়ানো যায় কিনা। ফ্রেজারের কাছে চলো। দু'জনে জাহাজ চালক ফ্রেজারের কাছে এল।

—ফ্রেজার —ফ্রান্সিস বলল—বুঝতে পারছিনা এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। যাহোক তুমি দেখো জাহাজ তীরে ভেড়ানো যায় কিনা।

জাহাজ ততক্ষণে তীরের কাছে চলে এসেছে। ফ্রেজার বলল—তীরের কাছে জল গভীর। জাহাজ তীরে ভেড়ানো যাবে। ফ্রেজার আস্তে আস্তে জাহাজটা তীরে ভেড়াল।

দেখা গেল বালিয়াড়ির পরেই বনভূমি। টানা বনভূমি চলে গেছে। বসতির চিহ্নমাত্র নেই।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী করবে?

—এখনই এখানে নামবো। দেখি মানুষজনের দেখা পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল,

—কিন্তু এ তো গভীর বন। এখানে মানুষজন কোথায় পাবে? হ্যারি বলল।

—মনে হচ্ছে বনের ওপাশে বসতি আছে। এখন নেমে গিয়ে সেটা দেখাত হবে। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেয়ে নিল। এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে পাঠাল। শাঙ্কো আসতে বলল—শাঙ্কো—সিনাত্রা আর তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরা নামব।

—এখনই? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ দিনে দিনেই দেখব সব। মনে হচ্ছে এই বনভূমির ওপারে লোকজনের বসতি এলাকা পাব। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো।

কিছুক্ষনের মধ্যেই ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর সিনাত্রা তৈরী হল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা কাঠের পাটাতন পাতল তীরভূমি পর্যন্ত। পাটাতন দিয়ে তিনজন নেমে এল। বেলাভূমি পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। সেই অদ্ভুত গাছের জঙ্গল। গাছের পাতা প্রায় গোল। মোটা ভারী পাতা। শক্ত ডাল। অন্য গাছও রয়েছে। কিন্তু এরকম গাছের সংখ্যাই বেশি। এই গাছগুলো বেশ উঁচু। ডালগুলো দেখে মনে হল বেশ শক্ত।

হঠাৎই ওরা দেখল গাছের মধ্যে ঘর। গাছের চারটে ডালের মধ্যে ডাল কেটে বেড়ামত। তাতে দরজা। ঘরের মাথায় শুকনো লম্বাটে ঘাসের ছাউনি। এরকম তিন চারটে ঘর দেখল ওরা। তাহলে এখানাকার বাসিন্দারা একরম ঘরেই থাকে। অবাক কান্ড! ঘরগুলো থেকে গাছের ডাল থেকে তৈরি মই ল্যাগানো। ঐ মই বেঁধেই ওঠানামা।

ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা ঘর থেকে একজন বাদামি রঙের পুরুষ মুখ বাড়িয়ে ফ্রান্সিসদের দেখেই —ই—ই করে মুখে জোরে শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘরগুলো থেকে পুরুষরা হাতে গাছের ডাল কেটে তৈরী বর্শা নিয়ে মই বেয়ে দ্রুত নেমে আসতে লাগল। মই বেয়ে ওঠা নামায় ওরা অভ্যস্থ । কাজেই ফ্রান্সিসরা পালিয়ে আসার সুযোগ পেল না। ততক্ষণে বর্শা হাতে যোদ্ধারা ঘিরে ধরেছে। ফ্রান্সিস দু'হাতে ওপরে তুলে চীৎকার স্পেনীয় ভাষায় বলে উঠল—আমরা বন্ধু। তোমাদের শত্রু নই। যোদ্ধারা আর বর্শা ছুঁড়ে মারল না।

—পালিয়ে গেলে হত। শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

—এখন আর সম্ভব নয়। পালাতে গেলে আহত হব। বর্শা বুকে ঢুকে গেলে মরেও যেতে পারি। তার চেয়ে দেখা যাক এরা আমাদের নিয়ে কি করে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের গায়ে বর্শা খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। যোদ্ধা ওকে সামনের জঙ্গলের দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস রেগে গেল। কিন্তু কিছু বলল না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। শাঙ্কো আর সিনাত্রাও চলল।

কিছুদূর যেতে দেখা গেল চারপাঁচটা গাছের গায়ে শুকনো লতার ডালমত। সমস্ত জায়গাটতেই লতার জাল। ফুট পাঁচেক উঁচু। সেই যোদ্ধাটি এগিয়ে গেল। জালির গায়ে গাছের ডাল কেটে দরজামত বানানো। যোদ্ধাটি

দরজা দিয়ে ফ্রান্সিসদের ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা একে একে ঢুকলো। ওপরের ডাল মাথায় লেগে যাচ্ছে। তিনজনে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখল আরোও তিনজন বন্দী ঐ জালঘরে আগে থেকেই রয়েছে। জালঘরের মেঝে বালিভরা। তার ওপর শুকনো ঘাস বিছানো। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—শাঙ্কো এরকম বিচিত্র কয়েদঘর আর কোনদিন হয়ত দেখবো না।

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমরা যেন জীবজন্তু। ফাঁদে ধরা পড়েছি।

—আমাদের মেরে ফেলবে না তো? সিনাত্রা ভয়ার্তস্বরে বলল।

—সময় সুযোগ মত পালাবো। কিছ্ছু ভেবো না। শাঙ্কো বলল। যোদ্ধাটি দরজাটা শুকনো লতা দিয়ে বাঁধল। শাঙ্কো যোদ্ধাটিকে ইঙ্গিত ওদের সর্দার আছে কিনা জানতে চাইল। যোদ্ধাটি মাথা দোলাল। একজন যোদ্ধাকে পাহারাদার রেখে অন্য যোদ্ধারা চলে গেল।

ফ্রান্সিস মাথা তুলে চারিদিক এবার দেখে নিল। দেখল চারদিকেই গভীর জঙ্গল। সেই মোটা ভারিপাতার গাছের সংখ্যাই বেশি।

ফ্রান্সিস শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। দুপুর নাগাদ কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে একজন লম্বামত লোক জালঘরের দরজার সামনে এল। পাহারাদার তাকে দেখে ডান হাত তুলে নামল। ফ্রান্সিস বুঝল এই লোকটাই গোষ্ঠীপতি। ফ্রান্সিস এই গোষ্ঠিপতির জন্যেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। গোষ্ঠীপতি ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় শব্দে বলল—পরিচয়?

—আমরা বিদেশী— ভাইকিং। জাহাজে চড়ে জাহাজ ঘাটায় এসেছি। ফ্রান্সিস বলল। গোষ্ঠীপতি মোটামুটি বুঝল। কিন্তু সত্যি বলে মেনে নিল না। দুপাশে মাথা নেড়ে বলল—ওরা—ইকাবু—একসঙ্গে—শাস্তি।

—কী শাস্তি? শাঙ্কো বলে উঠল। গোষ্ঠীপতি এতক্ষণে একটু হাসল। বলল—দেখবে।

—কিন্তু আমাদের শাস্তি দেবেন কেন? আমারা কী অন্যায় করেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—ইকাবু—গুপ্তচর। গোষ্ঠীপতি বলল। ফ্রান্সিস বুঝল ইকাবুরা এদের শত্রু। ফ্রান্সিসদের ইকাবুদের গুপ্তচর ধরে নিয়েছে। ফ্রান্সিস বুঝল গোষ্ঠীপতিকে বোঝানো যাবে না। তবু ও হাল ছাড়ল না। বলল—ইকাবু কারা কী ব্যাপার আমরা কিছুই জানি না। আমরা এখানে এই প্রথম এসেছি। ইকাবু তো দূরের কথা এই জায়গাই আমরা চিনতাম না। গোষ্ঠীপতি আবার

মাথা দোলাল। বলল—বন্দী—শাস্তি। কথাটা বলেই গোষ্ঠীপতি ফিরে দাঁড়াল। তারপর বনের দিকে চলে গেল। একজন পাহারাদার রইল। বাকিরা গোষ্ঠীপতির পিছনে পিছনে চলে গেল।

দুপুরে ফ্রান্সিসদের ভারী শুকনো পাতায় খেতে দেওয়া হল। বুনো গমের রুটি, আনাজের ঝোল আর আধ কাঁচা চিংড়ি মাছ। একটু অন্যরকম খাবার। একনাগারে সামুদ্রিক মাছ আর ভাল লাগছিল না। ওরা চেটে পুরে খেল।

ওদের খাওয়া শেষ হতেই কালো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—জালঘরের মাথায় কোন ছাউনি নেই। বৃষ্টি হলে ঠায় বসে বসে ভিজতে হবে।

হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

ঝির ঝির বৃষ্টি শুরু হল। বনের গাছগাছালির পাতার শব্দ হতে লাগল—চট্ চট্। ফ্রান্সিসরা ভিজতে লাগল।

ওদের ভাগ্য ভাল। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ততক্ষণে মেঘ সরে গিয়ে সূর্য দেখা দিয়েছে। চড়ারোদ উঠল। ওদের ভেজা পোশাক গায়েই শুকোতে লাগল।

শাঙ্কো তখন বন্দী তিনজনের সঙ্গে ভাব জমাতে ওদের কাছে গেল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমরা কে?

ওরা কিছুই বুঝল না। বারকয়েকের চেষ্টায় একজন বলল—ইকাবু। শাঙ্কো বুঝল এরা গোষ্ঠীপতির শত্রু আর এক গোষ্ঠীর মানুষ। শাঙ্কো আকার ইঙ্গিতে কী ধরনের শাস্তি গোষ্ঠীপতি দিতে পারে সেটা জানতে চাইল। বন্দী ইকাবু হাত পা জোড়া করে দেখিয়ে দিতে বোঝাল হাত পা বাঁধা হবে। তারপর সমুদ্রের খাঁড়িতে ছুড়ে ফেলা হবে। শাঙ্কো আর কোন কিছু জানতে চাইল না। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বন্দীটির কথা জানাল। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল। তাহলে তো পালাতে হয়।

—কিন্তু কী ভাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—দেখছো তো হাত পা বাঁধে নি। খোলা হাত পা নিয়ে একবার বনের মধ্যে ঢুকতে পারলে সহজেই পালানো যাবে।

—তা ঠিক। শাঙ্কো মাথা ওঠা নামা করল।

—পালাতে পারবে? সিনাত্রা আগ্রহে বলল।

—অনায়াসে। এসব শুকনো লতা বুনে বানানো দড়ি। শাঙ্কো সহজেই ছোরা দিয়ে কাটতে পারবে। রক্ষী ও মাত্র একজন। ও বুঝতেই পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। সিনাত্রা বলল।

—সিনাত্রা একটা গান গাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার মাথা খারাপ। ভয়ে আমার গলা দিয়ে কথা সরছে না। আর গান গাইব? সিনাত্রা বলল।

—ঠিক আছে! শুয়ে বিশ্রাম কর। গায়ের জোর রাখো। এখান থেকে বনের দূরত্ব হাত পঞ্চাশেক। সময় মত এ টুকু ছুটে পার হবার মত মনের জোর রাখো। তাহলেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। সিনাত্রা দু'হাত ছড়িয়ে বলল। তারপর ফ্রান্সিসের কথা মত শুয়ে পড়ল। বৃষ্টির জল বালির মধ্যে তখন অনেকটা শুষে গেছে। ভেজা বালির ওপরই শুয়ে রইল ওরা।

রাতে সেই একই খাবার খেতে দেওয়া হল। দু'জন প্রহরী পাহারায় রইল। দু'জন প্রহরী খাবার দিল। ফ্রান্সিসরা বেশ খুশি মনে খেয়ে নিল। ফ্রান্সিসের ততক্ষণে পালাবার ছক ভাবা হয়ে গেছে।

কিন্তু তারপরই বোঝা গেল গোষ্ঠীপতি ফ্রান্সিসদের মত চালাক না হলেও যথেষ্ঠ বুদ্ধি ধরে। প্রহরীরা প্রত্যেকের হাত আর পা লতা দিয়ে বেঁধে দিল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস গোষ্ঠীপতিকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম সে ততটা বোকা নয়। পালাবার রাস্তা বুদ্ধি করে আটকে দিল।

—কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। হাত পা বাঁধা হল। তবে কি আজ রাত্রেই আমাদের সমুদ্রের খাঁড়িতে ফেলে দেবে? ফ্রান্সিস বলল।

—চিন্তার কথা। শাঙ্কো মাথা দুপাশে নাড়িয়ে বলল।

—শাঙ্কো একটা কাজ কর। বন্দীদের কাছ থেকে জানো তো হাত পা কেন বাঁধা হল? ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বন্দীদের কাছে গেল। বেশ কয়েকবার আকার ইঙ্গিতে কথাটা জানতে চাইল। একজন বন্দী আকার ইঙ্গিতে সেই মোটা পাতার গাছ দেখাল। ফুল টুল দেখাল। দু'হাত তুলে প্রনাম করার ভঙ্গী দেখাল। শাঙ্কো বুঝল সমুদ্রের খাঁড়িতে ছুড়ে ফেলার আগে এরা বৃক্ষপূজা করে। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বলল—এই বড় বড় মোটা পাতাওয়লা গাছ গুলো এদের কাছে খুব পবিত্র গাছ। দেখছো না গাছের ডালে ঘর তৈরী করে। এই গাছের শুকনো পাতা আর ঘাস দিয়ে ঘরের ছা'উনি তৈরী করে। এই গাছের পাতা পেতে খাবার খায়। বোধহয় কাছেই কোথাও কোন গাছ ওরা কোন কাজের আগে মানে বিয়েটিয়ে বন্দীকে শাস্তি দেওয়ার আগে পূজো করে ফুল পাতা দিয়ে। ঐপূজো সেরেই আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আজ রাতে সেই পূজো হচ্ছে না। হলে হৈ চৈ শুনতাম। কাজেই আজ রাতের মত আমরা নিশ্চিন্ত। তবে সময় নষ্ট করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারতে হবে।

ফ্রান্সিসরা শুয়ে পড়ল। আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল। চারিদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস আড়চোখে প্রহরীর ওপর নজর রাখল। প্রহরী বর্শা হাতে ঘরাঘুরি করছিল। একটু রাত হতেই প্রহরী আবার কাটাগাছের গুঁড়িতে বসল। হাতের বর্শাটা মাটিতে রাখল। বোধহয় একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।

ফ্রান্সিস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বুঝল প্রহরটি অনড় বসে। তাহলে একটু ঘুম মত এসেছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ঘুমোয় নি। শুয়ে শুয়েই গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস বাঁধা দু'হাত শাঙ্কোর বুকের কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর শাঙ্কোর জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। শাঙ্কোর হাত বাধা লতাটায় ছোরাটা ঘষতে লাগল। লতা কেটে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা নিয়ে গড়িয়ে পেছনে জালের কাছে গেল। তারপর জাল কাটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ছোরা ঘষেও লতার জাল কাটতে পারল না। ঘন বুনটের জাল কাটা প্রায় অসম্ভব মনে হল। শাঙ্কো গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—লতা কাটা যাচ্ছে না।

—বলো কি? ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল।

—সর্বনাশ। ঐ লতার জাল না কাটতে পারলে তো—আবার দেখ। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল।

শাঙ্কো আবার গড়িয়ে জালের কাছে গেল। জোরে ছোরা ঘষতে লাগল জালে। জাল একটু কাটল। কিন্তু সময় লাগল বেশি। যেটুকু কাটল তাতে ফাঁক হল সামান্যই। সেই ফাঁকা দিয়ে গলে যাওয়া অসম্ভব। আবার গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ওর অসাফল্যের কথা বলল। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। বোঝাই যাচ্ছে সহজে ঐ লতার বুনট করা কাটা যাবে না। অন্য উপায় ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রহরীকে কব্জা করে পালাতে হবে এবং একবারের চেষ্টায় না পারলে প্রহরীর সংখ্যা গোষ্ঠীপতি বাড়িয়ে দেবে। তখন পালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ফ্রান্সিস এসব ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরল। তখনই দেখল বন্দী তিনজন একেবারে কোনে লতার জালের কাছে শুয়ে পড়ে কী করছে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর কাছে এল।

—দেখ তো ঐ তিনজন কী করছে? শাঙ্কো একবার প্রহরীর দিকে তাকাল।

দেখল প্রহরী ঝিমোচ্ছে। ও গড়িয়ে কোনার দিকে এল। বন্দীদের একজন হাতের চেটো দেখিয়ে শাঙ্কোকে চুপ করে থাকতে বলল। শাঙ্কো দেখল তিনজন লতার দড়ি বুনট নিপুন হাতে খুলছে। শাঙ্কো এবার বুঝল লতা দড়ি কাটা যাবে না। বুনট খুলে লতার দড়ির জাল খুলতে হবে। আর সেটা করতে হবে উল্টো দিকের বুনট খুলে। ও গড়িয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বন্দীরা কী করছে বলল। ফ্রান্সিস বলল—এটাই পালাবার সহজ পথ। ওরা বুনট খুললেই বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। বন্দীরা চেষ্টা করেও বেশি অংশ খুলতে পারল না।

ভোর হওয়ার আগেই ওরা খোলা লতার দড়ি জালে জড়িয়ে রাখল। তারপর সরে এল। ফ্রান্সিস এবার শাঙ্কোর হাতের কাটা বাঁধনটা নিয়ে শাঙ্কোর হাতে বেঁধে দিল। শাঙ্কোর হাত খোলা দেখলে বিপদে পড়তে হবে। বাঁধা হাত নিয়ে শাঙ্কো শুয়ে পড়ল।

তখনই সিনাত্রার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও এতসব ঘটনা জানতে পারল না। ফ্রান্সিস ওকে কিছু বলল না। ও ফ্রান্সিসকে বলল—তাহলে পালাতে পারবে না?

—হ্যাঁ পারবো। সময় এলেই দেখবে। শাঙ্কো বলল।

—কী ভাবে সেটা বল। সিনাত্রা জানাতে চাইল।

—আজ রাতেই দেখবে। ফ্রান্সিস বলল।

ততক্ষণে বন্দী তিনজন কোনা থেকে সরে এসে মাঝামাঝি জায়গায় শুয়ে পড়েছে। অবশ্যই ঘুমের ভান করে।

সকাল হল। প্রহরীরা সকালের খাবার নিয়ে এল। সবার হাতের বাঁধন খুলে দিল। সবাই খেল। প্রহরীরা জাল ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেল। একজন প্রহরী বর্শা হাতে পাহারা দিতে লাগল।

এরপরে প্রহরীরা ওদের দুবার খেতে দিল। দুপুরে আর রাতে। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর আবার সবার হাত পা বেঁধে দেওয়া হল। দু দুবারেও খোলা জাল প্রহরীদের নজর পড়ল না। প্রহরীরা একজন প্রহরীকে রেখে চলে গেল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—যাক—ফাঁড়া কাটল। আজ রাতেই পালাতে হবে।

সব বন্দীরাই শুয়ে পড়ল।

রাত বাড়তে লাগল। প্রহরীটি কাটাগাছের গোড়ায় বসল। একটু পরেই তন্দ্রায় ঢুলতে লাগল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সেটা। ও গলা চেপে ডাকল—

শাঙ্কো। শাঙ্কো উঠে বসল। ফ্রান্সিস ওর জামার মধ্যে হাত চালিয়ে ছোরাটা বার করল। শাঙ্কোর হাতের বাঁধনে ঘযতে ঘযতে কেটে ফেলল। এবার শাঙ্কো ছোরাটা ঘষে ঘষে ওর পায়ের বাঁধন কাটল। ঘুমন্ত সিনাত্রার পিঠে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বলল—চুপ করে শুয়ে থাকো। তারপর সিনাত্রার হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিল। সিনাত্রা হাঁ করে দেখতে লাগল। এবার শাঙ্কো বন্দী তিনজনের হাতপায়ের বাঁধন কেটে দিল। খোলা হাত পা পেয়ে ওরা খুশি। এবার অনেক দ্রুত হাতে বুনট খুলতে হবে।

শেষ রাত নাগাদ অনেকটা বুনট ওরা খুলে ফেলল। ওরা আর দাঁড়ল না; ফাঁক গলে দ্রুত বনের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—পালাও। তিনজনে ফাঁক গলে তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

ফ্রান্সিসের পালাও কথাটা বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর কানে গিয়েছিল। ওর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ও অবাক হয়ে দেখল ফ্রান্সিসরা জাল ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ও মাটি থেকে বর্শা তুলে ছুটে এল। ওদের কাছাকাছি এসে বর্শা তোলার আগেই শাঙ্কো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে প্রহরীটি মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে বর্শাটা ছিটকে পড়ল। শাঙ্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। এবার তিনজনই ছুটল বনের গাছগাছালির দিকে। প্রহরীটা উঠে বসে গলায় শব্দ করল—হি—হি—ই। এটা বোধহয় ওদের লড়াইয়ের ডাক।

তখন ফ্রান্সিসরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কখনও গাছের গুড়িতে পা রেখে কখনও গাছের পাশ দিয়ে ওরা ছুটল সমুদ্রের দিকে। বনতল অন্ধকার। কাজেই খুব জোরে ওরা ছুটতে পারল না। সিনাত্রা দু'একেবার হোঁচট খেল। ওদিকে প্রহরীর চিৎকার বনের মধ্যে শোনা যেতে লাগল। গাছের ঘরে ঘরে লোক জনের কথা শোনা যেতে লাগল। যোদ্ধারা বর্শা হাতে মই বেয়ে গাছের ওপরের ঘর থেকে নেমে আসতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল না। ওরা এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা বনের বাইরে চলে এসেছে। ছুটে চলেছে বালিয়াড়ির দিকে। বালিয়াড়ি পার হচ্ছে তখনই যোদ্ধারা বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল। দূর থেকে বর্শা ছুঁড়ল কয়েকজন যোদ্ধা। বর্শাগুলো বালিয়াড়ির বালিতে গেঁথে গেল।

জাহাজের পাটাতন পাতাই ছিল। তখন সূর্য উঠেছে। ভোরের আলোয় পাটাতন দিয়ে দ্রুতপায়ে ওরা জাহাজে উঠে পড়ল। ফ্রান্সিসরা তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ওরা দু'জনে পটাতন তুলে ফেলল।

জাহাজের ডেক-এ যেসব ভাইকিংরা শুয়ে ছিল তারা ছুটে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপতে বলল—এখন কথা নয়। পাল খুলে দাও। দাঁড় ঘরে যাও। নোঙর তোল। যত তড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাবো আমরা।

ভাইকিং বন্ধুরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যোদ্ধারা তখন হালের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু অসহায় চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। কিছুই করার নেই। ওরা লড়াইয়ের ডাক দিল—হি—ই—ই। কিন্তু কাদের সঙ্গে লড়াই করবে? জাহাজ ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে সমুদ্রতীর থেকে জাহাজের দূরত্ব বাড়তে লাগল। এক সময় ফ্রান্সিসদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এল। শাঙ্কো তখন হাত পা নেড়ে বন্ধুদের বলছে বৃক্ষবাসী মানুষদের কথা। কী করে পালাল সেইসব কথা।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলছে। সেদিন সকাল থেকে বাতাস পড়ে গেছে। কেমন একটা গুমোট ভাব। অগত্যা জাহাজের গতি বাড়াতে দাঁড় ঘরে যেতে হল কিছু ভাইকিংকে। বিনেলো নামে এক ভাইকিংকে ফ্রান্সিস দায়িত্ব দিল দাঁড় ঘরের কাজ দেখার জন্যে। বিনেলো শাঙ্কোর মতই দুঃসাহসী। ফ্রান্সিস ওকে নানা দায়িত্ব দিয়ে দিয়ে তৈরী করতে লাগল। বিস্কোর অভাব ও পূরণ করবে। ভাইকিংরা বিনেলোর নির্দেশ মানতে লাগল। বিনেলো লক্ষ্য রাখল যাতে দাঁড় টানার ছন্দে কোন ছেদ না পড়ে।

দিন আট দশ কাটল। সমুদ্রে সেদিন উত্তাল হাওয়া। পালগুলো ফুলে উঠছে যেন বেলুনের মত। পূর্ণ গতিতে জাহাজ চলছে। কিন্তু তখন ও পর্য্যন্ত ডাঙ্গা দেখা গেল না। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের উপরে নিজের জায়গায় বসে চারিদিক নজর রাখছে। কিন্তু কোথায় ডাঙ্গা?

দিন পনেরো পরে সেদিন বিকেলে পেড্রো ডাঙ্গা দেখতে পেল। বরাবরের মত চিৎকার করে মাস্তুলের ওপর থেকে বলল—ডাঙা—ভাইসব ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে। মারিয়া তখন জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে। ও যেমন প্রত্যেকদিন সূর্যাস্ত দেখতে আসে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখল—সূর্যাস্তের ঘোর কমলা রঙের আকাশের নিচে কালো মাটি। অস্পষ্ট দেখল জাহাজ ঘাট। দু'একটা জাহাজও রয়েছে।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসও ডেক-এ উঠে এসেছে। সঙ্গে হ্যারি। দু'জনেই জাহাজ ঘাট দেখল। অন্য বন্ধুরাও এসেও রেলিং ধরে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—এখন কী করবে ফ্রান্সিস?

—একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। অন্ধকারে এখানে নামা চলবে না?

এখানের কিছুই আমারা জানি না। এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ তাও জানি না। কাল সকালে নামা যাবে। ফ্রেজারকে গিয়ে বলো তীরের কাছে জল গভীর থাকলে তীরে জাহাজ ভেড়াতে—ফ্রান্সিস বলল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রেজার জাহাজ তীরে ভেড়াল। জল ওখানে গভীর। নোঙর ফেলা হল। তখনই ঘাটে নোঙর করা জাহাজ দুটো হ্যারি মনোযোগ দিয়ে দেখল। একটা জাহাজ ছোট। অন্যটা মালবাহী জাহাজ। ছোট জাহাজের মাথায় সাদা পতাকা। তার মানে যে কোন দেশের জাহাজ হতে পারে ওটা। মালবাহী জাহাজের মাথায় স্পেন দেশের পতকা উড়ছে। তার মানে স্পেনীয় মানুষদের জাহাজ।

আশ্চর্য। দুটো জাহাজই জনহীন। কোন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

—ফ্রান্সিস—হ্যারি ডেকে বলল—লক্ষ্য করে দেখ জাহাজে দু'টোয় কোন নাবিক বা ক্যাপ্টেন কেউ নেই।.

—কী জানি। শাঙ্কো বলল—তবে হতে পারে কাছেই এখানকার নগর। জাহাজীরা ফুর্তিটুর্তি করতে গেছে। কতদিন পরে মাটির দেখা পেয়েছে। খুশি হওয়ারই কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু। ব্যাপারটা তেমন মনে হচ্ছে না। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

গভীর রাত তখন। শাঙ্কোরা কয়েকজন ডেক-এ ঘুমিয়ে আছে। পেড্রোও ওদের সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে। নজরদারি করছে না। সমুদ্রের বেগবান বাতাসে অন্যরাও ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে পেড্রোর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে ও ভাঙা চাঁদের আলোয় দেখল খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। ও চিৎকার করে উঠতে গেল। যোদ্ধাটা তরোয়ালের ডগাটা ওর গলায় ঠেকিয়ে মৃদুস্বরে বলল—কোন শব্দ করবে না। উঠে চুপ করে বসে থাকো। পেড্রো আর কী করবে? উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। শাঙ্কোরাও উঠে বসেছে। যোদ্ধাদের সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। ওরা সংখ্যায় আট দশজন। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। গায়ে নানা রঙের সুতোয় কাজ করা ঢোলা হাতা পোশাক?

শাঙ্কো তখন ভাবছে হাঁতে তরোয়াল থাকলে একটা লড়াই দেওয়া যেত। শাঙ্কো লক্ষ্য করল যোদ্ধাদের পোশাক ভেজা। তার মানে জলে ডুব সাঁতার দিয়ে এসে ওরা জাহাজে উঠেছে। বোঝাই যাচ্ছে এরা জলদস্যু নয়। কিন্তু এভাবে সহজে এসে ওদের বন্দী করার কারন কী? এরা কারা?

ওদিকে চারপাঁচজন যোদ্ধা সিঁড়ি দিয়ে নিচের কেবিনঘরের দিকে নেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারি, ভেন আর অন্য বন্ধুরা ডেক-এ উঠে এল। পেছনে খোলা তারোয়াল হাতে যোদ্ধারা। একজন বেশ মোটা যোদ্ধা গলা চড়িয়ে বললে—তোমাদের দল নেতা কে? ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে বলল—আমি।

—তোমরা রাজা কার্তিলার আদেশে বন্দী হলে। দলপতি বলল।

—আমাদের অপরাধ? ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা মহামান্য রাজা কার্তিলা বুঝবে। দলপতি বলল।

ওদিকে সিঁড়িঘরের আড়ালে বিনেলো ঘুমিয়ে ছিল। ওই জায়গাটাই ওর বরাবরের ঘুমের জায়গা। মোটা যোদ্ধাটিই যোদ্ধাদের সর্দার। ওর কথাবার্তায় বিনেলোর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সব দেখল।

কেউ কিছু বোঝার আগেই বিনেলো ছুটে এসে এক দলপতিকে প্রচন্ড ধাক্কা দিল। দলপতি এই হঠাৎ আক্রমণে টাল সমালাতে পারল না। উবু হয়ে ডেক-এ উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাতের তরোয়াল খাস পড়ল। বিনোলা তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর বিনেলো নিপুণ হাতে ওদের সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল। ফ্রান্সিস বাধা দেবার সময়ই পেল না। চারজন সৈন্যের সঙ্গে বিনেলা একাই লড়াই করছে। একজন যোদ্ধা সুযোগ বুঝে বিনেলোর পায়ে তারোয়ালের ঘা বসাল। রক্ত বেরিয়ে এল। তবু বিনেলো লড়াই চালাতে লাগল। দু'জন যোদ্ধা আহত হয়ে সরে দাঁড়াল। শাঙ্কো আর স্থির করতে পারল না। ও বুকের দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তারপর যে যোদ্ধাটি বিনেলোকে আহত করেছিল ছুটে গিয়ে তার পেটে আমূল ছোরা বসিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল বিপদ। এবার যোদ্ধারা সবাই ওদের দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিনোলা আর শাঙ্কোর জীবন বিপন্ন হবে।

ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—বিনোলা—শাঙ্কো—লড়াই নয়। বিনোলা দাঁড়িয়ে পরে হাঁপাতে লাগল। যোদ্ধারাও হাঁপাচ্ছে তখন। লড়াই থেমে গেল। দলপরি চেঁচিয়ে বলল—তোমাদের বিচার হবে। চলো সব।

যোদ্ধারা নিজেরাই কাঠের পাটাতন পেতে দিল। আগে আহত যোদ্ধাদের নিয়ে ওরা কয়েকজন নেমে গেল। দলপতি ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা নেমে গেল। অন্য যোদ্ধারা ওদের পেছনে পেছনে নামল। সবাই বড় রাস্তা ধরে চলল।

তখন ভোর হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। রাস্তার

দু'পাশে দোকান টোকান খুলছে। ফ্রান্সিসরা নির্দেশমত চলল। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস একই স্বরে বলল—ওরকম মাথা গরম করা তোমার উচিত হয়নি। এতে আমাদের বিপদ বাড়ল।

—যোদ্ধাটি অন্যায়ভাবে বিনেলোকে আহত করেছে। শাঙ্কো বলল।

—স-অব মেনে নিতে হবে। পরে অস্ত্রহাতে লড়াইয়ের সুযোগ করে নেবে। এখন চুপচাপ সব সহ্য করে যাও। ফ্রান্সিস বিনেলোকে কাছে ডেকে একই কথা বলল।

রাস্তার লোকজন ফ্রান্সিসদের বেশ উৎসুকের সঙ্গে দেখছে। এতজন বিদেশী নিশ্চয়ই সাজা হবে এদের।

ওদিকে বিনেলোর পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে ভেনকে দেখল মারিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল—ভেন। বিনেলোর তো চিকিৎসার দরকার।

—উপায় কি বলো। আমার ওষুধ পড়লে এক্ষুণি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ওষুধ তো জাহাজে। ভেন বলল।

—দেখ রাজাকে বলে। ভেন বলল। মারিয়া নিজের পোশাকের নিচে থেকে কিছুটা লম্বা কাপড় ছিঁড়ে ভেনকে দিয়ে বলল—তুমি অন্তত পট্টিটা বেঁধে দাও। ভেন কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে বিনেলোর কাছে যাচ্ছে তখনই একজন যোদ্ধা ছুটে এল বলল—নড়াচড়া চলবে না। সব দাঁড়িয়ে থাক।

—ওর পা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। অন্তত পট্টিটা বাঁধতে দাও। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল।

—না। মহামান্য রাজার হুকুম না হলে কিছু হবে না। যোদ্ধাটি বলল।

—তাহলে তোমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ঠান্ডা মাথার হ্যারি চিৎকার করে বলল।

—না। রাজার হুকুম চাই। যোদ্ধাটি বলল। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যোদ্ধাদের দলপতি এগিয়ে এল। বলল—সবাইকে রাজসভায় নিয়ে যাও।

যোদ্ধারা সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের রাজসভায় নিয়ে চলল।

রাজসভায় ঢুকে ফ্রান্সিসরা দেখল বেশ বড় ঘর। রাজা কার্তিলা একটা কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। ফ্রান্সিসরা গিয়ে দাঁড়াতেই দলপতি এগিয়ে গিয়ে

সেনাপতিকে কিছু বলল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের রাজার কাছে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে গেল। রাজা কিছু বলার আগেই ফ্রন্সিস বলে উঠল—আমরা বিদেশী ভাইকিং। আপনার রাজত্বে আমরা এই প্রথম এলাম। এখানকার নিয়ম কানুন আমরা কিছুই জানি না। কী অপরাধে আমাদের বন্দী করা হল তাই জানতে চাইছি। রাজা দলপতির দিকে তাকাল। দলপতি মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা এরা আমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে। দু'জনকে আহত করেছে। আর একজনকে হত্যা করেছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বুঝল—খুবই বিপদ উপস্থিত। হ্যারি বলে উঠল—

—আমাদেরও একজন আহত হয়েছে। তবু মৃত্যুর জন্যে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আমাদের বন্ধু এক বন্ধুকে আহত হতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। আঘাতকারীকে সে আহতই করতে চেয়েছিল। হত্যা করতে চায়নি।

—কোন কথা শুনতে চাই না। রাজা প্রায় চিৎকার করে বলল। তারপর সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—কে সেই হত্যাকারী?

দলপতি শাঙ্কোকে অঙ্গুল তুলে দেখাল।

—চাবুক মারো। উপযুক্ত শাস্তি। রাজা বলে উঠল।

দলপতি ছুটে এসে শাঙ্কোকে রাজার সামনে নিয়ে এল। একজন প্রহরী চাবুক হাতে এগিয়ে এল। দলপতি চাবুকটা হাতে নিল। তারপর শাঙ্কোর পিঠে চাবুক মারতে লাগল। চারপাঁচটা চাবুকের ঘা শাঙ্কো মুখ বুঝে সহ্য করল। তারপর আর পারল না। ওর মুখ থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। শাঙ্কোর কষ্ট বিকৃত মুখের দিকে ফ্রান্সিস তাকিয়ে থাকতে পারল না। মাথা নিচু করল। শাঙ্কোর পিঠের দিকে পোশাক ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস হাত তুলে চিৎকার করে উঠল—থামো। দলপতি হাঁপাতে হাঁপতে রাজার দিকে তাকাল।

—চাবুক চালিয়ে মেরে ফেল। রাজা কার্তিনা চেঁচিয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিস দাঁত চাপাস্বরে বলল—আর একবার চাবুক মারলে আমরা লড়াইয়ে নামব।

রাজা হো হো করে হেসে উঠল। বলল—তোমাদের হাতে একটা লাঠিও নেই।

—নিরস্ত্র অবস্থায় কী করে লড়াই করতে হয় আমরা জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা সবাই মরবে। রাজা বলল।

—আমাদের বন্ধুকে বাঁচাতে আমরা মরতে প্রস্তুত। ফ্রান্সিস বলল। মনে রাখবেন আমরা ভাইকিং। আমরা মৃত্যুর পরোয়া করি না।

তখনই মন্ত্রী উঠে দাঁড়াল। বলল—কিন্তু ও তো আমাদের এক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে।

—তার জন্যে আমরা ক্ষমা চাইছি। আমরা তো বললাম—ও হত্যা করতে চায়নি। যোদ্ধাটিকে আহত করতে চেয়েছিল। হ্যারি বলল।

—বেশ। তার শাস্তি ও পেয়েছে। মন্ত্রী বলল। তারপর আসনে বসে পড়ে রাজাকে বলল—মান্যবর রাজা—ক্ষমা করে দিন। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—বেশ। আপনার কথাই থাক।

—মান্যবর রাজা—ফ্রান্সিস বলল—আমাদের কোথায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে?

—কয়েদ ঘরে। রাজা বলল।

—একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বলল।

মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের পরিবেশে উনি থাকতে পারবেন না। অনুরোধ করছি তাঁকে আমাদের জাহাজে রাখুন। উনি তো আর একা জাহাজ চালিয়ে পালাতে পারবেন না।

—থাকুক। তবে আমাদের এক যোদ্ধা পাহারায় থাকবে। রাজা বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস এবার ভেনকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের চিকিৎসক বৈদ্য। ইনিও মধ্যবয়স্ক। একা ওর পক্ষে পালানো অসম্ভব। ওঁকেও আমাদের জাহাজে থাকতে অনুমতি দিন।

—তাহলে দুজন প্রহরী থাকবে। রাজা বলল।

—ঠিক আছে। আমাদের আহত দুই বন্ধুকে উনিই চিকিৎসা করবেন। সেই অনুমতি দিন।

—আমার কোন আপত্তি নেই। তোমাদের আর কোন অনুরোধ রাখা আমার হবে না। রাজা এবার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এদের দু'জন ছাড়া সব কজনকে কয়েদঘরে বন্দী করুন। সেনাপতি বলল—মাননীয় রাজা—আমাদের হুকুমে বন্দরে একটা স্পেনীয় জাহাজ থেকে আর একটা মালবাহী জাহাজ থেকে নাবিকদের বন্দী করে এনে কয়েদঘরের রাখা হয়েছে।

—জাহাজ দুটো তল্লাশী হয়েছে? রাজা জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। সেনাপতি ঘাড় কাত করে বলল।

—মূল্যবান কিছু পাওয়া গেছে? রাজা আবার প্রশ্ন করল।

—সামান্য কিছু বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। সেনাপতি বলল।

—ওদের মুক্তি দাও। প্রতিদিনের খাওয়ার খরচ বাঁচানো যাবে। রাজা বলল।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—চলো সব। বিনেলো শাঙ্কোকে ধরে ধরে নিয়ে এল। সিনাত্রাও সাহায্য করল।

রাজবাড়ির বাইরে এল সবাই। সামনে পেছনে যোদ্ধারা। রাজবাড়ির পেছনে কয়েদঘরের সামনে এল। দলপতি সকলের আগে ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রহরীদের একজনকে বলল—বন্দর থেকে যে নাবিকদের বন্দী করা হয়েছে তাদের সবাইকে ছেড়ে দাও।

প্রহরীরা দরজা খুলে নাবিকদের বেরিয়ে আসতে বলল। বন্দী নাবিকরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। তারা সংখ্যায় পঁচিশ তিরিশ জন।

তারা সদর রাস্তায় নেমে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল।

তোমরাতো হত দরিদ্র। তল্লাশী হয়ে গেছে। প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নি। দলপতি বলল। কথাটা হ্যারিও শুনতে পেল। গলা নামিয়ে বলল—রাজকুমারীর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। ভাগ্যিস তোমাদের কেবিনঘরের কাঠের দেয়ালের ফাঁকে সোনার চাকতি গুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। মৃদু হাসল। কষ্ট করেই হাসল। কারন শাঙ্কোর জন্যে ওর মন ভালো নেই।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরে ঢোকানো হতে লাগল। মারিয়া আর ভেন একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ঢুকে গেল।

দলপতি দু'জন প্রহরীকে সঙ্গে নিয়ে মারিয়াদের কাছে এল। প্রহরীদের দেখিয়ে বলল—এরা তোমাদের জাহাজে যাচ্ছে। পালাবার চেষ্টা করবে না। মারিয়ার কথা বলতে ইচ্ছা করল না। দু'জনে প্রহরীর পাহারায় জাহাজ ঘাটের দিকে চলল।

কয়েদঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল ঘরটা নেহাৎ ছোট না। হাত পা ছড়িয়ে থাকা যাবে। দেখল আগে থেকেই তিন'জন বন্দী রয়েছে। মধ্য বয়স্ক একজন বৃদ্ধ আর অন্যজন যুবক। মধ্যবয়স্কর চেহরায় বেশ রাশভারি। মুখে অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। সুগোঠিত দেহ। একজন সাহসী যোদ্ধার মতই চেহারা।

শাঙ্কোকে ততক্ষণে ধরে ধরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও চিৎ হয়ে শুতে পারছে না। ও বাঁদিকে কাতর হয়ে শুয়ে রইল। ও গোঙাচ্ছে না। কিন্তু ওর যন্ত্রনাক্লিষ্ট মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ও প্রাণপণে যন্ত্রনা সহ্য করছে।

ফ্রান্সিস আশায় রইল কতক্ষণে ভেন আসে।

বেশ কিছুক্ষর পরে ভেন ঝোলা কাঁধে এল। যাহোক প্রহরীরা ওকে বাধা দিল না। দরজা খোলা হল। ভেন ঘরে ঢুকল। কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে মেঝেতে রাখল। শাঙ্কোর কাছে গেল। বলল—জামাটা খোল। শাঙ্কো মাথা নেড়ে বলল—পারবে না। খুলে দাও। বিনেলো এগিয়ে গেল। শাঙ্কোর গায়ে চাবুকের মারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া জামাটা কোনরকমে খুলে দিল। তারপর পিঠের ক্ষত ভেন পরীক্ষা করল। বোঝা থেকে দুটো বোয়াম বের করল। হাতের তালুতে ওষুধ নিয়ে ঘষে ঘষে বড়ি বানাল। বিনেলোকে বলল—এখন একটা বড়ি খাইয়ে দাও। পরে দিনে তিনটে করে বড়ি খাওয়াবে। ওষুধগুলো ঠিকমত খাইয়ে দিও। বিনেলোর পা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে তখনও। ভেন ঝোলা থেকে একটা কাঠের কৌটো বার করল। কৌটার মুখ খুলে সবুজেমত গুঁড়ো ক্ষতস্থানে ঢেলে দিল। বিনেলা আঃ শব্দ করল মুখে। ভেন বলল—রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ব্যাথাও কমবে। একটু সহ্য কর। বিনেলো কিছু বলল না।

ভেন ঝোলায় বোয়াম কৌটো ভরতে ভরতে বলল—

—তরোয়ালের ক্ষত শুকিয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। তবে শাঙ্কোর ঘা সারতে একটু সময় লাগবে। ও যেন বেশি নাড়াচাড়া না করে। আমি পরশু আসবো। ওষুধ দেব।

—রাজকুমারীর দিকে নজর রেখো। জাহাজে তুমি ছাড়া আর কেউ তো রইল না। হ্যারি বলল।

—তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। রাজকুমারীকে আমি প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করব। ভেন বলল। তারপর ঝোলা কাঁধে নিয়ে চলে গেল।

দুপুরে খাবার দেওয়া হল। লম্বাটে শুকনো পাতায় দেওয়া হল আধপোড়া গোলরুটি আনাজের ঝোল আর সবশেষে আশ্চর্য! পাখির মাংস। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল। প্রহরীরাই খেতে দিয়েছিল। শাঙ্কোকে ওষুধ খাওয়ানো হল। পাখীর মাংস বেশ পেট পুরেই খেল ওরা। পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফ্রান্সিস চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন শুনল—তোমরা তো বিদেশী। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। দেখল লম্বা চুলওয়ালা যুবকটি কখন ওর কাছে এসে বসেছে। শাঙ্কোর জন্যে মনটা ভাল নেই তবু কথা বলল—

—হ্যাঁ অমারা ভাইকিং।

—ও। দুঃসাহসী হিসেবে তোমাদের সুনাম আছে। যুবকটি বলল।

ফ্রন্সিস চুপ করে রইল।

—তোমার নাম কী? যুবকটি জানতে চাইল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার নাম আতলেতো। পর্তুগালে আমার জন্ম। কিন্তু বড় হয়েছি এখানে। আতলেতো বলল।

—রাজা কার্তিনা তোমাদের বন্দী করেছেন কেন? আতলেতো জিজ্ঞেস করল।

ফ্রান্সিস আহত শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল—ও মাথা গরম করে কার্তিনার এক যোদ্ধাকে মেরে ফেলেছে।

—মাত্র একটাকে মেরেছে। গোটা পাঁচেক যোদ্ধাকে মারতে পারল না। আতলেতো বলল।

—একটাকে মেরেই চাবুক খেয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা কার্তিনা তোমার বন্ধুকে মেরে ফেলেনি এটাই আশ্চর্য। কার্তিনার মত নরপশু দু'টি নেই। আতলেতো বলল।

—তোমাদের অপরাধ। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

সেই রাশভারি চেহারার মানুষটি দেখিয়ে আতলেতো বলল—

—উনি এই লাগাস রাজ্যের রাজা—এনিমার। বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলল—উনি মন্ত্রীমশাই। রাজা কার্তিনার রাজ্য পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর। লড়াই করে এই লাগাস রাজ্য জয় করেছে রাজা কার্তিনা। মন্ত্রীকে আর আমাকে এই কয়েদ ঘরে বন্দী করে রেখেছে। এখন আমাদের ফাঁসি দিলেও আমরা অবাক হব না। আতলেতো বলল।

—আর সেনাপতি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লড়াইয়ে মারা গেছেন। তখন আমাকেই সেনাপতির কাজ চালাতে হচ্ছিল। সেই আমিও হেরে গিয়ে বন্দী। আতলেতো বলল।

—রাজা এনিমারের তো এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—উনি অন্য রকম মানুষ। নিজের গ্রন্থগারেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন। লড়াই রক্তপাত মৃত্যু এসব মোটেই পছন্দ করেন না। তাই রাজা কার্তিনা সহজেই জয়লাভ করেছে।

—রাজত্ব রাখতে গেলে যুদ্ধ লড়াই আছেই। তারপর পার্শ্ববর্তী রাজ্য যদি আক্রমণকারী হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা এনিমার এসব ব্যাপারে উদাসীন। ভালো মানুষ যেমন হয় আর কি। আতলেতো বলল।

—তোমরা বন্দী হলে কীভাবে। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা এনিরের জন্যে। দিন দশেক আগের কথা। তখন বেশ রাত। ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎই বড় রাস্তায় হৈ চৈ শুনলাম। তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখি রাজা কার্তিনার নেতৃত্বে তার যোদ্ধারা রাস্তা দিয়ে ছুটছে আমাদের সৈন্যবাসের দিকে। বুঝলাম ঘুমন্ত সৈন্যদের ওরা অক্রমন করতে চলেছে। তখন আর আমাদের সৈন্যদের সাবধান করার সময় নেই। রাজা এনিমারকে বাঁচাতে আমি বাড়িঘরের ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে রাজবাড়ির সামনে এলাম। দেখলাম প্রহরীদের সঙ্গে ওদের সৈন্যদের লড়াই চলছে। আমি লড়াইয়ে জড়ালাম না। যেকরে হোক রাজা এনিমারকে বাঁচতে হবে। লড়াইয়ের ফাঁকে আমি রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়লাম। দেখি রাজা এনিমার ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসে আছেন। আমি ছুটে এসে অন্দরমহলে প্রহরীকে বললাম—

—শিগগিরি যাও। পেছনের দরজা খুলে দাও। ফিরে এসে দেখি রাজা পোশাক বদল করেছেন। বেরোবার জন্যে তৈরি। আমি বললাম—

—প্রহরীরা শত্রুসেনার সঙ্গে লড়ছে। এই সুযোগ আমরা পেছনের দরজা দিয়ে পালাবো।

—না। আমি ধরা দেবো। রাজা এনিমার বলল।

—বলেন কি? আমি বেশ চমকে উঠলাম।

—হ্যাঁ। আমি ধরা দিলেই লড়াই বন্ধ হবে। আর রক্ত ঝবে না। রাজা বললেন।

—আপনার ফাঁসিও দিতে পারে। আমি বললাম।

—দিক। তবু রক্তপাত তো বন্ধ হবে। রাজা বললেন।

আমি নানাভাবে রাজা এনিমার বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রাজা অনড়। বন্দীদশাই মেনে নেবেন। আতলেতো থামল।

—তারপর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তখনই একজন প্রহরী এসে জানিয়ে গেল লড়াই করতে করতে সেনাপতি মৃত্যবরণ করেছেন। মন্ত্রীর বাড়ি আক্রমন করে মন্ত্রীকে বন্দীকে করা হয়েছে। রাজা এনিমার আমাকে বললেন—যাও। এখনও যে যোদ্ধারা বেঁচে আছে তারা যেন অস্ত্রত্যাগ করে। অথবা লড়াই থামিয়ে পশ্চিমে বনজঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। মোট কথা লড়াই নয়। রাজার আদেশ। মানতেই হবে। একটু থেমে আতলেতো বলতে লাগল—রাজবাড়ির দেউড়ি ছাড়িয়ে রাস্তায় এলাম। তখন প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই শেষ। আহত মৃত

প্রহরীরা দেউড়ি এখানে ওখানে পড়ে আছে। একটু থেমে আতলেতা বলতে লাগল--

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখনও আমাদের যোদ্ধারা লড়াই করে চলেছে। আমি দুহাত তুলে চিৎকার করে লড়াই থামালাম। আমাদের যোদ্ধাদের রাজার আদেশ জানালাম। আত্মসর্মপন করতে বললাম। যোদ্ধারা আমার ইঙ্গিত বুঝল। গ্রেপ্তারি এড়াতে সবাই দলে দলে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে ছুটল। কিছু বন্দী হল অবশ্য। তাদের সৈন্যবাসের একটি ঘরে বন্দী রাখা হয়েছে। একটু থেমে আতলেতা বলতে লাগল---রাজবাড়ির অন্তঃপুরে তখন রাজা কার্তিনার সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। রাজা কার্তিনা স্বয়ং রাজা এনিমারের শয়নঘরে এসে হাজির হল। হাতে খোলা তরোয়াল। রাজা এনিমার বললেন---আমাকে বন্দী করুন। অনুরোধ লড়াই বন্ধ করুন। লড়াই ততক্ষণে থেমে গেছে। রাজা কার্তিনা আমাকে আর রাজাকে বন্দী করল। তারপরে আমাদের এই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল। ওরা মন্ত্রীর বাড়িও আক্রমন করেছিল। সেখান থেকে মন্ত্রীকেও বন্দী করেছিল। ফ্রান্সিস চুপ করে সব শুনল। তারপর বলল---আতলেতা আমাকে তুমি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে চলো।

—বেশ। চলো। আতলেতা বলল।

দু'জনে রাজা এনিমার কাছে এল। আতলেতা ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে সব কথাই বলল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রাজা এনিমার বলল—তোমাদের দেখেই বুঝেছি তোমরা বিদেশী। তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে এটা ভেবেও আমার কষ্ট হচ্ছে।

—মহামান্য রাজা—আমরা নির্বিঘ্নে পালাবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুক। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল। রাজা এনিমার কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

—শুধু এদের খাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা আর পাহারা দেওয়ার অবস্থাটা দেখতে দিন। মুশকিল হয়েছে আমার এক বন্ধু আহত। এসব ব্যাপারে আমি তার ওপর খুব নির্ভর করি। যাইহোক আর কোন বন্ধুকে নিয়েই সেই কাজটা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

---কিন্তু রাজা কার্তিনা খুব ধুরন্ধর লোক। পাহারায় কোন গাফিলতি রাখবে না। এনিমার একটু নিম্নস্বরে বলল।

---তাহোক। অনেক কড়া পাহাড়া থেকে আমরা এর আগে পালিয়েছি।

এখন সময় আর সুযোগ বুঝে নেওয়া। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো—যদি পারো। একটু হতাশভঙ্গীতেই রাজা এনিমার বললেন।

—আপনি একজন সত্যিকারে মহানুভব রাজা। ফ্রান্সিস বলল।

—মহারাজা আমাদের সন্তানতুল্য দেখেন। আতলেতা বলল।

—সেইজন্যে আমি স্থির করেছি আপনাদের যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে আমরাও আপনাকে মুক্ত করতে আর আপনার রাজত্ব আপনাকে ফিরিয়ে দিতে রাজা কার্তিনার বিরুদ্ধে লড়াই করব।

—রাজা কার্তিনার সৈন্য সংখ্যা কিন্তু কম নয়। রাজা বললেন।

—আমরা চোরাগোপ্তা আক্রমন করে ওদের নাজেহাল করে ছাড়বো। ফ্রান্সিস বলল। রাজা এনিমার আর কিছুই বলল না। ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় চলে এল। হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—রাজার সঙ্গে কী কথা হল? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব কথা বলল।

—আবার লড়াইয়ে নামব? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই লড়াই চালাবো। রাজা এনিমার সম্পর্কে সব তো শুনলে। এরকম একজন মানুষের জন্যে একটু করব না? ফ্রান্সিস বলল।

দুপুর হল। দু'জন পাহারাদার কাঠের গামলায় খাবার দাবার নিয়ে এল। সবার সামনে একটা করে গাছের লম্বাটে পাতা একজন প্রহরী পেতে দিল। তারপর অন্যজনের সঙ্গে মিলে খাবার দিতে লাগল। আধপোড়া রুটি আনাজপাতির ঝোল আর সমাদ্রিক মাছের ঝোল মত। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেয়ে নিল। শুধু শাঙ্কো খেতে পারছিল না। ফ্রান্সিস ওকে জোর করে খাওয়াল। রাজাও নিঃশব্দে একই খাবার খেলেন। বন্দীদের জন্য রান্না করা খাবার রাজা কখনও খাননি। কিন্তু এই খাবার খেলেন। তাঁর বিরক্তির কোন কারন নেই। নিজের জীবনে এই আকস্মিক দুরবস্থা সরল মনেই মেনে নিয়েছেন। এটা ফ্রান্সিসের খুব ভাল লাগল। যখন খাবার খাচ্ছিল তখন লক্ষ্য করছিল দু'জন প্রহরী বর্শা হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। আর দু'জন যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে এদিক ওদিক ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে পাহারায় কোন ঢিলেমি নেই।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল। আতলেতা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—রাজা এনিমার বলছিলেন পালানোর ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছো কিনা।

—রাজার কাছে চলো। রাজার সঙ্গে কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে ডেকে নিয়ে রাজার কাছে এল। রাজা দেওয়াল ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসেছিলেন। পাশে মন্ত্রী।

—মান্যবর রাজা—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

—বলো। চোখ খুলে রাজা বললেন।

—আপনি রাজা কার্তিনার সঙ্গে কথা বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি মুক্তিভিক্ষা করব না। রাজা বলল।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না। সেসব কথা বলতে বলছি না। দু'টো কথা আপনি বলবেন—এক—মন্ত্রী বৃদ্ধ মানুষ। তিনি কোনভাবেই রাজা কার্তিনার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। তাঁকে তাঁর বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হোক। কয়েদঘরের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আর কি নিয়ে কথা বলবে? রাজা বললেন।

—দুই—বন্দরের জাহাজ থেকে বেশকিছু নাবিক ও জাহাজীকে বন্দী করে এই কয়েদঘরে রাখা হয়েছিল। তারা মুক্তি পেয়ে চলে গেছে। এখন এই বড় কয়েদঘরে আপনার বন্দী যোদ্ধাদের বন্দী করে রাখা হোক অর্থাৎ আমরা ঐ যোদ্ধাদের সঙ্গেই শাস্তি ভোগ করতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এই ঘরে অত সৈন্য—থাকতে অসুবিধা হবে না? রাজা বললেন।

—তা হবে। কিন্তু আমাদের সেটা মানিয়ে নিতে হবে। এসব বলছি এই জন্যে যে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। দু'একদিন আমাদের সবাইকে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। কথা বলব। তবে কথা রাখবে কিনা জানি না। রাজা বলল।

—রাখবে। কারন এসবের জন্যে তার কোন ক্ষতি হবে না। তাহলে কাল সকালে রাজসভায় গিয়ে—ফ্রান্সিস কথা শেষ করতে পারল না।

— না। এখানেই আসতে বলল। রাজা বললেন।

—বেশ। তাই বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডেকে বলল—এসো। রাজা এনিমার রাজা কার্তিনার সঙ্গে কথা বলবেন। রাজা কার্তিনাকে খবর পাঠাও।

—রাজা কার্তিনা কি দেখা করবেন? প্রহরী বলল।

—তুমি একবার বলে তো দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি বলে। প্রহরী কথাটা বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল—রাজা কার্তিনা দেখা করবে না। ফ্রান্সিস বেশ হতাশ হল। অথচ যে দুটি ব্যাপার নিয়েও কথা বলাবে ভেবেছিল সেসব অবশ্যই করাতে হবে।

এবার আতলেতা এগিয়ে এল। বলল—রাজা কার্তিনা যাতে কথা বলতে

আসে আমি তার ব্যবস্থা করছি। ও রাজা এনিমারকে বলল---মান্যবর রাজা আপনি অতীতের রাজা সিয়াভোর গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের কথা বলবেন এই খবর পাঠান। দেখবেন লোভী রাজা কার্তিনা ছুটে আসবেন।

—ওসব নিয়ে আর কি বলবো? রাজা বললেন।

—প্রোমিওর কথা বলবেন। তারপর ফ্রান্সিস যা বলতে চাইছেন তা বলবেন। আতলেতো বলল।

—ঠিক আছে। প্রহরীকে বল। রাজা বললেন। আতলেতো দরজার কাছে গেল। প্রহরীকে বলল---তুমি রাজা কার্তিনাকে খবর দাও যে রাজা এনিমার অতীতের এক রাজার গুপ্ত রত্ন ভান্ডারের কথা বলবেন।

—বেশ। গিয়ে বলছি। তবে রাজা কার্তিনা আসবে না। প্রহরী বলল।

—দেখা যাক। আতলেতো বলল। প্রহরী চলে গেল।

অল্পক্ষনের মধ্যেই রাজা কার্তিনার এসে হাজির। পিছনে সেই প্রহরী। রাজা কার্তিনার হেসে বলল—রাজা সিয়েভোর গুপ্ত রত্নভান্ডারের কথা শুনেছি। কোথায় আছে সেই রত্নভান্ডার?

—তা বলতে পারবো না। রাজা এনিমার বলল।

—কেউ কি সেই গুপ্ত রত্নভান্ডার খোঁজার চেষ্টা করে নি? কার্তিনা বলল।

—হ্যাঁ। আমার পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন হদিশ পাননি। সবশেষে চেষ্টা করেছিল এক স্পেনিয় যুবক—প্রোমিও। কিন্তু সে রহস্যজনকভাবে মারা গেছে। রাজা এনিমা বললেন।

—এবার আমি খুঁজবো। কার্তিনা বলল।

—বেশ। রাজা এনিমার মাথা কাত করে বললেন। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—-মান্যবর রাজা—আমার কথা দু'টো।

—একটা কথা। আমার দুটো অনুরোধ আছে। রাজা এনিমার বললেন।

—বলুন বলুন। নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করবো। কার্তিনা বলল।

—বিশেষ কিছুই না। এক—মন্ত্রী মশাই বৃদ্ধ। এই কয়েদঘরের ধকল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে তাঁর বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখুন।

—বেশ তো। আর একটা অনুরোধ? রাজা কার্তিনা বলল।

—এই ঘরে যথেষ্ট জায়গা আছে। আমার বন্দী যোদ্ধাদের এইঘরে ওদের রাখুন। ওদের সঙ্গে আমি দন্ডভোগ করতে চাই। রাজা এনিমার বললেন।

—কিন্তু আপনার অত সৈন্য কি এইঘরে আঁটবে? কার্তিনা বলল।

---হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমরা কষ্ট করেই থাকব। রাজা এনিমার বলল।

---আপনার যেমন অভিরুচি। কার্তিনা বলল। তারপর দু'জন প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল---তোমরা সৈন্যাবাস থেকে দু'জন প্রহরীকে নিয়ে এসো। তারপর মন্ত্রীমশাইকে মুক্ত করে তার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে রাখো। বাড়ির বাইরে সেই দু'জন প্রহরী দিনরাত পাহারা দেবে। নজর রাখবে—মন্ত্রীমশাই যেন পালাতে না পারে। মন্ত্রীকে নিয়ে প্রহরী দু'জন চলে গেল। রাজা কার্তিনা বলল—আপনি একজন স্পেনীয় যুবক প্রোমিওর কথা বলছিলেন। সে কী ভাবে গুপ্তধন খুঁজেছিল?

--প্রোমিও একটা বইমত লিখে গেছে—জনৈক জলদস্যুর কাহিনী। যে সরাইখানা প্রোমিওর আকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছিল বইটা সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল। সেই বইতে ওর গুপ্তধন খোঁজার কথা লেখা আছে। রাজা এনিমার বললেন।

—কোথায় আছে সেই বই? রাজা কার্তিনা বললেন।

—আমার পাঠকক্ষে। বই নিন পড়ুন। কিন্তু দোহাই—হারাবেন না। যথাস্থানে রেখে দেবেন। রাজা এনিমার বলল।

—নিশ্চয়ই। রাজা কার্তিনা ঘাড় নেড়ে বলল। তারপর কিছু না বলে চলে গেল।

ফ্রান্সিস গুপ্তধনের কথা এই প্রথম শুনল। ও সমস্ত কাহিনীটা জানতে আগ্রহী হল। কিন্তু বইটা তো এখন পাওয়া যাবে না। অগত্যা অপেক্ষা করতে হবে। এখন ভাবতে হবে মুক্তির কথা। ও মনকে তাই বোঝাল।

পরের দিন সকালেই রাজা এনিমার বন্দী সৈন্যরা দল বেঁধে এল। রাজা কার্তিনার সৈন্যরা ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে এল। তারা সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও কয়েদঘরে গাদাগাদি ভিড় হল। অসুস্থ শাঙ্কোরই কষ্ট হল বেশি। ওর পিঠের ক্ষত ভেনের ওষুধে এখন শুকিয়ে যাবার মুখে। তবে এরকম গাদাগাদি করে থাকা। হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দূর্বল। ওরও কষ্ট হতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওদের কাছে এল। বলল—দু'একটা দিন কষ্ট করে থাকো। এরমধ্যেই পালাবো। রাজা এনিমারের সৈন্যরা আসায় আমাদের যোদ্ধা সংখ্যা বাড়ল। পালাতে সুবিধে হবে। সৈন্যবাসে গিয়ে ঐ বন্দীদের আমরা মুক্ত করতে পারতাম না। এখান থেকে মুক্তি হওয়া অনেক সহজ। ছক কষা হয়ে গেছে। এখন কাজে লাগানো।

পরের দিনটা ফ্রান্সিস প্রায় শুয়ে শুয়ে কাটাল। সর্বক্ষণ পালাবার ছকটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবল। পালানোর ছক নিখুঁত হওয়া চাই।

সন্ধ্যেবেলা আতলেতা আর বিনেলোকে কাছে ডাকল। আতলেতাকে বলল—তোমাদের অস্ত্রাগারটা কোথায়?

—এই কয়েদঘরের ওপাশে রাজার পাঠকক্ষ। তারপরের ঘরটাই অস্ত্রগার।

—ঠিক আছে। এবার বিনেলোকে বলল—শাঙ্কো অসুস্থ। এসব কাজে শাঙ্কোই আমার বড় ভরসা ছিল। যাহোক তোমাকে যা বলছি তা শাঙ্কোরই মতই করতে হবে। সব কাজ যত দ্রুত সম্ভব সারতে হবে। তারপর ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পালাবার ছকটা বুঝিয়ে দু'জনকে বলল। বিনেলোক চাপাস্বরে বলে উঠল—সাবস্ ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল—সাফল্য নির্ভর করছে তোমাদের তৎপরতার ওপর আর আমাদের সাহসের উপর।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। সব বলল। হ্যারি বলল—তোমার পরিকল্পনা নিখুঁত।

তারপর ফ্রান্সিস চারজন বন্ধুকে ডাকল। ওরা কাছে এলে বলল—তোমরা কোমরেব ফেট্টি খুলে সিনাত্রার হাতে দাও। চারজনই ফেট্টি খুলে সিনাত্রাকে দিল।

—এ ব্যাপারে রাজাকে কিছু বলবে না? আতলেতা জানতে চাইল।

—না এসব শুনে রাজার দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল—

—রাজাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দাও। বিনেলো শাঙ্কোর কাছ থেকে ছোরাটা নিয়ে রাখলো। শাঙ্কোকে ছোরাটা বের করে দিল।

রাত হল। ফ্রান্সিস কয়েকজন নিয়ে তৈরি হল।

রাত দাড়ল। রাতের খাবার নিয়ে দু'জন প্রহরী ঢুকল। একজনের হাতে কাঠের গামলায় খাবার রাখার লম্বাটে শুকনো পাতা। ফ্রান্সিস বাইরের দিকে তাকাল। ভেজানো দরজার লম্বাটে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখল তরোয়াল হাতে দু'জন যোদ্ধা এদিক ওদিক ঘুরছে। তরোয়াল কোষবদ্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে এক প্রহরীর হাতের খাবার-ভরা কাঠের গামলাটা তুলে নিয়ে প্রহরীর মুখে ছিটিয়ে দিল। প্রহরীটি এই হঠাৎ আক্রমনে দিশেহারা হল। খাবারের ঝোল লেগে ওর চোখ জ্বালা করে উঠল। দুহাতে দুচোখ চেপে বসে পড়ল। বিনেলো ততক্ষণে অন্য প্রহরীর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে। তার হাত থেকে রুটির থালা পাতা ছিটকে গেল। ও ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল। সিনাত্রা ছুটে এসে ফেট্টির কাপড় দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেলল। অন্য প্রহরীটি তার চোখ দু'হাতে চোখ মুছে দিল। সিনাত্রা এক লাফে তার সামনে এসে ফেট্টি

কাপড় দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেলল। দু'জন প্রহরীর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল।

বাইরের যোদ্ধা দু'জন তরোয়াল খাপ থেকে খুলে নিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধে ছোরা বসিয়ে দিল। প্রহরীটি তরোয়াল ফেলে দিয়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল তুলে নিল। অন্য প্রহরীটা ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। এখন লড়াইয়ের সময় নেই। দ্রুত প্রহরীটিকে পরাস্ত করতে হবে। ফ্রান্সিস প্রচন্ড বেগে তার তরোয়ালের ঘা মারল। প্রহরীর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে সেই তরোয়ালটা তুলে নিল।

সিনাত্রা ছুটে এসে আহত প্রহরীটির মুখ বেঁধে ফেলল। অন্য প্রহরীটিকে তখন কয়েকজন ভাইকিং চেপে ধরেছে। তার মুখ ফেট্টির কাপড় দিয়ে বাঁধা হল। চারজনের মুখই বাঁধা পড়ল। ফ্রান্সিস প্রহরী আর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—পালাও—জল্‌দি। বন্ধুরা খোলা দরজার দিকে ছুটল। রাজা এনিমার হাঁ করে এসব দেখছিলেন। আতলেতা রাজার কাছে এসে বলল—মাননীয় রাজা বেরিয়ে আসুন—তাড়াতাড়ি। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত কয়েদঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। কার্তিনার যোদ্ধাদের ঘর থেকে বেরোতে দিল না ফ্রান্সিস। নিজে বাইরে এসে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল। চাবি নেই। ঝোলানো তালাতেই কাজ চলবে।

সবাই বাইরের ছোট মাঠটায় এল। ফ্রান্সিস ডেকে বলল—আতলেতা—কোনদিকে পালাবো?

—পশ্চিম দিকে। পাহাড়ে জঙ্গলে। চলো সব। আতলেতা বলে উঠেই বড় রাস্তা দিয়ে পশ্চিমদিকে ছুটল। পেছনে আর সবাই। বিনেলো শাঙ্কোকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ছুটল। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই ছুটে চলেছে। সিনাত্রা রাজাকে ছুটতে সাহায্য করছে। ফ্রান্সিস আগেই ওদের এই দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছে।

সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

ফ্রান্সিস পিছনে তাকিয়ে দেখল দূরে সৈন্যরা ছুটে আসছে। ততক্ষণে ফ্রান্সিস বনের গাছগাছালির কাছে চলে এসেছে।

অল্পক্ষনের মধ্যেই সবাই অন্ধকার বনভূমিতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে দূর থেকে সৈন্যদের হৈ হল্লা শোনা যাচ্ছে। বনের মধ্যে ভাঙা

জ্যোৎস্না পড়েছে। কখনও বড় বড় গাছের গুঁড়ির ওপর পা রেখে কখনো পাশ কাটিয়ে ফ্রান্সিসরা বনের মধ্যে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের হৈ হল্লা আর শোনা গেল না।

হঠাৎ সামনে একটা আধভাঙা ঘর। আতলেতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই মন্দিরেই আশ্রয় নেওয়া যাক। এই মন্দিরে রাজা এনিমারের কুলদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা এখানেই প্রতি শনিবার সকালে পূজো দিতেন।

সবাই মন্দির ঘরে ঢুকল। লম্বাটে ঘরটার এক কোনায় উঁচু পাহাড়ের বেদী। তার উপর একটা পাথরের এবড়ো খেবড়ো মূর্তিমত। কিছুটা ভাঙা চালা দিয়ে জোৎস্না পড়েছে। মূর্তির সামনে ফুলপাতা ছড়ানো।

এবড়োখেবড়ো পাথরের মেঝেয় সবাই বসে পড়ল। সবাই হাঁপাচ্ছে। রাজা এনিমার বেদীর কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। বেদী ছুঁয়ে হাতটা বুকে রাখলেন।

ফ্রান্সিস দ্রুত শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—শাঙ্কো—তুমি—। ওকে থামিয়ে দিয়ে শাঙ্কো হেসে বলল—আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেবো না। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। দেখল হ্যারি শুয়ে পড়েছে। হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ওরা হয়ত আমাদের খোঁজে এখানে আসবে।

—উঁহু। এখন নয়। কাল সকালে আসবে। দিনে তবু কিছু আলো পাবে। তখনই খোঁজা সুবিধে। এখন তো বনতল অন্ধকার। ফ্রান্সিস হ্যারির পাশে শুয়ে পড়ল।

রাতে কারো খাবার খাওয়া হয়নি। খাবারভর্তি কাঠের গামলা প্রহরীর মুখে ছুঁড়ে ফেলে ফ্রান্সিসরা পালিয়েছে। কাজেই সবাই ক্ষুধার্ত।

ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে এই খাবারের সমস্যার কথাই ভাবছিল। একটু পরে ডাকল-হ্যারি?

—বলো।

—আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ।

—কতদিন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে হবে বুঝতে পারছি না। সুতরাং খাবারের জোগাড় রাখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খাবারের দোকান থেকে সেসব চুরি করে বা সোনার চাকতির বিনিময়ে কিনে আনতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? হ্যারি একটু সংশয়ের সঙ্গে বলল।

—সেটা সদর রাস্তায় না গেলে বুঝতে পারছিনা। মনে হয় রাজা কার্তিনার

সৈন্যরা সৈন্যাবাসে চলে গেছে। অন্ধকার বনে জঙ্গলে-আমাদের খোঁজ পাবে না। কাজেই সকালের জন্যে ওরা অপেক্ষা করবে। এই সুযোগে আমাদের খাবার জোগাড় করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে লুকিয়ে নগরে যেতে হয়। হ্যারি বলল।

—তাই যাবো। আজ রাতের মধ্যেই কাজটা সারাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বন্ধুদের ডাকো। হ্যারি বলল।

—না। শুধু আমি একা যাবো। রাজা এনিমারের জন দশেক সৈন্য নিয়ে। আমরা বিদেশী দোকানদাররা আমাদের চিনে ফেলবে। রাজা এনিমার সৈন্যরা গেলে দোকানদারের মনে কোন সন্দেহ হবে না। সহজেই আটা ময়দা চিনি পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। তুমিই ওদের নিয়ে খাবারের জিনিসপত্র আনো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। আতলেতার কাছে গেল। আতলেতা শুয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—আতলেতা—ওঠ। কাজ আছে। আতলেতা উঠে বসল।

—তুমি নগরের আটা ময়দার দোকান তো চেনো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আতলেতা মাথা কাত করে বলল।

—সে সব আনতে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ আজ বাকি রাতের মধ্যেই আনতে হবে। তুমি কয়েকজন তোমাদের সৈন্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু—আতলেতাকে থামিয়ে ফ্রান্সিস বলল—

—কোন কিন্তু নয়। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। না খেয়ে লড়াই করা যাবে না। খাদ্য চাই। যাও কয়েকজনকে নিয়ে এসো।

—বেশ। চলো। আতলেতা বলল। তারপর শুয়ে বসে থাকা কয়েকজন সৈন্যকে ডাকতে গেল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—শাঙ্কো এখন কেমন আছো?

—অনেকটা ভালো আছি। শাঙ্কো বলল।

—শোন—খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি চারটে সোনার চাকতি দাও ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা চারটে সোনার চাকতি বের করে ফ্রন্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস দেখল কয়েকজন সৈন্যকে সঙ্গে দিয়ে আতলেতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা ভাল করে কোমরে গুঁজে নিলো।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবার আগে আতলেতা চলল। ফ্রান্সিসরা পিছন পিছন চলল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই বনাঞ্চল শেষ। সবাইকে গাছের আড়ালে রেখে ফ্রান্সিস বড় রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় যতদূর দৃষ্টি যায় দেখল। রাজা কার্তিনার সৈন্যদের চিহ্নমাত্র নেই। ফ্রান্সিস হাত নেড়ে সবাইকে ডাকল।

বড় রাস্তার ধার দিয়ে ফ্রান্সিস চলল। পিছনে আতলেতারা।

দুধারে দোকানপাট শুরু হল। ফ্রান্সিস দূরে নজর রেখে চলল। বেশ দূরে রাস্তায় রাজা কার্তিনার কয়েকজন সৈন্যের নড়াচড়া লক্ষ্য করল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে একটা দোকানের পেছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আতলেতা সৈন্যদের নিয়ে এসে ফ্রান্সিসের পিছনে দাঁড়াল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু হল। আরোও বেশ কিছুটা গিয়ে ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—আতলেতা—দোকানটা কোথায়?

—এসে গেছি। ঐ খেজুর গাছটার নিচে। আতলেতা মৃদুস্বরে বলল। খেজুর গাছের কাছে এসে দাঁড়াল সবাই। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে সোনার চারটে চাকতি বার করে আতলেতাকে দিল। বলল—আটা ময়দা চিনি ছাড়াও মাটির বড় হাঁড়ি কাঠের বড় থালা একখন্ড কাঠের ছোট পাটাতন কাঠের কিছু গ্লাস এসব লাগবে। দোকানদারকে দিয়েই একটু তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারবে। হাতে সময় কম।

—তুমি যাবে না? আতলেতা বলল।

—না আমি এই খেজুর গাছের নীচে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। ফ্রান্সিস বলল।

আতলেতা এগিয়ে গিয়ে দোকানের পিছনে কাঠের দরজায় টোকা দিল। বারকয়েক টোকা দিতে দরজা খুলে গেল। দোকানদার এসে দাঁড়াল। আতলেতার সঙ্গে তার কথাবর্তা হল। আতলেতা সৈন্যদের নিয়ে পিছন দিয়ে দোকানে ঢুকল।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই সৈন্যরা কাঁধে আটা ময়দা চিনির বস্তা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। একটু পড়ে আতলেতার সঙ্গে বাকিরাও বেরিয়ে এল। হাঁড়ি কাঠের ছোট পাটাতন গ্লাস এসব নিয়ে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলে উঠল—জলদি চলো সব। এক মুহূর্ত দেরি নয়।

সবাই জিনিসপত্র নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বনভূমির দিকে চলল।

ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে ওরা তো সৈন্য। কষ্ট গায়ে মাখল না। চলল সবাই।

কিছুক্ষনের মধ্যেই বনের ধারে এসে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে তাকাল। রাজা কার্তিনার সৈন্যদের দেখা নেই।

আধ-ভাঙা মন্দিরঘরের এসে পৌঁছল সবাই। ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে এসে বলল—সবাই যাও। উনুনের জন্যে পাথর কাঠকুটো জোগাড় করে আনো। ভোরের আগেই খাওয়া সেরে নিতে হবে। জল্‌দি।

বন্ধুরা বেশ কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। চলল কাঠকুঠো পাথর জোগাড় করতে।

সেসব জোগাড় করে ফিরে এল অল্পক্ষনের মধ্যে-ই। ফ্রান্সিস দুই রাধুনি বন্ধুকে বলল —রান্নায় লেগে পড়।

—জল চাই। একজন রাঁধুনি বলল। আতলেতো পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বলল—ঝর্না আছে দুটো। হাঁড়ি নিয়ে চলো। হাঁড়ি নিয়ে একজন আতলেতোর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ভোরের আগেই রুটি তৈরী হয়ে গেল। চিনি দিয়ে রুটি খেল সবাই। রাজাও খেল। যাহোক ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হল।

ওরা খাচ্ছে তখনই গাছে গাছে পাখির ডাক শুরু হল। বোঝা গেল ভোর হয়ে এসেছে।

ভোর হল। সবাই শুয়ে শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

কিছু পরেই ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু উঁচু গলায় বলল—উঠে পড়ো সবাই। এখানে থাকলে আমরা ধরা পড়ে যাবো। এই মন্দিরের ঘর কার্তিনার সৈন্যরা চেনে। ভুলে যেও না আমাদের মাত্র দু'জনের হাতে তরোয়াল আছে। বাকি সবাই নিরস্ত্র। আমাদের আত্মগোপন করতে হবে।

—ফ্রান্সিস—একটা গুহা আছে। অতলেতো বলল।

—না। ওখানে নয়। গুহার কথাও ওরা জানে। ঘন বনের এলাকাটা কোনদিকে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একটা সরোবর আছে। তার পূর্বদিকে বন খুব ঘন। বড় বড় গাছলতাপাতার সংখ্যাটা বেশি। নিচে দিয়ে হাঁটাই যায় না। আতলেতো বলল।

—ওখানেই চলো সব। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সারা রাত ঘুম নেই করো। শরীর একটু দুর্বল লাগছে সবারই। কিন্তু উপায় নেই। সবাই নিরস্ত্র। কার্তিনার সৈন্যরা এলে ধরা পড়তে

হবে সহজেই। এসব কথা ভাবতে হল সবাইকে। রাজা এনিমার উঠে দাঁড়ালেন। আতলেতার পেছনে পেছনে চলল সবাই।

বেশ কিছুটা যেতে দেখা গেল সামনেই একটা সরোবর। সকালের আলো পড়ে জলে মৃদু ঢেউ চিক্‌চিক্‌ করছে। সরোবরের ডানপাশে জঙ্গলে ঢুকল সবাই। সত্যিই গভীর বন। বড় বড় গাছের জটলা। একফোটাও রোদ ঢুকছে না। অন্ধকার বনতল। মোটা মোটা গাছের গুঁড়িতে পা রেখে অথবা কোনরকেমে পাশ কাটিয়ে একটা একটু ফাঁকা জায়গায় এল সবাই। অতলেতো বলল—এখানেই বিশ্রাম নেব। চারধারে বড় বড় গাছ। নজরে পড়ার কোন সম্ভবনা নেই। সবাই এখানে ওখানে বসল। কেউ মোটা দুলছে এমন লতায় কেউ গাছের গুঁড়িতে কেউ ঝরাপাতার স্তূপের ওপর। সবাই কম বেশি হাঁপাচ্ছে তখন। রাজা এনিমার বসলেন একটা গাছের গুড়িতে। কেউ কোন কথা বলছে না।

তখন একটু বেলা হয়েছে। হঠাৎ দূরে ঐ মন্দিরঘরের দিকে রাজা কার্তিনার সৈন্যদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির শব্দ কিছুটা অস্পষ্ট শোনা গেল। বোঝা গেল ফ্রান্সিসের অনুমান ঠিক। ওরা সকলেই ফ্রান্সিসদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ রাজা এনিমার গাছের গুঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটু গলা চড়িয়ে বললেন—তোমরা এখানেই থাকো। আমি রাজা কার্তিনার হাতে ধরা দিতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস শুকনো পাতার স্তূপের উপর বসেছিল। দ্রুত উঠে রাজার কাছে ছুটে এল। বলল—আপনি কী বলছেন? আপনি ধরা দিলে রাজা কার্তিনা আপনাকে ফাঁসি দিতে পারে।

—দিক। লড়াইতো বন্ধ হবে। আর কারো প্রান যাবে না। রক্তপাত বন্ধ হবে। রাজা বললেন।

—আপনি ধরা দিলে রাজা কার্তিনা নির্বিঘ্নে আপনার প্রজাদের হত্যা করতে মরীয়া হয়ে উঠবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। ও এই লাগাস রাজত্বে রাজা হবে। আর নরহত্যা করবে না। রাজা বললেন। ফ্রান্সিস নানাভাবে রাজা এনিমাকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু রাজা এনিমা নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ফ্রান্সিস আতলেতাকে বলল—ভাই তুমি রাজাকে বোঝাও। আতলেতা মৃদুস্বরে বলল—তুমি রাজা এনিমাকে জানোনা। ওর সঙ্কল্প থেকে কেউ ওকে নড়াতে পারবে না। তখন ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—মান্যবর রাজা আমার অনুরোধ—আজকের রাতটা আমাকে সময় দিন। যা করবার কালকে করবেন।

—দেখ—তোমরা বিদেশী—আমার জন্যে তোমরা প্রান দেবে কেন? রাজা বললেন।

—আমরা সবাই মারা যাবো এটা ভাবছেন কেন? আমরা পরিকল্পনা মত এগোব। যাতে একজন যোদ্ধাও মারা না যায়। তার জন্যে সাবধান হব আমরা। আর আমাদের দু'একজন বন্ধু যদি লড়াই করতে গিয়ে মা- -য় বা আহত হয় তার জন্যে আপনাকে আমরা দোষী মনে করব না। তাই আবার অনুরোধ করছি—আজ রাতটা আমাকে সময় দিন। রাজা মাথা নিচু করলেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। মাথা তুলে বললেন—ঠিক আছে। আজকের রাতটাই তোমাকে সময় দিলাম। কিন্তু যাই করনা কেন কেউ যেন মারা না যায়।

—কিন্তু মান্যবর রাজা লড়াই হবেই। ওরা সহজে আত্মসমর্পন করবে না। তবে কেউ যাতে মারা না যায় সেভাবেই লড়াই চালাব আমরা। তবে আহত হতে পারে। এটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মৃত্যু না হলেই হল। রাজা বলল।

—কিন্তু ওরা তো মারা যেতে পারে আহত হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার দায়িত্ব ওদের রাজার কার্তিনার— আমার নয়। রাজা বললেন।

যাইহোক রাজা এনিমাকে তাঁর সংকল্প থেকে সরাতে পেরেছে এই ভেবে ফ্রান্সিস খুশি হল। তবে দায়িত্ব বাড়লো। মাত্র আজ রাতের মত সময়টুকু পেল। রাজা কার্তিনাকে যুদ্ধে হারাতে হবে। তার জন্যে পরিকল্পনা চাই। বেশ ভেবে চিন্তে আক্রমণ করতে হবে। জয়ী হতেই হবে। ভরসা এইটুকুই যে দুর্ধষ যোদ্ধা বন্ধুরা রয়েছে। রাজা এনিমার সৈন্যরাও রয়েছে। লড়াইটা প্রায় সমানে সমানেই হবে। আর একটা বড় সমস্যা ভাবতে হচ্ছে। ওরা দু'জন বাদে সবাই নিরস্ত্র। যে করেই হোক রাজা এনিমারের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র জোগাড় করতে হবে। এটা করতে পারলে অৰ্দ্ধেক লড়াই জেতা হয়ে যাবে। লড়াই করতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে যাতে আমাদের হতাহতের সংখ্যা কম হয়।

রাজা এনিমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। সবাই নিশ্চিন্ত হল। ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। ও যা ভাবছে সব বলল। সব শুনে হ্যারি বলল—চোরাগোপ্তা আক্রমন চালাতে হবে। আমাদের লোকক্ষয় যাতে কম হয় অথবা একেবারেই যাতে না হয়।

—হ্যাঁ। দায়িত্বটা বেড়ে গেল। এখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে আমাদের তৈরী হতে হবে।

হঠাৎ আরো দূরে রাজা কার্তিনার সৈন্যদের হৈ হল্লা খুব অস্পষ্ট শোনা

গেল। আতলেতো কাছেই বসে ছিল। বলল—গুহার কাছে গেছে ওরা। ভেবেছে ঐ গুহাতেই আশ্রয় নিয়েছি আমরা।

—বলিছিলাম কি না যে গুহায় আশ্রয় নেওয়া চলবে না। ধরা পড়ে যাবো। নিরস্ত্র অসহায় আমরা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। রাজা কার্তিনার সৈন্যরা হয়ত বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। কিন্তু এদিককার গভীর বনের দিকে ওরা এল না। বোধহয় বুঝে নিল ফ্রান্সিসরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। সকলেই ক্ষুধার্ত সেই রাতে শুধু রুটি খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সিস ঝরা পাতার স্তূপের উপর বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—মন্দিরঘরে চলো সবাই। আগে খেয়ে বিশ্রাম করে নিতে হবে। রাতে ওদের আক্রমন করতে হবে। চলো।

গভীর বনের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসদের চলা শুরু হল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—দেখবে যাতে কম শব্দ হয়।

বেশ সাবধানে চলল সবাই। সবার আগে ফ্রান্সিস আর বিনেলো খোলা তরোয়াল হাতে চলল। তরোয়াল দিয়ে জংলা ঝোপের গাছ লতা কাটতে কাটতে চলল।

মন্দির ঘরের কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে ইঙ্গিত করল। তারপর এক গাছের আড়ালে আড়ালে মন্দিরঘরের খুব কাছে চলে এল। একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল মন্দিরঘরে ধারে কাছে কার্তিনার কোন সৈন্য নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। মন্দিরঘরের মধ্যেও কোন শব্দ হচ্ছে না।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে চাপা গলায় বলল—ওরা চলে গেছে। সবাই মন্দিরঘরে এসো।

সবাই মন্দিরঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আর বিনেলো খোলা তরোয়াল হাতে মন্দিরঘরে আস্তে আস্তে ঢুকল। দেখল মন্দিরঘর জনশূন্য। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে বলল—এসো সবাই।

সবাই ঘরে ঢুকল। মেঝেয় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বন্ধু রাঁধুনি দুজনকে বলল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুটি করো। রুটি চিনি খাওয়া হবে।

রাঁধুনি বন্ধুরা রান্নায় লেগে পড়ল। উনুন জ্বালা হল। কাঠের পাটাতনে আটাময়দা মাখা চলল। ভাগ্য ভাল রাজা কার্তিনার যোদ্ধারা হাঁড়ি উনুন

ভেঙ্গে দিয়ে যায়নি। অনেক তাড়াতাড়ি রুটি করা হল। চিনি দিয়ে রুটি খাওয়া হল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। শুধু রাজা এনিমার মন্দিরঘরের বেদীর কাছে চুপ করে বসে রইলেন। ফ্রান্সিস তাঁর কাছে এল। বলল —মান্যবর—আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবেন না। আপনি এখানেই থাকবেন ঘুমোবেন।

—না—রাজা মাথা নাড়লেন—আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। আমার জন্যে তোমরা জীবন বিপন্ন করবে আর আমি এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো এটা হয় না। আমি অবশ্য লড়াই করতে ভাল জানি না। তবু আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকব।

—বেশ। আপনার যেমন ইচ্ছে। তবে চেষ্টা করবেন যেন ওদের হাতে ধরা না পড়েন।

—আমার জন্যে ভেবো না। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস নিজেও শুয়ে পড়ল। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল। তবে বেশির ভাগ বন্ধু আর রাজার সৈন্যরা জেগেই রইল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—তুমি থাকো।

—বেশ। শাঙ্কো বলল। সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মন্দিরঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবশেষে রাজাও চললেন। প্রায় অন্ধকার বনতল দিয়ে সবাই চলল।

বন শেষ। সামনেই সদর রাস্তা। দোকান ঘরগুলোর পেছনের ঝোপঝাড় দিয়ে সবাই চলল। ফ্রান্সিস কাউকে সদর রাস্তায় উঠতে দিল না। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল।

রাজবাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল রাজবাড়ির দেউড়িতে দু'জন প্রহরী রয়েছে। ফ্রান্সিস রাজবাড়ির পেছনে দিয়ে ঘুরে চলল। তারপর রাজবাড়ির পাশে এল। দেখল সৈন্যবাসের সামনে মশাল জ্বলছে। সামনের মাঠে বা সদর রাস্তায় কোন সৈন্য নেই। ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হল।

এবার ফ্রান্সিস শুধু বিনেলোকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ির ছায়ায় ছায়ায় অস্ত্রঘরের কাছে এল। দেখল দু'জন প্রহরী বর্শা হাতে অস্ত্রাগার পাহাড়া দিচ্ছে। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলল—আমি বাঁদিকেরটা তুমি ডানদিকেরটা। লড়াইয়ের জন্যে সময় দেবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের আহত করবে। চলো—।

দ্রুত ছুটে গিয়ে দু'জনে দুই প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঁদিকের প্রহরীটি ফ্রান্সিসের তরোয়ালের কোপ বাঁ কাঁধে পেয়ে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এক ঝট্‌কায় ওর হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিল। বর্শার ছুঁচোলো মুখ ওর বুকে ঠেকিয়ে বলল— একেবারে শব্দ করবে না। কয়েদঘরে গিয়ে ঢোকো। প্রহরীটি বাঁ কাঁধ ডান হাতে দিয়ে চেপে বিকৃতমুখে কয়েদঘরের দিকে চলল। ততক্ষণে বিনেলো অন্য প্রহরীটির পায়ে তরোয়ালের ঘা মেরেছে। প্রহরীটি পা দু'হাত চেপে বসে পড়েছে। ফ্রান্সিস ওকেও কয়েদঘরের দিকে নিয়ে চলল। দু'জনকেই খোলা দরজা দিয়ে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দিল। দরজার পাশে বড় তালাটা ঝুলছিল। দরজা আস্তে বন্ধ করে কড়ায় তালা ঝুলিয়ে দিল। চাপাস্বরে বলল—কোনরকম শব্দ করলেই মরবে। একেবারে চুপ করে থাকবে। এবার অস্ত্রঘরের চাবিটা দাও। একজন কোমরের চামড়ার বন্ধনী থেকে চাবিটা খুলতে লাগল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল—জল্‌দি। প্রহরীটি চাবি খুলে নিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চাবিটা ফ্রান্সিসকে দিল।

ফ্রান্সিস ছুটল। অস্ত্রঘরের সামনে এল। পেছনে বিনেলো। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—সবাইকে ডাকো। তাড়াতাড়ি। বিনেলো সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই অস্ত্রাগারের সমানে এল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস দরজার তালা খুলে ফেলেছে। সবাই ঘরে ঢুকে তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। রাজবাড়ির আড়াল থেকে রাজা এনিমার এসব দেখতে লাগলেন।

সবাই তরোয়াল হাতে একত্র হলে ফ্রান্সিস সবাইকে চাপাস্বরে বলল—এবার আমরা সৈন্যাবাস আক্রমন করব। ওরা নিরস্ত্র এবং ঘুমন্ত। নিজের জীবন বিপন্ন না হলে কাউকে হত্যা করবে না। আহত করবে। চলো সব। এক মূহুর্ত দেরি করা চলবে না। সবাই খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে মাঠ পার হয়ে সৈন্যাবাসের দরজার সামনে এল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—লাথি মেরে দরজা ভাঙো। ওরা দরজায় লাথি মারতে লাগল। দরজা ভেঙে যেতে লাগল। রাজা কার্তিনার সৈন্যদের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। বিছানায় উঠে বসে দেখল সামনে তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে হয় ভাইকিংরা নয় তো রাজা এনিমারের সৈন্যরা। রাজা কার্তিনার নিরস্ত্র সৈন্যরা সহজেই হার স্বীকার করল।

—এদের মাঠে নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। রাজা কার্তিনার সৈন্যরা স্বপ্নেও ভাবে নি এভাবে তারা পরাস্ত হবে। তখনও ওদের ঘুম কাটেনি। দু'তিনজন সৈন্য গাঁইগুই করছিল। তারা হাতে পায়ে তরোয়ালের ঘা খেল। আর বন্দী হতে আপত্তি করল না।

রাজা কার্তিনার সৈন্যদের মাঠে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হল। ফ্রান্সিসরা

ওদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস এই ভেবে স্বস্তি পেল যে ওদের কেউ মারা যায় নি বা তেমন আহত হয়নি। অভিযান সফল।

ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—বিনেলো—সিনাত্রা—যাও দড়ি নিয়ে এসো। এদের হাত পা বাঁধো দু'জনে সৈন্যাবাসের দিকে ছুটল। খুঁজে খুঁজে পাকানো দড়ি নিয়ে এল। বিনেলো জামার তলা থেকে ছোরা বের করল। দড়ি কেটে কেটে টুকরো করতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা দড়ি নিয়ে রাজা কার্তিনার সৈন্যদের হাত পা বাঁধতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার হাত পা বাঁধা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ওদের বসে পড়তে বলল। ওরা মাঠের ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

রাজা এনিমার বেশ ক্লান্ত বোধ করলেন। সৈন্যাবাসের বারান্দায় বসে পড়লেন। ফ্রান্সিস তাঁর কাছে এল। বলল—রাজা কার্তিনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আপনিও চলুন।

—তাঁকে আর কী বলব বলো। রাজা বললেন।

—অন্তত এদেশ থেকে সসৈন্যে চলে যেতে বলতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। রাজা উঠলেন। দু'জন রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশপথের দিকে যাচ্ছে আতলেতা ছুটে এসে দু'জনের সঙ্গে চলল। ফ্রান্সিস দেখল কিন্তু কিছু বলল না।

প্রধান প্রবেশপথের সামনে আসতে প্রহরী দু'জন বেশ চমকাল। বর্শা বাগিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ও! তোমরা এখনও দেখো নি। এগিয়ে এসে মাঠের দিকে তাকাও। একজন বর্শা নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। মাঠের মধ্যে বসে থাকা কার্তিনার বন্দী সৈন্যদের দেখল। ফ্রান্সিস আর আতলেতার হাতে খোলা তরোয়াল দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও পরিমরি সদর রাস্তার দিকে ছুটল। অন্য প্রহরীটিও ওকে পালাতে দেখে ওর পেছনে পেছনে ছুটল।

তিনজন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকল। আর কোন প্রহরীর দেখা পেল না। সোজা রাজার শয়নকক্ষে এল। ঘুম থেকে উঠে রাজা কার্তিনা বিছানাতেই বসে পড়ল। মাথা নোয়ালো । ফ্রান্সিস পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। বলল—সব জানি। আমাকে কি বন্দী করা হবে?

—সেটা রাজা এনিমার বলবেন। ফ্রান্সিস বলল।

কার্তিনা রাজা এনিমারের দিকে তাকাল। এনিমার বলল—দেখুন—আমি আপনার দেশ আক্রমণ করি নি। আপনিই আগ বাড়িয়ে আমার রাজত্ব জয় করতে এসেছিলেন। রাজা কার্তিনা বলল—যাক গে—আমি এই দেশ ছেড়ে

চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার সৈন্যদের হাতপা—পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হবে—কিন্তু হাতের বাঁধন—খোলা হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমি বাঁধা অবস্থাতেই আমার সৈন্যদের নিয়ে যাবো। রাজা বলল।

—আর একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে আপনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী প্রতিজ্ঞা? রাজা কার্তিনা জানতে চাইল।

—আপনি ভবিষ্যতে আর কখনও রাজা এনিমারের এই রাজ্য আক্রমন করবেন না। ফ্রান্সিস বলল। একটুক্ষন চুপ করে থেকে কার্তিনার বলল—বেশ। প্রতিজ্ঞা করলাম।

—অবশ্য আপনি এই প্রতিজ্ঞা কতটা রাখবেন তাই নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্রান্সিস বলল। রাজা কার্তিনা কোন কথা বলল না। এবার ফ্রান্সিস বলল আপনি কখন এই রাজ্য ছেড়ে যাবেন?

—কালকে? রাজা কার্তিনা বলল।

—না। আজকে। এক্ষুনি। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল। রাজা কার্তিনা একটু থামল। তারপর মাথা কাত করে বলল—বেশ।

—পোশাক পাল্টে রাজবাড়ির বাইরে আসুন। ফ্রান্সিস বলল। তারপর রাজ এনিমারের দিকে তাকিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—আপনি অন্তঃপুরে যান। আমরা দেখি কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

—না। তোমরা আমরা অতিথিশালায় থাকবে। রাজা এনিমার বললেন—চলো আমি তোমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাচ্ছি। আতলেতা বলল।

ফ্রান্সিস আতলেতাকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তখন ভোর হয়ে গেছে। রাজবাড়ির বাগানে পাখির ডাক শুরু হয়েছে। আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

বন্ধুদের কাছে আসতে আসতে ফ্রান্সিস ডাকল—আতালেতা।

—বলো। আতলেতা ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল।

—বলছিলাম—রাজা সিয়াভোর গুপ্ত রত্ন ভান্ডার সম্বন্ধে তুমি কী জানো? প্রোমিও নামে এক স্পেনীয় যুবকের লেখা একটা বইয়ের কথা শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। বইটা বোধহয় রাজা কার্তিনার কাছে আছে। আতলেতা বলল।

—সেই বইটা আমার চাই। তুমি যদি বইটা জোগাড় কর আমাকে দাও তাহলে আমার খুব উপকার হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক সময়ে কথাটা মনে করিয়েছো। রাজা কার্তিনার কাছ থেকে আমি

বইটা নিয়ে আসছি। তোমরা আমাদের কোন সৈন্যকে গিয়ে বল। সে তোমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাবে। আতলেতো বলল।

—বেশ। আর একটা অনুরোধ। তাড়াতড়ি কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর। তুমি তো জানো কী খেয়ে আছি। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—কিছুছ্ ভেবো না। রাজবাড়ির রাঁধুনিরা তো আর বন্দী হয়নি। কাজেই কিছু গরম খাবারের ব্যবস্থা যত তাড়াতড়ি সম্ভব করছি।

কথাটা বলে আতালেতো রাজবাড়ির দিকে চলে গেল।

মাঠে এসে ফ্রান্সিস দেখল বন্ধুরা মাঠে ঘাসের ওপর বসে আছে। রাজা এনিমারের সৈন্যরা সৈন্যবাসের দখল নিয়ে নিয়েছে। বন্দীরাও মাঠে বসে আছে। ফ্রান্সিস বিনোলোকে ডাকল। বলল—সৈন্যাবাসে যাও। ওদের কাছ থেকে জেনে এসো অতিথিশালাটা কোথায়? আর একটা কথা। একটু পরেই রাজা কার্তিনা এখানে তার বন্দী সৈন্যদের কাছে আসবে। তখন ঐ বন্দী সৈন্যদের পায়ের বাঁধন কেটে দিও।

—সেকি! ওরা তখন তো আমাদের আক্রমন করবে। বিনেলো বলল।

—পাগল। নিরস্ত্র ওরা ভালো মারেই করেই জানে খালি হাতে লড়াই করতে এলে ওরা মরবে। যাক গে—যা বললাম করো। ফ্রান্সিস বলল।

বিনেলো সৈন্যাবাসের দিক চলে গেল। তখন কয়েকজন কাঠের মিস্ত্রী সৈন্যাবাসের ভাঙা দরজা মেরামত করছিল।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—নিঁখুত পরিকল্পনা করে আমরা জয়লাভ করেছি। তোমাদের শৌয সাহসের জন্য ই এটা সম্ভব হল। আমাদের কেউ মারাও যায় নি আহতও হয়নি। আমাদের কাজ শেষ। এখন খাবার আনতে বলছি। আমরা সবাই ক্ষুধর্তি। একটু পরেই রাজা কার্তিনা আসবে। তার সৈন্যদের নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তখন আমাদের কাজও শেষ হবে। তাই বলছিলাম দুপুরের খাবার খেয়ে তোমরা জাহাজে ফিরে যাও। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখানে এখন আমি থাকব আর আমার সঙ্গে থাকবে হ্যারি আর বিনোলা। এখন খাবার খেয়ে দু'জন পশ্চিমের বনভূমির মন্দিরঘরে চলে যাও। শাঙ্কো ওখানে রয়েছে। ওকে নিয়ে এসো। শাঙ্কো এখনও সম্পূর্ন সুস্থ নয়। জাহাজে ওর চিকিৎসার প্রয়োজন। ফ্রান্সিস থামল।

দু'জন ভাইকিং বন্ধু পশ্চিমের বনভূমির দিকে শাঙ্কোকে আনতে চলে গেল।

বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—অতিথিশালায় চলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এখন অতিথিশালায় চলো। বিনেলো ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। একজন ভাইকিং বন্ধু যেতে যেতে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা কি তরোয়াল গুলো অস্ত্রঘারে রেখে আসব?

—না। এখনও আমরা বিপদ-মুক্ত নই। আগে রাজা কার্তিনা তার সৈন্যদের নিয়ে চলে যাক। তারপর আমরা অস্ত্র জমা দেব। ফ্রান্সিস বলল।

রাজবাড়ির উত্তর কোণায় অতিথিশালা। ফ্রান্সিসরা অতিথিশালায় ঢুকল। বেশ বড় ঘর। মেঝেয় দড়ি বাঁধা শুকনো ঘাসের বিছানামত। ভাইকিংরা কেউ কেউ বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস সটান শুয়ে পড়ল। তারপর হ্যারিকে কাছে আসতে বলল। হ্যারি ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—অতীতের রাজা সিয়াভোর রত্নভান্ডারের কথাতো শুনেছো।

—হ্যাঁ। তাই আমরা তিনজন থেকে যাবো। রাজা এনিমারের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলব। তবে আজ নয়। আজ বিশ্রাম। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ফ্রান্সিস একটু হাঁপিয়ে উঠে বলল।

—কাল সকালে হয়ত রাজসভা বসবে। তখনই কথা বলব। হ্যারি বলল।

—তাই ঠিক করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই রাজবাড়ির রাঁধুনিরা কয়েকজন কাঠের বড় বড় পাত্রের খাবার নিয়ে এল। আগে পাতা পেতে দিল। তারপর খাবার দিল। পাখির মাংসের ঝোল। ভাইকিংরা চেটে পুটে খেল। রাজবাড়ির রান্না। তার স্বাদই আলাদা। শাঙ্কোকে নিয়ে দুই বন্ধু এল। তারাও খেল।

তখনই ওরা দেখল— হাত বাঁধা বন্দী সৈন্যদের নিয়ে রাজা কার্তিনা চলে যাচ্ছে। তার মাথা নিচু। বোঝাই যায় এভাবে ছেড়ে যাবে তা কল্পনাও করতে পারেনি।

দুপুর হল। আর এক দফা খাবার এল। সবাই খেল। এবার ভাইকিংরা অস্ত্রঘরের তরোয়াল জমা দিয়ে জাহাজ ঘাটের দিকে দল বেঁধে চলল। ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

সন্ধ্যের একটু পরে আতলেতা এল। হাতে একটা মোটা চামড়ার বই। বইটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল। বলল—সেই স্পেনীয় যুবক প্রোমিওর লেখা বই। রাজা দিলেন।

ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। দ্রুত উঠে বসল। বলল—মনে হচ্ছে বইটা কাজে লাগবে। হ্যারির হাতে বইটা দিয়ে বলল—হ্যারি তুমি বইটা পড়ে যাও। আমি

শুনি। হ্যারি বইটা নিল। চামড়া বাঁধাই বইটার মলাট ওল্টালো। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—জনৈক জলদস্যুর কাহিনী। হ্যারি পড়তে শুরু করার আগে একটু পড়ে নিয়ে বলল—পুরোন স্পেনীয় ভাষায় লেখা। শোন—আমার নাম প্রোমিও। অনেক দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে দিন কেটেছে আমার। স্পেনের সমুদ্র তীরবর্তী একটা ছোট বন্দরশহরে আমার জন্ম। জন্মবধি শুধু অভাবই দেখেছি আমি। বাবা ছিল সেই ছোট বন্দরের মোট বাহক। মা মারা গিয়েছিল। আমরা তিন ভাইবোন। আমি সকলের বড় ছিলাম। বাবা আমাকে একটা চাল-ভাঙা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না। কিন্তু বাবা তো আমাকে বই খাতাই কিনে দিতে পারত না। কাজেই স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার নিতে হত। তারাও সব সময় বই দিত না। হঠাৎ বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাস মাইনে দিতে না পেরে আমি বিপদে পড়লাম। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিতে আর পাড়লাম না। শেষ পর্যন্ত বাবার কাজটা পেলাম। তখন আমি যুবক। মোট বাহকের কাজ করতে লাগলাম। বাবা সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিল। বন্দরের কর্তা আমাকে ছাড়িয়ে দিল।

আমার বয়সী যুবকদের দেখতাম সুখে আছে। কেউ কেউ বিয়ে করে সংসারীও হয়েছে। বড়লোকের ছেলেদের উদ্দাম আনন্দের জীবন দেখতাম। তখনই ভেবেছিলাম—বড়লোক হতে হবে। তখন এক যাত্রীবাহী জাহাজে কাজ নিলাম।

জাহাজের খালাসি হয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল। তখনই এক জলদস্যু দলের জাহাজের পাল্লায় পড়লাম আমরা। লড়াই করলাম। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারলাম না। কিছু যাত্রীর সঙ্গে আমাদেরও অনেকে মারা গেল। তাদের কোনরকম শেষকৃত্য হল না। জলদস্যুদের ক্যাপটেন পরে নাম জেনেছি—সার্ভানো—সব মৃতদেহ ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে আদেশ দিল। আদেশ পালিত হল। যাত্রীদের স্বর্নমুদ্রা সহ জামাকাপড় সব লুঠ করা হল। আমি দেখলাম জলদস্যুতা করলে বড়লোক হতে পারব। আমি ক্যাপটেন সার্ভানোকে আমার ইচ্ছে জানালাম। আমি অভাবের মধ্যে মানুষ হলেও আমি দীর্ঘদেহী সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। সার্ভানো আমাকে পছন্দ করল। জলদস্যুদের জাহাজে আশ্রয় নিলাম।

শুরু হল এক নতুন জীবন। যাত্রীবাহী জাহাজ লুঠ করা, যাত্রীদের বন্দী করে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রী করা—লড়াই নরহত্যা—এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু বড়লোক হতে পারলাম না। লুণ্ঠিত সবকিছুই ক্যাপ্টেন সার্ভানো নিজের কাছে নিয়ে নিত। বদলে আমাদের সামান্য কিছু দিত। অথচ

লড়াই করছি আমরাই লুঠ করছি আমরাই আহত হয়েছি রক্ত হয়েছি আমরাই—সেই আমরাই বঞ্চিত হয়েছি।

তখন জলদস্যুদের পাকড়াও করতে বিভিন্ন দেশ থেকে নৌবাহিনী পাঠানো শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি জলদস্যুদের জাহাজ ধরা পড়েছে। সেই সব দেশে জলদস্যুদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ফাঁসিও দেওয়া হয়েছে।

হতাশ আমি পালবার উপায় ভাবতে লাগলাম। ক্যাপ্টেনের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে পালানো সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি যদিও জানতাম ধরা পড়লে মৃত্যু।

সেসময় আমাদের জাহাজ একটা ছোট বন্দরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। রাতও ছিল অন্ধকার রাত। গভীর রাতে ডেক থেকে উঠে গড়াতে গড়াতে হালের কাছে এলাম। দড়িদড়া ধরে জলে কোন শব্দ না তুলে জলে ডুব দিলাম। ভেসে উঠে দেখলাম জাহাজ বেশ দূরে চলে গেছে। অন্ধকার সমুদ্রে আস্তে আস্তে জলে কোন শব্দ না তুলে তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। তীরের বন্দরে যখন পৌঁছলাম তখন ভোর হয় হয়। কোমরে আমার পুরোনো পোশাক বেঁধে এনেছিলাম। জল দস্যুর মার্কামারা পোশাক ছেড়ে সেই ভেজা পোশাক পরলাম।

বন্দরের দোকানপাট খুলছে তখন। একটা ছোট সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম।

তারপর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জীবন। এ জাহাজ সে জাহাজ কাজ নিয়ে এদেশে সেদেশে ঘুরে বেড়ালাম। কিছু স্বর্নমুদ্রাও জমালাম।

অবশেষে এক জাহাজে চড়ে এলাম এই লাগাসে। আশ্রয় নিলাম এক সরাইখানায়। ভেবেছিলাম কয়েকদিন থাকব। মাটির ওপরতো বিশেষ থাকতে পারিনি। শুধু জলে জলেই দিন কেটেছে। কাজেই মাটির ওপর ভীষন টান আমার। কিন্তু এদেশ ছেড়ে যাওয়া হল না। একদিন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা শুনলাম।

সেদিন রাজা এনিমারের রাজসভায় গেছি। রাজবাড়ি রাজসভা রাজাকে দেখতে। দেখলাম একটা শুনানি চলছে রাজসভায়। অপরাধী এক পোর্তুগীজ যুবকের বিচার চলছে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী?

—কাবানা। যুবকটি বলল।

—তুমি কোন দেশের মানুষ? রাজা জানতে চাইলেন।

—পোর্তুগাল। কাবানা বলল।

—এই দেশে এসেছো কেন? রাজা জিজ্ঞেস করল।

—মাননীয় রাজা জাহাজে আসার সময় এক বৃদ্ধ নাবিকের কাছে শুনেছিলাম এই লাগাসে অতীতের এক রাজার মহামূল্যবান গুপ্ত রত্নভান্ডার আছে। যুবকটি বলল।

—হ্যাঁ—রাজা সিয়োভোর গুপ্ত রত্ন ভান্ডার। কিন্তু সেসবের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? রাজা বললেন।

—আমি সেই রত্নভান্ডার উদ্ধার করার জন্যে চেষ্টা করছি। যুবক কাবানা বলল।

—বৃথা চেষ্টা। অতীতে সিয়াভোর পরে দু তিনজন রাজা সেই রত্নভান্ডার উদ্ধার করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কোন হদিশ পান নি। তুমি এখানে কয়েকদিনের মধ্যেই তা উদ্ধার করবে ভেবেছো?

—আমি চেষ্টা করব। আপনি অনুমতি দিন। কাবানা বলল।

—তোমার এই অপরাধের জন্যেই তোমাকে বন্দী করা হয়েছে। তুমি আমার অনুমতি না নিয়েই গোপনে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলে। কেন? রাজা বললেন।

—গোপন রত্নভন্ডার খুঁজতে। কাবানা বলল।

—অথচ আমার কোন অনুমতি নাওনি। রাজা বললেন।

—মাননীয় রাজা—আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। গুপ্ত রত্নভান্ডার উদ্ধারের জন্যে আমাকে অনুমতি দিন। কাবানা বলল।

—বেশ। তুমি এখানে বিদেশী। তবু তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু তোমার পরিশ্রম বৃথাই যাবে। রাজা এনিমার বললেন।

—তবু আমি চেষ্টা করব। কাবানা বলল।

—করো চেষ্টা। কিন্তু অন্তঃপুরে আবার যেতে হলে দু'জন প্রহরী তোমার সঙ্গে থাকবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আপনার আদেশ শিরোধার্য। কাবানা বলল।

—কোথায় উঠেছো তুমি? রাজা এনিমার জানতে চাইলেন।

—এক সরাইখানায়। কাবানা বলল।

—না। সরাইখানায় থাকা চলবে না। আমার অতিথিশালায় আমার প্রহরীদের নজরের মধ্যে থাকবে। রাজা বললেন।

—কিন্তু আমাকে তো সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে হবে। কাবানা বলল।

—বেশ তো। ঘুরে বেড়াবার সময় একজন প্রহরী তোমার সঙ্গেই থাকবে।

যদি গুপ্ত রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারো তবে আর ঐ রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালাতে পারবে না। রাজা এনিমার বললেন।

—ঠিক আছে। যেমন আপনার আদেশ। কাবানা বলল।

—যাও। একজন প্রহরী তোমাকে অতিথিশালায় নিয়ে যাবে। তোমাকে পাহারা দেবে। রাজা এনিমার বললেন।

একজন প্রহরীর সঙ্গে কাবানা বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। মনের বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা মাথা চড়া দিল। আমিও চেষ্টা করে উদ্ধার করতে পারে কি না। সেটা করতে গেলে সমস্ত ঘটনাটা জানতে হবে। তার চেয়ে সহজ পথ কাবানাকে অনুসরন করা। ও কীভাবে খোঁজে সেটা আবিষ্কার করা। যদি ও সত্যিই সেই রত্নভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পারে তখন ও কে আর যদি ওর সঙ্গে প্রহরী থাকে তাহলে দু'জনকেই মেরে রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালাতে পারবো। একটা ছোরা সবসময়ই আমার কোমরে গোঁজা থাকে। আর ছোরা চালাতে আমি ওস্তাদ। তরোয়ালের দরকার নেই।

দুপুরে সরাইখানার খাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়লাম রাজার অতিথিশালায় খোঁজে। রাজবাড়ির দেউড়ির সামনে পাহারারত এক প্রহরীকে জিজ্ঞেস করতে সে আঙ্গুল তুলে রাজবাড়ির পেছনে বাঁদিকে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

আমি ঘরটার সামনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম একজন প্রহরী দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। প্রহরীটি আছে। তার মানে কাবানা এখন রত্নভাণ্ডার খুঁজতে বেরোয়নি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক সামনেই একটা বিরাট চেস্টনাট গাছ। আমি গাছের তলায় দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম—কখন কাবানা বেরোয়।

কিছুক্ষণ পরে কাবানা বেরিয়ে এল। আমি বেশ দূরত্ব রেখে কাবানা আর প্রহরীর পেছনে পেছনে চললাম।

বড় রাস্তা দিয়ে ওরা চলল পশ্চিমের পাহাড় জঙ্গলের দিকে। আমিও ওদের পেছনে চললাম। লক্ষ্য করলাম কাবানা একটা নেভানো মশাল নিয়ে যাচ্ছে। কারণ বুঝলাম না। তারপর রাস্তাটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণমুখো। ঐদিকে কাবানা গেল না। ও পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে ঢুকল। আমিও একটু দূরত্ব রেখে ওদের পেছনে পেছনে চললাম। এখানে নগরের ভিড় নেই যে লোকের আড়াল নেব। তাই সাবধানে চললাম।

ঘন বন। অন্ধকার। গাছ লতাপাতার আড়ালে আড়ালে চললাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল ওরা। তারপর একটা আধভাঙা ঘরের কাছে এল। বুঝলাম

না এখানে ঘর তৈরী হয়েছিল কীসের জন্যে? কাবানা ঘরের মধ্যে ঢুকল। প্রহরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাছের আড়ালে লুকোলাম।

কিছুক্ষণ পরে কাবানা বেরিয়ে এল। চলল পশ্চিমমুখে।

প্রায় অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সামনেই পাহাড়ের পাদদেশ। কাবানা পাহাড়ে উঠতে লাগল। পেছনে প্রহরী। আমিও পাথরের আড়ালে আড়ালে উঠতে লাগলাম। কিছুক্ষণে মধ্যেই দেখলাম একটা বড় গুহামুখ। এবার বুঝলাম কেন কাবানা একটা মশাল নিয়ে এসেছে। ও কোমর থেকে চক্‌মকি পাথর বার করল। পাথরে লোহার টুকরো ঠুকে মশাল জ্বালাল। তারপর জলন্ত মশাল হাতে গুহায় ঢুকল।

আমিও ওদের পেছনে পেছনে ঢুকলাম। মশালের আলো লক্ষ্য করে আমিও চললাম। মশাল হাতে কাবানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গুহার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথুরে গা দেখতে দেখতে চলল। ওদের এগোতে সময় লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর একটু দূর থেকে মশালের আলোয় দেখলাম গুহা শেষ। কাবানা সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ফিরে আসতে লাগল। বুঝলাম এর আগে ও এখানে এসেছিল।

আমিও ফিরে দাঁড়িয়ে দ্রুত গুহার মুখের দিকে চললাম। আমার পায়ের শব্দ হল। কাবানা চেঁচিয়ে বলল—কে? গুহায় জোর শব্দ হল। আমি ততক্ষণে গুহার বাইরে চলে এসেছি। ছুটে গিয়ে একটা পাথরের চাঁইয়ের পেছনে গিয়ে লুকোলাম।

কিছুক্ষণ পরেই ওরা দু'জনেই বেরিয়ে এল। আড়াল থেকে কাবানার মুখ দেখেই বুঝলাম ও গুপ্তধনের খোঁজ পায়নি।

দু'জন বনের মধ্যে ঢুকল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি ওদের পেছনে পেছনে আর গেলাম না। এখন আর ওদের অনুসরন করার কোন অর্থ নেই। কাবানার সব দেখা হয়ে গেছে। ও আর এখন অন্য কোথাও যাবে না। আমি এখানেই একটা ভুল করলাম। আমি অন্য পাশ দিয়ে বনের বাইরে রাস্তার কাছে এলাম। বনের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলাম ওরা কখন বেরিয়ে আসে। কিন্তু অপেক্ষাই করতে লাগলাম। ওরা আর বেরিয়ে আসে না। তাহলে ওরা কি অন্য কোথাও গেল? কোথায় গেল?

আমি আবার বনের মধ্যে ঢুকলাম। ওদের খুঁজতে লাগলাম। দক্ষিণমুখো চললাম। বেশ কিছুটা যেতে হঠাৎ দেখি সামনে একটা হ্রদ। কাবানা আর প্রহরীটি জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি দ্রুত জলের ধারে জংলা

গাছের জঙ্গলের আড়ালে বসে পড়লাম। হ্রদের ধারে ধারে কাবানা একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে গেল। ঘুরে ঘুরে চারপাশ ভালো করে দেখল। তারপর দু'জনেই ফিরে এল। বুঝলাম ও কিছু হদিশ করতে পারেনি। এবার আর আমি ভুল করলাম না। বনের মধ্যে দিয়ে ওদের পেছনে পেছনে আসতে লাগলাম। এখানে একটা হ্রদ আছে তা আমি জানতাম না। কাজেই আবার ওদের হারাই তাই ওদের দিকে লক্ষ্য রেখে বনের মধ্যে দিয়ে আসতে লাগলাম। কী জানি-কাবানা যদি অন্য কোথাও যায়?

বন শেষ। ওরা রাস্তায় উঠল। এবার আমি ওদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিলাম। অল্প লোকই রাস্তায় যাতায়াত করছে। কাজেই ওদের ওপর নজর রাখার সুবিধে হল।

নগরীর ভিড় শুরু হল। কাবানা আর অন্য কোথাও গেল না। সোজা অতিথিশালায় ঢুকল। আমি চেস্টনাট গাছটার নিচে কিছুক্ষণ গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর কাবানা আর বেরোলো না দেখে সরাইখানায় ফিরে এলাম।

সেদিন রাতে খাবার আগেই আমি মহাবিপদে পড়লাম। বিপদে ফেলল আমার ডান গালের আঁচিল। আমি জানতাম না জলদস্যু ক্যাপ্টেন সার্ভানো এই বন্দরেই জাহাজ ভিড়িয়েছে। জানতাম জলদস্যু এসব সময়ে জাহাজের মাথায় সাদা মরার হাড় আর মাথা আঁকা কালো পতকা নামিয়ে সাদা পতকা উড়িয়ে দেয়। কেউ ওদের জলদস্যু বলে চিনতে পারে না।

আমি যে জাহাজে চড়ে এসেছিলাম সেই জাহাজটা তখনও বোধহয় নোঙর করা ছিল। সেই জাহাজের কারে-কাছ থেকে আঁচিলওয়ালা আমার খোঁজ পেয়েছিল ক্যাপ্টেন সার্ভানো।

আমাকে ঠিক খুঁজে খুঁজে আমার সরাইখানায় এসে হাজির। সঙ্গে একজন সাধারন পোশাকের জলদস্যু। ক্যাপ্টেনের পোশাক ক্যাপ্টেনের মতই। ক্যাপ্টেন সার্ভানো তরোয়াল কোষমুক্ত করে আমার গলায় তরোয়ালের ডগাটা ঠেকিয়ে বলল—পালিয়েছিলে। এর শাস্তি তো জানো। জাহাজে চলো। বুঝলাম—রেহাই নেই। সরাইখানার লোকজন তার মারমূর্তি দেখে এগোতে সাহস করল না। আমি তখন অসহায়। বুঝলাম ক্যাপ্টনকে ঠেকাতে হলে গুপ্তধনের লোভ দেখাতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। আমি তখন বললাম—একটা গুপ্তধনের উদ্ধারের কাজে লেগেছি। এখন জাহাজে চলে গেলে গুপ্তধনের আশা ছাড়তে হবে।

—গুপ্তধন? সার্ভানো বেশ চমকে উঠল। বলল—কোথায় সেই গুপ্তধন?

—সেটার খোঁজেই তো আমি এখানে আছি। সার্ভানো তরোয়াল কোষবদ্ধ করে আমার পাশে এসে বলল—সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

আমি তখন অতীতের রাজা সিয়াভোর গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের কথা কাবানাকে অনুসরনের কথা সব বললাম। ক্যাপ্টেন সার্ভানো খুশির ভঙ্গিতে উরুতে এক চাপড় দিয়ে বলল— এইতো একটা খবরের মতো খবর দিলে। চলো—আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো। গুপ্তধন উদ্ধার হলে দু'জনে ভাগাভাগি করে নিয়ে পালাবো।

—এক্ষেত্রে কাবানাকে অনুসরন করতে হবে। কিন্তু সেটা করতে গেলে আপনাকে এই মার্কামারা ক্যাপ্টেনের পোশাক ছাড়তে হবে।

—ঠিক আছে। সঙ্গের জলদস্যুকে বলল— যাও আমার সাধারন পোশাক নিয়ে অ্যায়া আর সবাইকে বলবি জাহাজ এই বন্দরে থাকবে। আমি ফিরে গিয়ে জাহাজ ছাড়বো। সঙ্গী জলদস্যু চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সঙ্গী সার্ভানোর জন্যে সাধারন পোশাক নিয়ে এল। ওকে সার্ভানো চলে যেতে বলল—এখন তোমার সঙ্গে এখানেই থাকবো। রত্নভান্ডার নিয়ে জাহাজে ফিরবো।

পরের দিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। সার্ভানোকে নিয়ে প্রায় ছুটে অতিথিশালার সামনে এলাম। চেস্টনাট গাছের নীচে দাঁড়ালাম দু'জনে।

দাঁড়িয়ে আছি। কাবানার বেরোবার নাম নেই। চিন্তায় পড়লাম। তবে কি ও আগেই বেরিয়েছে। না—ঐতো কাবানা বেরিয়ে এল। পেছনে সেই প্রহরী।

এবার দু'জনে চলল পূবমুখো সমুদ্রের দিকে। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম ওরা বোধহয় বন্দরে যাবে। দেখলাম ওরা বন্দরে এল না মরুভূমি মত বালিভর্তি এলাকায় এল। এখানে শুধু কাঁটাগাছ আর ফণিমনসার ঝোপ। মরুভূমির মত শুধু বালি। সেই সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আমরা সহজেই কাবানার নজরে পড়তে পারি। তাই আমরা কখনও এই কাঁটা ঝোপ ঐ ফনীমনসার ঝোপের পিছনে আত্মগোপন করে করে চললাম।

কিছুদূর যেতেই দেখা গেল একটা পাথরের থামমত কী একটা বালির ওপর বেরিয়ে আছে। কাবানা ওখানে গিয়ে থামল। খুব মনোযোগ দিয়ে পাথরের থামটা চারপাশের বালির এলাকাটা দেখতে লাগল। ও হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেই আমাদের দেখতে পেত। তার আগেই আমি ক্যাপ্টেন সার্ভানোকে হাত টেনে ধরে একটা মনসাঝোপের আড়ালে উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই কাবানা প্রহরীকে কি বলতে বলতে পিছু ফিরে তাকাল। মনসাগাছের আড়ালে আমাদের দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ পাথরের থামটার কাছে দাঁড়াল কাবানা। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে বালিভরা জায়গা দেখে পিছু ফিরল। ফিরে আসতে লাগল। ফনীমনসার গাছের আড়াল থেকে দেখলাম কাবানা কিছু গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে আসছে। ওকে কিছু আশান্বিত মনে হল।

ওরা যত এগিয়ে যেতে লাগল। আমরাও মনসা গাছের আড়ালে তত সরে সরে যেতে লাগলাম। ওরা আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। বালি এলাকা ছেড়ে বড় রাস্তার পাশয় গিয়ে ওরা পৌঁছালেই আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় লোকজনের ভিড়। ওরা তারমধ্যে দিয়ে চলল। আমরাও অনুসরন করতে লাগলাম।

কাবানা আর কোথাও গেল না। অথিতিশালায় ঢুকে পড়ল। প্রহরীটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও ফিরে আসব ভাবছি হঠাৎ কাবানা বেরিয়ে এল। খুব কাছে না থাকলেও শুনতে পেলাম কাবানা প্রহরীটিকে বলল—কালকে কখন রাজসভা বসবে?

—দুপুরে। কাল শনিবার । রাজা বনে দেবপূজা করতে যাবেন। প্রহরী বলল।

—কখন। কাবানা জানতে চাইল।

—সকলে। প্রহরী বলল।

কাবানা আর কিছু বলল না। অতিথিশালায় ঢুকে পড়ল।

আমরা সরাইখানায় ফিরে এলাম। সার্ভানোকে বললাম মনে হচ্ছে কাবানা রাজার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা বলবে। আমরাও রাজ সভায় যাবো। যেন নতুন এসেছি সব দেখে বেড়াচ্ছি।

সেভাবেই দুপুরে খাবার খেয়েই দুজনে রাজসভায় এলাম। তখন একটা বিচার চলছিল। আড়চোখে দেখলাম কাবানা প্রজাদের সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন কাবানার ডাক পড়ে।

একটা বিচার শেষ হল। মন্ত্রী তার আসন থেকে উঠে রাজাকে গিয়ে কিছু বললেন। রাজা এনিমার কাবানাকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করলেন। কাবানা এগিয়ে এসে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মাহামান্য রাজা শুনেছি সমুদ্রের তীরের কাছে নাকি প্রাচীন রাজধানী ছিল।

—ঠিক শুনেছো। প্রাচীন রাজধানী ওখানেই ছিল। পরে বালি পড়ে পড়ে ঐ রাজধানি বালির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। রাজা বললেন।

—তাহলে তো রাজপ্রাসাদও ওখানে ছিল। কাবানা বলল।

—হ্যাঁ। তবে এখন তো সেই প্রাসাদ বালির নীচে। রাজা বললেন।

—আমি বালি তুলে ফেলে ঐ রাজবাড়ি উদ্ধার করতে চাই। কাবানা বলল।

—কী লাভ তাতে? তাছাড়া ওখানে তো প্রাসাদের কোন চিহ্নই নেই। রাজা বললেন।

—না। আছে। আমি একটা পাথরের থাম দেখেছি। ওখানে বালি খোঁড়ার অনুমতি আমাকে দিন। কাবানা বলল।

—বেশ খুঁড়ে দেখো। রাজা বলল।

—তার জন্যে তিরিশ জন লোক দিন। তাদের দিয়ে বালি খোঁড়ার কাজ করাবো। তিরিশটা বেলচাও লাগবে। কাবানা বলল।

রাজা সেনাপতির দিকে তাকালেন বললেন—ওকে বালি খোঁড়ার কাজের জন্যে লোক দিন। সেনাপতি উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে আসন থেকে নেমে এল। কাবানার কাছে গিয়ে বলল—চলো—লোক বেলচা দিচ্ছি। তবে সবটাই পন্ডশ্রম হবে।

—তবু আমি একবার খুঁড়ে দেখতে চাই। কাবানা বলল।

—বেশ। কাবানা সেনাপতির পেছনে পেছনে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরাও ওদের দু'জনকে অনুসর করলাম। সেনাপতি যোদ্ধাদের আবাসে গেল। আমরা সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিরিশ জন যোদ্ধা বেলচা হাতে মাঠে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি তাদের কাজের কথা বুঝিয়ে দিল। কাবানা যোদ্ধাদের নিয়ে সমুদ্রেরতীরের দিকে চলল। আমরাও অনুসরণ করতে লাগলাম। যেতে যেতে আমি সার্ভানোকে বললাম—বোঝাই যাচ্ছে বালি খোঁড়ার কাজ বেশ কিছুদিন ধরে চলবে। আত্মগোপনের জন্যে একটা ভাল জায়গা দেখে নিতে হবে। আমরা যেন কোনভাবেই কাবানার নজরে না পড়ি।

যোদ্ধাদের নিয়ে কাবানা সেই পাথরের থামের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কীভাবে কোথা থেকে বালি খুঁড়তে হবে সেটা বোঝাল।

আমি আর সার্ভানো সেই ফনীমনসার আর কাঁটাঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লাম। দৃষ্টি কাবানার দিকে। ওখানে থেকে কাবানার কিছু কথাবর্তাও শুনতে পাচ্ছিলাম।

যোদ্ধারা বালি তোলার কাজে লাগল। বেলচা দিয়ে বালি তোলা আর একপাশে সমুদ্রের দিকে বালি ফেলা। বালির স্তূপ হতে লাগল।

কাজ চলল। বুঝলাম এত বালি তুলতে সময় লাগবে। তবে যোদ্ধারা কর্মঠ এবং সংখ্যায়ও বেশি। বেশিদিন লাগার কথা নয়।

দুপুর হল। এখন খাওয়ার সময়। কাবানার নির্দেশে যোদ্ধারা নগরের দিকে ফিরে আসতে লাগল। আমরা শুয়ে থেকে বালির এদিক ওদিক সরে সরে অতগুলো লোকের নজর এড়ালাম।

ওরা নগরের কাছাকাছি চলে গেছে তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু'জনে খোঁড়ার জায়গায় গেলাম। দেখলাম পাথরের স্তম্ভের বেশ নিচে পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। গর্তের নিচে পাথরের বালিচাপা সিঁড়ির মত দেখা যাচ্ছে। তাহলে কাবানার অনুমান ঠিক। এখানে রাজপ্রাসাদ ছিল।

যোদ্ধারা বেলচাগুলি জড়ো করে রেখে গিয়েছিল। আমি নিজে একটা বেলচা নিলাম আর একটা সার্ভানোকে দিলাম। সার্ভানোকে নিয়ে সেই ফনীমনসার আর কাঁটার ঝোপের পেছনে এলাম বেলচা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগলাম। দু'জনেই হাত লাগালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় গর্তমত হল। নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে আত্মগোপন করে সবদিক নজর রাখা যাবে। বেলচাগুলো যেখানে ছিল সেখানেই বেলচা দুটো রাখলাম।

সরাইখানায় ফিরে এলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার চললাম সমুদ্রতীরে ঐ জায়গটার দিকে।

ওখানে পৌঁছে সেই গর্তে আত্মগোপন করে নজর রাখতে লাগলাম। কাবানা ফিরে এল। বালি খোঁড়ার কাজ চলল।

এইভাবে দিন সাতেক কেটে গেল। ওখানে যাওয়া লুকিয়ে নজর রাখা যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল।

দুপুরে ওরা চলে গেলে আর বিকেলে চলে গেলে আমরা কতটা খোঁড়া হয়েছে তা দেখতে যাই।

একদিন বিকেলে গিয়ে দেখলাম অনেক খোঁড়া হয়েছে। খননকাজের পাশেই বালির স্তূপ জমে উঠেছে। আমরা নিচে নামলাম। থাক করা বালির সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। তারপরই পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। একটা বিরাট ছাদহীন ঘর। ঘরের দুপাশে দুটো কাঠের সিন্দুকমত। আমি ছুটে গিয়ে একটা সিন্দুক খুললাম। ভেতরে মরচে পড়া তরোয়াল আর ঢাল। অন্যটা খুললাম—জাহাজের পাল ভাঁজ করে রাখা। তাহলে কাবানা এখনও গুপ্ত রত্নভান্ডারের সন্ধান পায়নি। ঘরটার উত্তর দিকে একটা ভাঙা দরজা। তারপরই একটা ছোট পাথরের দেওয়াল। দেখে ভাবলাম নিশ্চয়ই ঐ দেওয়ালের পেছনে কিছু আছে। নিশ্চয়ই ওখানেই রত্নভান্ডার আছে। তখন উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। কিন্তু আমার ধারনার কথা সার্ভানোকে বললাম না। চুপ করে সব দেখে টেখে ওপরে চলে এলাম।

সরাইখানায় ফিরে এলাম।

আমার কেমন মনে হল কাবানা ওই দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা করবে। দেখতে চাইবে দেওয়ালের ওপাশে কী আছে। কিন্তু সেটা ও প্রহরীকে এড়িয়ে যোদ্ধাদের এড়িয়ে একা করবে। সুতরাং দিনে নয় রাতে।

সেদিন রাতে খাবার পর আমি শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোলাম না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। উদ্দেশ্য—সার্ভানোকে না জানিয়ে অতিথিশালায় যাওয়া। রাতে কাবানা বেরিয়ে এসে সমুদ্রতীরে সেই জায়গায় যায় কিনা সেটা দেখা ও পিছু নেওয়া।

হঠাৎ অন্ধকারে সার্ভানোর গলা শুনলাম—

—ঘুমোচ্ছো না কেন? বুঝলাম ধরা পড়ে গেছি। বুঝলাম সার্ভানোও আমার ওপর নজর রাখছে। তখন বাধ্য হয়ে বললাম—সেই বড়ঘরের উত্তরদিকে একটা পাথরের দেওয়াল দেখেছেন তো?

—হুঁ। সার্ভানো মুখে শব্দ করল।

—ঐ দেওয়ালের ওপাশেই আছে গুপ্ত রত্নভান্ডার। আমি বললাম। বেশ চমকে সার্ভানো উঠে বসল। বলল—তাহলে চলো ঐ দেওয়াল ভাঙবো।

—আমরা না। কাবানাই আজ রাতে ঐ দেওয়াল ভাঙতে যাবে। আমি বললাম।

—কী করে বুঝলে। সার্ভানো জানতে চাইল।

—আড়াল থেকে ওর চোখে মুখে বেশ উত্তেজনা লক্ষ্য করছি। রাতেই যাবে। একা কাজ সারতে যাবে। আমি বললাম।

—তাহলে অতিথিশালার সামনে ঐ বড় গাছটার নীচে—সার্ভানো বলতে গেল। বাধা দিয়ে বললাম—না। সমুদ্রতীরের দিকেই যাবো। কাবানাকে তো ওখানেই যেতে হবে। সেইজন্যেই ঘুমোয়নি। আমি বললাম।

—ওঠো তাহলে। সার্ভানো বলল।

—হুঁ। চলুন। এখন রাস্তাঘাট নির্জন। আমরা অনুসরন করতে গেলে আমরা ধরা পড়ে যাবো। তাহলে কাবানা সাবধান হয়ে যাবে। সমস্ত পরিশ্রম মাটি হবে। আমি বললাম।

আমরা সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার রাত। নির্জন বড় রাস্তা দিয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে। খননকাজের জায়গায় পৌঁছালাম। তখন বেশ রাত। সেই ফনীমনসার গাছের আড়ালে শুয়ে পড়লাম।

অপেক্ষা করছি কখন কাবানা আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে

দেখলাম কাবানা আসছে। একা। প্রহরীর নজর এড়িয়ে এসেছে। ও দ্রুত সেই খননের জায়গায় এল। ওর চলা দেখে বুঝলাম ও বেশ উত্তেজিত। তখনই চাঁদের আলোয় দেখলাম ও একহাতে একটা কুড়ুল অন্যহাতে একটা মশাল নিয়ে আসছে। যা ভেবেছিলাম তাই। ও ছোট দেওয়ালটা ভাঙতে আসছে।

ও খননের জায়গায় এল। ও একবার চারিদিক ভালো করে তাকাচ্ছে তখনই আমরা আড়াল নিলাম।

ও বালির ধাপ বেয়ে নীচে নেমে গেল। দূর থেকে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনলাম। কাবানা মশাল জ্বালাচ্ছে। ও তৈরী হয়ে এসেছে।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপরই দেওয়ালে কুড়ুলে ঘা মারার শব্দ শুনলাম। চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ।

হঠাৎ কাবানার চিৎকার শুনলাম—পেয়েছি। আমরা ভীষন ভাবে চমকে উঠলাম। সার্ভানো মুহুর্তে উঠে দাঁড়াল। ও ছুটল। আমি তার পিছু নিলাম।

বালির সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দু'জনেই নিচে নেমে পড়লাম। মশালটা বালির দেওয়ালে গোঁতা। মশালের আলোয় সার্ভানোর মুখ দেখেই বুঝলাম তাঁর মাথায় খুন চেপেছে। সে কাবানাকে মেরে ফেলবে। হলও তাই। সাভার্নো কাবানার ওপর শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাবানার হাত থেকে কুঁড়ুল ছিটকে গেল। কাবানা পাথরের বালিভরা মেঝেয় ছিটকে পড়ল। মূহুর্তের মধ্যে সার্ভানো কুড়ুলটা তুলে নিল। তারপর দুহাতে কুড়ুলটা ধরে কাবানা বুকে বসিয়ে দিল। নরহত্যার দৃশ্য তো অনেক দেখেছি। আমি বিচলিত হলাম না। সার্ভানো আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি এক ঝলক শুধু দেখছিলাম দেওয়ালে কয়েকটা পাথরের খন্ড নিচে পড়ে আছে। একটা ফোকরের সৃষ্টি হয়েছে। দেওয়ালটা পুরো ভেঙে পড়েনি। কিন্তু তখন আর কিছু দেখার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। বুঝলাম এবার আমার পালা। সার্ভানো আমাকে হত্যা করবে।

আমি একমূহুর্ত আর দাঁড়ালাম না। পেছনে ফিরে বালির সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে এলাম। ছুটলাম নগরের দিকে।

একটা নতুন সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম। সেখানে বসেই রাত জেগে লিখছি। সার্ভানো নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। আমার জীবন বিপন্ন। গুপ্ত ধনভান্ডারের লোভ—

বড়লোক হবার স্বপ্ন শেষ—রাজা সিয়েভোর রত্নভান্ডারের খবর আমরা দু'জন মাত্র জানি—আমি আর ক্যাপ্টেন সার্ভানো। কাজেই নৃশংস ক্যাপ্টেন সার্ভানো আমায় বেঁচে থাকতে দেবে না।

রাত শেষ হয়ে আসছে। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনছি। সরাইয়ের মালিক দরজা খুলে দিল। আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত—

বইয়ের লেখা এখানেই শেষ। তারপর বাকি সব পাতা সাদা। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল—ক্যাপ্টেন সার্ভানো ঐ গুপ্ত রত্নভান্ডার অবিষ্কার করতে পারে নি। পারলে প্রোমিও হয়ত পারত। তার আগেই ওর মৃত্যু হয়। মৃত্যু মানে ক্যাপ্টেন সার্ভানো ওকে হত্যা করে। তারপর খুঁড়ে বের করা সেই প্রাচীন প্রাসাদের সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু ওর বুদ্ধিতে কুলায় নি। হাল ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল নিজের জাহাজে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—প্রোমিও আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। তবে আমি প্রথমেই খুঁড়ে তোলা প্রাসাদ দেখতে যাব না। পশ্চিমের বন মন্দিরঘর গুহা সরোবর সব দেখবো। তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। তারপর খুঁড়ে-তোলা প্রাসাদে যাবো। যা হোক কাল সকালে রাজসভায় গিয়ে রাজার সঙ্গে কথা বলতে হবে। দেখি রাজার কাছ থেকে কোন সূত্র পাই কিনা। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস প্রোমিওর লেখাটা আমার বড় ভালো লাগল। ও বড় দরদ দিয়ে লিখেছে। ওর লেখা থেকে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে আমি প্রথমে আমার মত করে খুঁজবো।

—তাহ'লে চলো। কালকে রাজার কাছে যাওয়া যাক। আতলেতার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আতলেতো তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। সব জায়গাতো তোমার ভাল চেনা। তোমার সাহায্য খুব কাজে লাগবে।

—বেশ। আমি তোমাদের সঙ্গী হব। আতলেতো বলল।

—পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস ও হ্যারি রাজসভায় এল। তখন একটা বিচার চলছিল। আতলেতো এপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ও এখনো সেনাপতির পদ পায় নি। এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের বলল—রাজা তোমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে বিচার পর্ব দেখতে লাগল। বিচার পর্ব শেষ। প্রজারা চলে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজসভা জনশূন্য হয়ে গেল।

রাজা এনিমার ইশারায় ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস রাজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথা একটু নুইয়ে নিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা স্থির করেছি অতীতের রাজা সিয়োভোর গুপ্ত রত্নভান্ডার আমরা উদ্ধার করবো।

—বেশ তো। চেষ্টা করে দেখ। আচ্ছা তোমরা প্রোমিওর বইটা পড়েছো তো? রাজা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। বইটা পড়ে কিছু দরকারি তথ্য পেয়েছি। তবে নতুন করে অনুসন্ধান চালাবো। এখন অনুরোধ আপনি যদি ঐ গুপ্ত ধনভান্ডার সম্পর্কে যা জানেন বলেন তাহলে আমরা উপকৃত হব।

—আমি যা জানি তা প্রোমিওকে বলেছিলাম। নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে শুনেছি ঐ গুপ্তধন শুধু চুন্নিপান্না মুক্তো হীরের টুকরোর। সোনা রুপো নেই। ওটা শুধু মনিরত্নের ভান্ডার। রাজা বললেন।

—আচ্ছা—ঐ রত্নভান্ডার গোপনে কোথায় রাখা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কী করে বলি। আমার পূর্বপুরুষরা খুঁজছে আমিও খুঁজেছি। কিন্তু কোন হদিশ পায়নি। রাজা বললেন—ঐ প্রোমিও কম খোঁজেনি। মরে না গেলে হয়তো ও খোঁজ পেত। ফ্রান্সিস তারপর বলল—

—এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে আপনার সাহায্য চাই।

—বলো কী রকম সাহায্যে চাও। রাজা জানতে চাইলেন।

—প্রোমিও প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অর্ধেকটা বালি খুঁড়ে উদ্ধার করেছে। আমি বাকি অর্দ্ধেকটা উদ্ধার করতে চাই। তাঁর জন্যে বেলচা পঁচিশ তিরিশ জন যোদ্ধা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা আতলেতাকে বল সে সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। মাথা কাত করল ফ্রান্সিস। তারপর বলল—

—আমরা আপনার অন্তঃপুরে খুঁজবো।

—বেশ তো। তবে দু'তিন দিন পরে এসো। রানি অসুস্থ। রাজা বললেন।

—ও। ঠিক আছে। পরেই যাবো। আমাদের সব রকম সাহায্যে করছেন এর জন্যে ধন্যবাদ। আমার আর কিছু বলার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আশা করছি—তোমরা সফল হবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস হ্যারি আতলেতা সভাঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ির বাইরে এসে ফ্রান্সিস বলল—

—আতলেতা। আমি এখনই পশ্চিমের বনটা খুঁজে দেখতে চাই।

—বেশ তো চলো। বনে একটা গুহা আছে। দু'টো মশাল চকমকি পাথর নিয়ে আসছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আতলেতা ফিরে এল। তিনজন সদর রাস্তায় এল। চলল—পাহাড় ও বনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের ভেতরে ঢুকল তিনজনে। কিছুদূর যেতেই সামনে পড়ল আধ-ভাঙা মন্দির—ঘর।

—আচ্ছা আতলেতা। মন্দিরঘরটা তো ভেঙে পড়ার অবস্থা। রাজা এটার সংস্কার করেন না কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এটা রাজা সিয়োভো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।' রাজা এনিমার এটাকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখতে চায়নি। পূর্বপুরুষদের স্মৃতি হিসাবে। আতলেতা বলল।

—স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে আর কি। হ্যারি বলল।

ওরা মন্দির—ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। পাথরের বেদীর কাছে এল। বেদীর ওপর একটা বড় লাইলাক ফুল ঘিরে নানা ফুললতা পাতার রঙীন নক্‌শা। অবশ্য রঙগুলি প্রায় বিবর্ন। তবু এখনও নকশাগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে।

—ফ্রান্সিস —দেখেছো কী সুন্দর নক্‌শা। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। রাজা সিয়োভোর শিল্পবোধের প্রশংসা করতে হয়। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বেদীর পাথরের জোড়াগুলো খুঁটিয়ে দেখল। বেশ শক্ত জোড়। মাথা নিচু করে দেখছিল। এবার মাথা তুলে বলল—চলো। এই বেদীটা পরে ভালো করে দেখতে হবে।

তিনজনে মন্দিরঘরের বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—আতলেতা এখানে একটা গুহা আছে বলেছিলে।

—হ্যাঁ। চলো। দেখাচ্ছি। আতলেতা বলল।

বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল ওরা। আতলেতা চক্‌মকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিস আর আতলেতা মশাল নিল। গুহায় ঢুকল ওরা। ফ্রান্সিস মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। গুহার এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের গা যেমন হয়। গুহার উচ্চতা কোথাও বেশি কোথাও কম। এবড়ো খেবড়ো গুহার দেওয়াল দেখে ফ্রান্সিস বুঝল কোথাও মানুষের হাত পড়েনি। দু'তিনটে খোঁদল পেল। কিন্তু সেগুলোর মুখ পাথর-চাপা নয়। খোলা।

গুহা শেষ। টানা দেয়াল উঠে গেছে। দেয়ালের নিচে একটা পাথরের ছোট চাঁই পড়ে আছে। তার নিচে একটা খোঁদলের মুখ মত। ফ্রান্সিস বসে পড়ল। বলল—হাত লাগাও। পাথরের চাঁইটা সরাতে হবে। আতলেতা আর হ্যারি চাঁইটা ধরল। ফ্রান্সিসও বাঁ হাতে মশাল নিয়ে ডানহাতে ধরল। তিনজন মিলে দু'তিনবার টানতেই পাথরের চাঁইটা সরে গেল। হুড়্ হুড়্ করে বেশ কয়েকটা চামচিকে খোঁদল থেকে বেরিয়ে উড়ে গুহামুখের দিকে উড়ে গেল। ফ্রান্সিস খোঁদলটা দেখল। ফাঁকা। কিছ্ছু নেই।

তিনজনে ফিরে এল। মশাল নিভিয়ে দিল আতলেতা। ফিরে চলল। অতিথিশালায় এল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিসরা বসল। একটু পরেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। আতলেতাও ফ্রান্সিসদের সঙ্গে খেয়ে নিল। আতলেতা বলল—আজকে আর কোথাও যেতে হবে?

—না। কাল সকালে বনে যাবো। দেখি বনের কোথাও কোন হদিশ পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রোমিও যে জায়গাটা খুঁড়িয়েছিল সেখানে কবে যাবে? আতলেতা বলল।

—রাজবাড়ির অন্তঃপুরটা প্রথমে দেখবো। রানি সুস্থ হল কিনা এই খবরটা এনো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তাহলে আমি যাচ্ছি। আতলেতা চলে গেল।

পরের দিন সকালে আতলেতা এল। বিনেলো বলল—এখানে একা একা পড়ে থাকবো না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।

—বেশ। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

চারজন হাঁটতে হাঁটতে বনের কাছে এল। বনে ঢুকল। আজকে আকাশটা মেঘলা। তেমন রোদ ওঠে নি। বনতল বেশ অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ফ্রান্সিস বলল—সরোবরের ধারে নিয়ে চলো। ওদিকে সেদিন আত্মগোপন করেছিলাম। তখন ভালো করে ঐ জায়গাটা দেখা হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে ওরা সরোবরের ধারে এল। আকাশ মেঘলা বলেই সরোবরের জল কেমন যেন কালচে দেখাচ্ছে। এখানে ঘন বন। গাছগাছালির মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। কিন্তু গাছ লতাপাতা বুনো ফুল ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

—ওপারে চলো। ফ্রান্সিস বলল—ওদিকটা প্রোমিও দেখে নি। সরোবরের পাশ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরোবরের ওপারে এল ওরা। এদিকে বন তত ঘন নয়। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে দেখল। সেই গাছগাছালি লতাপাতা বুনো ফুল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফিরে এল সবাই।

ফেরার পথে আতলেতা বলল—ফ্রান্সিস রানিমার সঙ্গে কথা বলেছি। তোমরা অন্তঃপুর খোঁজাখুঁজি করতে আসবে সে কথা বলেছি। রানিমা এখন অনেকটা সুস্থ। তোমাদের অন্তঃপুরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।

—ঠিক আছে। কাল সকালে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা রাজসভাঘরের পাশ দিয়ে অন্তঃপুরের দরজার সামনে এল। প্রহরী দাঁড়িয়ে। ওকে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠানো হল। প্রহরী ফিরে এসে বলল---আপনারা যান।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলে ঢুকল। বেশ ছিমছাম। সাজানো গোছানো চারদিক। ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। পাথরের দেয়ালে রঙীন ফুল লতাপাতা আঁকা। কোথাও কোন পরিত্যক্ত ঘর নেই। ফ্রান্সিস পাথরের মেঝে ভালোভাবে দেখতে লাগল। না। মেঝের নিচে কোন ঘর নেই। আলমারি সিন্দুক সবই ব্যবহৃত হয়। গোপনীয় কিছুই ওসবের মধ্যে থাকতে পারে না। ফ্রান্সিসরা গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কোন হদিশ করতে পারল না। ওরা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসছে তখনই ফ্রান্সিসরা দেখল কোনার দেয়ালে একটা রঙীন লাইলাক ফুল আঁকা। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখল ফুলটার হাল্‌কা নীলে রক্তিমাভ রং। রং মোটামুটি উজ্জ্বল। ও বুঝল অতীতের রাজা সিয়াভো ফুল ভালোবাসতেন। বিশেষ করে লাইলাক ফুল। রাজবাড়ির অন্দরমহল দেখা শেষ। বাকি রইল বালি খুঁড়ে বের করা প্রাচীন রাজপ্রাসাদ।

ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল। শুয়ে পড়তে পড়তে ফ্রান্সিস বলল---আতলেতা কালকে পুরোনো রাজপ্রাসাদ দেখতে যাবো।

---বেশ। আমি সকাল সকাল চলে আসবো। আতলেতা চলে গেল।

হ্যারি বলল---ঐ পুরোনো প্রাসাদ তো সবটা খুঁড়ে বার করা হয়নি।

---কী মনে হচ্ছে তোমার? হ্যারি প্রশ্ন করল।

---দু'টো জায়গাই ভালোভাবে দেখতে হবে। এক---ঐ মন্দিরঘরটা আর পুরোনো রাজপ্রাসাদটা। এই দুটোর মধ্যে কোনটাতে আছে গুপ্ত রত্নভান্ডার। ফ্রান্সিস বলল।

---কোন সূত্র পেলে? হ্যারি জানতে চাইল।

---না। এখনও অন্ধকারে আছি। তবে ওখানে খোঁড়ার কাজ তো চলুক। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

---কালকেই কি খোঁড়ার কাজ শুরু করবে? হ্যারি বলল।

---না। কালকে যতটা খোঁড়া হয়েছে দেখাবো। পরশু থেকে খোঁড়ার কাজে হাত দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন আতলেতা সকাল সকাল এল। চারজন তৈরি হয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

খোঁড়া জায়গাটায় পৌঁছল সবাই। বালিতে কাটা সিঁড়ি দিয়ে চারজনে নিচে

নামল। প্রধান প্রবেশপথের কাঠের দরজাটা ভেঙে পড়ে আছে। দরজার কাঠে নানা ফুল লতাপাতার রুপো গেঁথে নকশা করা। দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। ঢুকেই একটা লম্বা ঘরের শুধু পাথরের মেঝে। কয়েকটা পাথরের ভাঙা থাম এদিক ওদিক পড়ে আছে। দুপাশে দুটো কাঠের সিন্দুকের মতো। প্রোমিত্ত ওর বইতে এই সিন্দুকদুটোর কথা লিখেছে।

ঐ ঘরের পরেই পাথরের দেয়াল। অর্ধেকটা ভাঙা। ফ্রান্সিস বলল—প্রোমিত্ত ওর বইতে এই দেয়ালের কথা লিখেছে। তবে ও দেয়াল ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। পরে জলদস্যু ক্যাপ্টেন সার্ভানো নিশ্চয়ই দেয়ালের অনেকটা ভেঙেছিল। কিছুই পায় নি। চলো ভাঙা দেয়ালের মধ্যে দিয়ে ওপাশে যাবো।

চারজনে পর পর ভাঙা দেয়ালের মধ্যে দিয়ে ওপাশে গেল। ছাদ তো ভেঙে পড়েছে। সূর্যের আলোয় দেখল ঘরটার মাঝখানে একটা মসৃণ পাথরের বেদী। বড় বেদীর ওপরে একটা ছোট চৌকোনো পাথরের বেদী। তার মাথায় লাইলাক ফুলের নকশা। তবে রংগুলো অনুজ্জ্বল। বোধহয় রোদে জলে।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে বেদীটা দেখল। লাইলাক ফুলের নকশাটাও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেশি। রাজা সিয়াভো এত জায়গায় লাইলাক ফুলের নকশা করিয়েছেন কেন? ফ্রান্সিসের মনে এই প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে এল।

ঐ পর্যন্তই বালি খোঁড়া হয়েছে। এরপরে আরও ঘর আছে নিশ্চয়ই। অন্দরমহলটা এখনও বালি খুঁড়ে বের করা যায় নি। ফ্রান্সিস স্থির করল অন্দরমহলটা খুঁড়ে বের করবে। অন্দরমহলের কোথাও গুপ্ত রত্নভাণ্ডার থাকার সম্ভাবনা বেশি।

দুপুরের আগেই ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল। আতলেতোকে বলল—কাল সকালে বেলচাসহ যোদ্ধাদের নিয়ে এসো। খোঁড়ার কাজ শুরু করবো।

—ঠিক আছে। আতলেতো মাথা কাত করে বলল। তারপর বলল—

—গুপ্ত রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের আশা আছে?

—এখনই বলতে পারছি না। সবটা খোঁড়া হোক আগে। ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল—রাজা এলিমারের সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন।

—এখনই চলো। রাজসভাতেই রাজাকে পাবে।

—চলো। হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা অপেক্ষা কর। আমি ঘুরে আসি।

দুজনে রাজসভায় এল। তখন বিচারপর্ব শেষ হয়েছে। লোকজনের ভিড়ও কম। আতলেতো এগিয়ে গিয়ে রাজাকে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে

এগিয়ে আসতে বললেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বলল—মহামান্য—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। রাজা বললেন।

—অতীতের রাজা সিয়াভো যা কিছু নির্মাণ করেছিলেন সেসব জায়গায় লাইলাক ফুলের নকশা করিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। যতদূর শুনেছি উনি লাইলাক ফুল খুব ভালোবাসতেন। তাঁর যেসব পোশাক অন্তঃপুরে সযত্নে রাখা আছে সেসব পোশাকে লাইলাক ফুলের নকশা তোলা আছে। পোশাকের বুকের কাছে। শুনেছি তাঁর আমলের প্রাসাদের বাগানে শুধু লাইলাক ফুলের গাছই লাগিয়েছিলেন। লাইলাক ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন তিনি। রাজা বললেন।

—লাইলাক ফুল সত্যিই সুন্দর। ফ্রান্সিস বলল।

অতিথিশালায় ফিরে আসার পথে আতলেতাকে ফ্রান্সিস বলল—কাল থেকে বালি খোঁড়ার কাজে লাগবো। তুমি যোদ্ধাদের এনো। অন্দরমহলটাকে বের করতে হবে।

—ঠিক আছে। আতলেতা বলল। তারপর চলে গেল।

অতিথিশালায় ঢুকে ফ্রান্সিস দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

—রাজার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বললে? হ্যারি জানতে চাইল। ফ্রান্সিস সব বলল।

পরদিন সকালেই পঁচিশ তিরিশজন যোদ্ধাকে নিয়ে আতলেতা অতিথিশালার সামনে এসে হাজির হল। আতলেতা বলল—প্রোমিত্ত যাদের নিয়ে বালি খোঁড়ার কাজ চালিয়েছিল বেশিরভাগ তাদেরই এনেছি।

—এটা একটা কাজের কাজ করেছো। অভিজ্ঞ লোকের খুব দরকার ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

সকালের খাবার খেয়েই সবাইকে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। খোঁড়ার জায়গায় পৌঁছে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের বলল—খোঁড়ার সময় লক্ষ্য রাখবে যেন খুব বেশি ভাঙচুর না হয়। বেলচার হাতল ঠুকতেই দেয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। যোদ্ধারা ভেতরে ঢুকল। তারপর বালি খুঁড়তে লাগল।

দুপুর পর্যন্ত কাজ চলল। ফ্রান্সিসরা যোদ্ধাদের নিয়ে নগরে ফিরে এল। সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে আবার খোঁড়ার জায়গায় এল। আবার বালি খোঁড়া শুরু হল। চলল বিকেল পর্যন্ত। সন্ধ্যের আগেই সবাই ফিরে এল।

প্রতিদিনই এইভাবে বালি খোঁড়া চলল।

দিন সাতেকের মধ্যে অন্দরমহলের বালি খোঁড়া হয়ে গেল। অন্দরমহলের

আয়তন বেশ বড়। কিছু ভাঙা কাঠের আসবাবপত্র পাওয়া গেল। পাথরের দেয়ালে কোথাও কোথাও দেয়াল আলমারিমত ছিল। সেসব এখন ফাঁকা। কয়েকটা ভেঙেও পড়েছে।

পূবদিকে একটা ছোট ঘর দেখা গেল। সেই ঘরে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। বালি সরানো হয়েছে। ছোট ঘরটার মাঝখানে একটা মোটা কার্পেট পাতা। বালি সরানোতে এখন কার্পেটটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। কার্পেটে হালকা নীল ও রক্তিমাভ রঙের লাইলাক ফুলের নকশা। বেশ বড়।

—আবার লাইলাক ফুল। ফ্রান্সিস বিড় বিড় করে বলল। তারপরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল নিরেট পাথরের দেয়াল। এটা বোধহয় নিরলংকার প্রার্থনা ঘর ছিল।

প্রার্থনা ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস গুপ্তধন রাখার মত সম্ভাব্য কোন জায়গাই তো দেখা যাচ্ছে না।

—দেয়াল ভেঙে যে ঘরটা পেলাম সেই ঘরটায় চলো। ফ্রান্সিস বলল। সেই ঘরটায় ওরা এল। বেদীটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—এই বেদীটা ভাঙতে হবে। আতলেতার দিকে তাকিয়ে বলল—কালকে কয়েকটা কুড়ুল আনতে হবে। যোদ্ধাদের বলে দাও।

—ঠিক আছে। তাহলে বেদীটা ভাঙবে? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। লাইলাক ফুলের রহস্য ভেদ করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিনের মতো ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা আবার খোঁড়ার জায়গায় এলো। দু'তিনজন যোদ্ধা কুড়ুল নিয়ে এসেছিল।

সেই ঘরে এসে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের বলল—

—এই বেদীটা ওপর থেকে ভাঙতে হবে। কুড়ুল চালাও।

বেদীর মাথায় যোদ্ধারা কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌকোনো মাথাটা ভেঙে গেল। দেখা গেল চৌকোনো একটা গর্ত মত। ফ্রান্সিস হাত তুলে যোদ্ধাদের থামাল। চৌকোনো গর্তটার কাছে গিয়ে দেখল ভেতরে একটা কিছু আছে। হাত ঢুকিয়ে দেখল একটা কালো কাঠের বাক্সমত। ও দুহাত দিয়ে বাক্সটা তুলে আনল। হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস। এটাই কি রত্নভাণ্ডার?

—বাক্সটা খুবই ছোটো। খুলে দেখছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বাক্সটা খুলল। আশ্চর্য। ভেতরে একটা শুকনো লাইলাক ফুল। ফুল বিবর্ণ।

—আবার লাইলাক ফুল। ফ্রান্সিস বলল। ততক্ষণে সবাই ফুলটা দেখল। বাক্সটার গায়ে সোনারূপের কাজ করা নানা ফুলপাতার নক্‌শা। বড় সুন্দর দেখতে বাক্সটা।

—হ্যারি—বোঝা যাচ্ছে লাইলাক ফুলের নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার আর কোথায় আছে লাইলাক ফুলের নকশা সেটা দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—লাইলাক ফুলের নকশাই তাহলে গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের নিশানা। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। চলো দেখি আর কোথায় আছে লাইলাক ফুলের নকশা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আবার ভাঙা অন্দরমহল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ন্নাঃ। অন্দরমহলে কোথাও আর লাইলাক ফুলের নকশা নেই।

ফ্রান্সিস প্রার্থনাকক্ষে ঢুকল। মেঝেয় পাতা ভারি কার্পেটে রয়েছে লাইলাক ফুলের নকশা। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে বলল—হাত লাগাও। কার্পেটটা তুলতে হবে। আটদশজন যোদ্ধার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কার্পেটের চারপাশ ধরল। টেনে তুলে ফেলা হল মোটা ভারি কার্পেটটা। আবার লাইলাক ফুল। এবার ফুলটার হালকা নীল রক্তিমাভ পাপড়িগুলোর রং উজ্জ্বল। কতদিন নকশাটা কার্পেটের তলায় চাপা পড়েছিল কে জানে। ফুলের নকশাটা ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে। বেশ বড়। সবাই বেশ অবাক হয়ে ফুলের নক্‌শাটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—

—হ্যারি। আবার লাইলাক ফুল। এটা সবচেয়ে বড় নকশা। সবচেয়ে সুন্দর।

ফ্রান্সিস উবু হয়ে মেঝেয় বসল। নকশায় হাত বুলোলো কয়েকবার। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—পাথর কেটে ফুলের ছাঁচ করা হয়েছে। পরে রঙ দেওয়া হয়েছে। এখন এই পাথরের ছাঁচটা তুলে ফেলতে হবে।

—তা কেন। ভেঙে ফেললেও তো হয়। বিনেলো বলল।

—না। এত সুন্দর পাথরের ওপর ফুলের নকশা। আভাঙা অবস্থায় তুলে নেব। তাহলেই নীচে কী আছে দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আভাঙা অবস্থায় তোলা যাবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। হাত দিয়ে দেখেছি। কুড়ুলের মাথা দিয়ে আস্তে চাড় দিয়ে দিয়ে তোলা যাবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল—দুপুর হয়ে এসেছে। চলো খেতে সবাই।

আয়তন বেশ বড়। কিছু ভাঙা কাঠের আসবাবপত্র পাওয়া গেল। পাথরের দেয়ালে কোথাও কোথাও দেয়াল আলমারিমত ছিল। সেসব এখন ফাঁকা। কয়েকটা ভেঙেও পড়েছে।

পূবদিকে একটা ছোট ঘর দেখা গেল। সেই ঘরে ফ্রান্সিসরা ঢুকল। বালি সরানো হয়েছে। ছোট ঘরটার মাঝখানে একটা মোটা কার্পেট পাতা। বালি সরানোতে এখন কার্পেটটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। কার্পেটে হালকা নীল ও রক্তিমাভ রঙের লাইলাক ফুলের নকশা। বেশ বড়।

—আবার লাইলাক ফুল। ফ্রান্সিস বিড় বিড় করে বলল। তারপরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল নিরেট পাথরের দেয়াল। এটা বোধহয় নিরলংকার প্রার্থনা ঘর ছিল।

প্রার্থনা ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস গুপ্তধন রাখার মত সম্ভাব্য কোন জায়গাই তো দেখা যাচ্ছে না।

—দেয়াল ভেঙে যে ঘরটা পেলাম সেই ঘরটায় চলো। ফ্রান্সিস বলল। সেই ঘরটায় ওরা এল। বেদীটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—এই বেদীটা ভাঙতে হবে। আতলেতার দিকে তাকিয়ে বলল—কালকে কয়েকটা কুড়ুল আনতে হবে। যোদ্ধাদের বলে দাও।

—ঠিক আছে। তাহলে বেদীটা ভাঙবে? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। লাইলাক ফুলের রহস্য ভেদ করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিনের মতো ওরা অতিথিশালায় ফিরে এল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা আবার খোঁড়ার জায়গায় এলো। দু'তিনজন যোদ্ধা কুড়ুল নিয়ে এসেছিল।

সেই ঘরে এসে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের বলল—

—এই বেদীটা ওপর থেকে ভাঙতে হবে। কুড়ুল চালাও।

বেদীর মাথায় যোদ্ধারা কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌকোনো মাথাটা ভেঙে গেল। দেখা গেল চৌকোনো একটা গর্ত মত। ফ্রান্সিস হাত তুলে যোদ্ধাদের থামাল। চৌকোনো গর্তটার কাছে গিয়ে দেখল ভেতরে একটা কিছু আছে। হাত ঢুকিয়ে দেখল একটা কালো কাঠের বাক্সমত। ও দুহাত দিয়ে বাক্সটা তুলে আনল। হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস। এটাই কি রত্নভাণ্ডার?

—বাক্সটা খুবই ছোটো। খুলে দেখছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বাক্সটা খুলল। আশ্চর্য। ভেতরে একটা শুকনো লাইলাক ফুল। ফুল বিবর্ণ।

—আবার লাইলাক ফুল। ফ্রান্সিস বলল। ততক্ষণে সবাই ফুলটা দেখল। বাক্সটার গায়ে সোনারূপের কাজ করা নানা ফুলপাতার নক্‌শা। বড় সুন্দর দেখতে বাক্সটা।

—হ্যারি—বোঝা যাচ্ছে লাইলাক ফুলের নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার আর কোথায় আছে লাইলাক ফুলের নকশা সেটা দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—লাইলাক ফুলের নকশাই তাহলে গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের নিশানা। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। চলো দেখি আর কোথায় আছে লাইলাক ফুলের নকশা। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আবার ভাঙা অন্দরমহল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ন্নাঃ। অন্দরমহলে কোথাও আর লাইলাক ফুলের নকশা নেই।

ফ্রান্সিস প্রার্থনাকক্ষে ঢুকল। মেঝেয় পাতা ভারি কার্পেটে রয়েছে লাইলাক ফুলের নকশা। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে বলল—হাত লাগাও। কার্পেটটা তুলতে হবে। আটদশজন যোদ্ধার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কার্পেটের চারপাশ ধরল। টেনে তুলে ফেলা হল মোটা ভারি কার্পেটটা। আবার লাইলাক ফুল। এবার ফুলটার হালকা নীল রক্তিমাভ পাপড়িগুলোর রং উজ্জ্বল। কতদিন নকশাটা কার্পেটের তলায় চাপা পড়েছিল কে জানে। ফুলের নকশাটা ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে। বেশ বড়। সবাই বেশ অবাক হয়ে ফুলের নক্‌শাটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—

—হ্যারি। আবার লাইলাক ফুল। এটা সবচেয়ে বড় নকশা। সবচেয়ে সুন্দর।

ফ্রান্সিস উবু হয়ে মেঝেয় বসল। নকশায় হাত বুলোলো কয়েকবার। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—পাথর কেটে ফুলের ছাঁচ করা হয়েছে। পরে রঙ দেওয়া হয়েছে। এখন এই পাথরের ছাঁচটা তুলে ফেলতে হবে।

—তা কেন। ভেঙে ফেললেও তো হয়। বিনেলো বলল।

—না। এত সুন্দর পাথরের ওপর ফুলের নকশা। আভাঙা অবস্থায় তুলে নেব। তাহলেই নীচে কী আছে দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আভাঙা অবস্থায় তোলা যাবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। হাত দিয়ে দেখেছি। কুড়ুলের মাথা দিয়ে আস্তে চাড় দিয়ে দিয়ে তোলা যাবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল—দুপুর হয়ে এসেছে। চলো খেতে সবাই।

কাজ বন্ধ করে সবাই নগরের দিকে চললো। আসতে আসতে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দলনেতাকে ডেকে বলল—ভাই তোমাদের আর প্রয়োজন নেই। বালি খোঁড়া হয়ে গেছে। এখন অনুসন্ধানের পালা। ওটা আমরা কয়েকজনে পারবো।

---ঠিক আছে। বাকি কাজ আপনারাই করুন। দলনেতা বলল।

দুপুরে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—যোদ্ধাদের চলে যেতে বললে বাকি কাজ আমরা পারবো?

—পারতে হবে। ঐ যোদ্ধাদের ধারে কাছেও রাখবো না বলে ওদের আসতে মানা করেছি। যদি ওদের সামনে সেই গুপ্ত রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হয় ওরা ঐ ভাণ্ডার লুঠ করে নেবে। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের ঐ কুড়ুল দিয়েই মেরে ফেলবে। ধনসম্পদের লোভ বড় সাংঘাতিক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কালকের অনুসন্ধানে শুধু আমরাই যাবো? আতলেতা বলল।

—কালকে নয়। আজ রাতে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাতে খুঁজবে? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—যতটা সম্ভব গোপনে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—আমার এভাবে একা একা এই অতিথিশালায় পড়ে থাকতে ভালো লাগছে না। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাবো।

—তোমার শরীর—ফ্রান্সিস বলতে গেল। শাঙ্কো বলে উঠল—

—আমি এখন অনেক সুস্থ।

—বেশ। যেও। তবে আমাদের কাজে হাত লাগাবে না। শুধু বসে থাকবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো মাথা কাত করে বলল। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—কোন সূত্র পেলে?

—একমাত্র সূত্র ঐ লাইলাক ফুলের নকশা। ঐরকম নকশা কয়েকটা জায়গায় রয়েছে। তার একটা ভেঙে ছোট বাক্সে শুকনো লাইলাক ফুল পেয়েছি। এবার প্রার্থনা ঘরের মেঝের নকশা খুলে কী পাই দেখি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিনেলোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিনেলো কুড়ুলগুলো যোদ্ধাদের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছো তো?

—সব ঘরের কোনায় রেখেছি। বিনেলো বলল।

—ভালো করেছ। সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বলল—সিনাত্রা—তিনটে বেশ

ভালো করে তেল ভেজানো মশাল জোগার করে আনো। কার কাছে মশাল চাইবে?

—সৈন্যাবাস থেকে আনবো। সিনাত্রা বলল।

—কী বলবে? ফ্রান্সিস বলল।

—রাতে পুরোনো প্রাসাদে গুপ্ত ধনভান্ডার খুঁজতে যাবো। সিনাত্রা বলল।

—নির্বোধ। ওসব বললে সব জানাজানি হয়ে যাবে। বলবে অতিথিশালার মশাল শেষ রাতে নিভে যায়। কাজেই বেশি তেল মাখানো মশাল চাই। বুঝেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সিনাত্রা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তবে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা রাতের খাবার বেশ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—একটু বিশ্বাস করে নাও। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে না কেউ।

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। উঠে দাঁড়াল। বলল—কুড়ুল মশাল নাও। চলো সবাই।

সবাই হাতে কুড়ুল মশাল নিয়ে অতিথিশালার বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল। ওরা নিঃশব্দে চলল বালি খুঁড়ে তোলা পুরোনো রাজপ্রসাদের দিকে।

সেখানে এসে বালির ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল সবাই।

দেওয়ালে জ্বলন্ত মশাল রাখা হল। প্রার্থনা ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস একটা কুড়ুল নিল। কুড়ুলের মুখটা দিয়ে নকশার ধার গুলোতে চাড় দিতে দিতে বলল—এইভাবে চাড় দিয়ে দিয়ে নকশা অভগ্ন অবস্থায় তুলতে হবে। নকশা এখানে ওখানে একটু নড়ল। চলল সাবধানে চাড় দেওয়া। যাতে কোনভাবেই ভেঙে না যায় সেভাবেই সাবধানে কাজ চলছিল। কাজেই সময় লাগছিল।

বাকি সারারাত ধরে কাজ চলল। মশাল নিভু নিভু হয়ে এল। ভোরের দিকে সবটা নকশা আলগা হ'ল। শাঙ্কো ছাড়া সবাই মিলে—হাত লাগাল—আস্তে আস্তে লাইলাক ফুলের নকশাটা তুলে ধরল সবাই। পাথরের দেওয়ালে ওটা ঠেসান দিয়ে রাখা হল। কত সুন্দর দেখাচ্ছিল নকশাটা। ফ্রান্সিস এই ভেবে তৃপ্তি পলে যে নকশাটা নষ্ট হয়নি।

এবার নকশার বাকি ফোকরওয়ালা পাথরের পাটটা তুলে ফেলল। ভেতরে তিনকোনা গর্তমত। ফ্রান্সিস নিভু নিভু একটা মশাল ভেতরে ফেলে দিল। নিভু নিভু

কাজ বন্ধ করে সবাই নগরের দিকে চললো। আসতে আসতে ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দলনেতাকে ডেকে বলল—ভাই তোমাদের আর প্রয়োজন নেই। বালি খোঁড়া হয়ে গেছে। এখন অনুসন্ধানের পালা। ওটা আমরা কয়েকজনে পারবো।

—ঠিক আছে। বাকি কাজ আপনারাই করুন। দলনেতা বলল।

দুপুরে খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। বিনেলো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—যোদ্ধাদের চলে যেতে বললে বাকি কাজ আমরা পারবো?

—পারতে হবে। ঐ যোদ্ধাদের ধারে কাছেও রাখবো না বলে ওদের আসতে মানা করেছি। যদি ওদের সামনে সেই গুপ্ত রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হয় ওরা ঐ ভাণ্ডার লুঠ করে নেবে। আমরা বাধা দিতে গেলে আমাদের ঐ কুড়ুল দিয়েই মেরে ফেলবে। ধনসম্পদের লোভ বড় সাংঘাতিক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কালকের অনুসন্ধানে শুধু আমরাই যাবো? আতলেতা বলল।

—কালকে নয়। আজ রাতে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাতে খুঁজবে? আতলেতা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—যতটা সম্ভব গোপনে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—আমার এভাবে একা একা এই অতিথিশালায় পড়ে থাকতে ভালো লাগছে না। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাবো।

—তোমার শরীর—ফ্রান্সিস বলতে গেল। শাঙ্কো বলে উঠল—

—আমি এখন অনেক সুস্থ।

—বেশ। যেও। তবে আমাদের কাজে হাত লাগাবে না। শুধু বসে থাকবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো মাথা কাত করে বলল। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—কোন সূত্র পেলে?

—একমাত্র সূত্র ঐ লাইলাক ফুলের নকশা। ঐরকম নকশা কয়েকটা জায়গায় রয়েছে। তার একটা ভেঙে ছোট বাক্সে শুকনো লাইলাক ফুল পেয়েছি। এবার প্রার্থনা ঘরের মেঝের নকশা খুলে কী পাই দেখি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিনেলোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিনেলো কুড়ুলগুলো যোদ্ধাদের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছো তো?

—সব ঘরের কোনায় রেখেছি। বিনেলো বলল।

—ভালো করেছ। সিনাত্রার দিকে তাকিয়ে বলল—সিনাত্রা—তিনটে বেশ

ভালো করে তেল ভেজানো মশাল জোগার করে আনো। কার কাছে মশাল চাইবে?

—সৈন্যাবাস থেকে আনবো। সিনাত্রা বলল।

—কী বলবে? ফ্রান্সিস বলল।

—রাতে পুরোনো প্রাসাদে গুপ্ত ধনভান্ডার খুঁজতে যাবো। সিনাত্রা বলল।

—নির্বোধ। ওসব বললে সব জানাজানি হয়ে যাবে। বলবে অতিথিশালার মশাল শেষ রাতে নিভে যায়। কাজেই বেশি তেল মাখানো মশাল চাই। বুঝেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সিনাত্রা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—তবে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা রাতের খাবার বেশ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—একটু বিশ্বাস করে নাও। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে না কেউ।

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। উঠে দাঁড়াল। বলল—কুড়ুল মশাল নাও। চলো সবাই।

সবাই হাতে কুড়ুল মশাল নিয়ে অতিথিশালার বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল। ওরা নিঃশব্দে চলল বালি খুঁড়ে তোলা পুরোনো রাজপ্রসাদের দিকে।

সেখানে এসে বালির ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল সবাই।

দেওয়ালে জ্বলন্ত মশাল রাখা হল। প্রার্থনা ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস একটা কুড়ুল নিল। কুড়ুলের মুখটা দিয়ে নকশার ধার গুলোতে চাড় দিতে দিতে বলল—এইভাবে চাড় দিয়ে দিয়ে নকশা অভগ্ন অবস্থায় তুলতে হবে। নকশা এখানে ওখানে একটু নড়ল। চলল সাবধানে চাড় দেওয়া। যাতে কোনভাবেই ভেঙে না যায় সেভাবেই সাবধানে কাজ চলছিল। কাজেই সময় লাগছিল।

বাকি সারারাত ধরে কাজ চলল। মশাল নিভু নিভু হয়ে এল। ভোরের দিকে সবটা নকশা আলগা হ'ল। শাঙ্কো ছাড়া সবাই মিলে—হাত লাগাল—আস্তে আস্তে লাইলাক ফুলের নকশাটা তুলে ধরল সবাই। পাথরের দেওয়ালে ওটা ঠেসান দিয়ে রাখা হল। কত সুন্দর দেখাচ্ছিল নকশাটা। ফ্রান্সিস এই ভেবে তৃপ্তি পলে যে নকশাটা নষ্ট হয়নি।

এবার নকশার বাকি ফোকরওয়ালা পাথরের পাটটা তুলে ফেলল। ভেতরে তিনকোনা গর্তমত। ফ্রান্সিস নিভু নিভু একটা মশাল ভেতরে ফেলে দিল। নিভু নিভু

আলোয় দেখা গেল একটা তিনকোনা কালোকাঠের বাক্স। বেশ বড়। বাক্সটার গায়ে সোনার লতাপাতার কাজ। বাক্সের সঙ্গে ওপরে কাঠের হাতল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ দেখল। ততক্ষনে ভোরের আবছা আলো পড়েছে। এবার ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এটাই রাজা সিয়োভোর রত্নভাণ্ডার।

—তুমি নিশ্চিত? হ্যারি বলল।

—আমি নিশ্চিত। দেখ। কথাটা বলে ফ্রান্সিস কাঠের হাতলটা ধরে বাক্সটা আস্তে তুলে আনল। চাবির জায়গায় একটা বড় ফুটো। ফ্রান্সিস হাতল ধরে টানল। বাক্স খুলল না। বিনেলো সিনাত্রাকে ডাকল। তিনজনে মিলে হাতলটা টানাটানি করল। কিন্তু বাক্স খুলল না। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—উপায় নেই। বাক্সটা ভাঙতে হবে। ও বাক্সটার ফুটোর কাছে ডালা দু'টোর ফাঁকে কুড়ুলের মাথা দিয়ে চাড় দিতে লাগল। সামান্য ফাঁক হল। ফ্রান্সিস বলল—বিনেলো ঐ মুখটায় চাড় দাও। বিনোলাও কুড়লের মুখ চেপে চাড় দিতে লাগল। আরো একটু ফাঁক হল।

—কুডুল চালিয়ে ভেঙে ফেললেই তো হয়। শাঙ্কো বলে উঠল।

—না। এত সুন্দর বাক্সটা অধৈর্য হয়ে এটা নষ্ট করব? ফ্রান্সিস বলল। এ ভাবেই খুলবো।

আবার চাড় দেওয়া শুরু হল। দড়াম করে বাক্সের ডালাটা খুলে গেল। উজ্জ্বল রোদে ঝিকিয়ে উঠল বাক্সের অৰ্দ্ধেক বোঝাই চুন্নি পান্না হীরে জহরত। ফ্রান্সিসরা খুব একটা অবাক হল না। এরকম গুপ্তধন ওরা আগেও উদ্ধার করেছে। আতলেতার মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। একসঙ্গে চুনিপান্না হীরে জহরৎ দেখবে —কোনদিন কল্পনাও করেনি।

বাক্স বন্ধ করে ফ্রান্সিস মেঝেয় বসে পড়ল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এবার বাকি কাজটা। বাক্সটা ভেঙে গেছে। হাতল ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কাঁধে করে নিয়ে চলো। রাজা এনিমারকে দিতে হবে। যে বাক্সটায় শুকনো লাইলাক ফুল পাওয়া গিয়েছিল হ্যারি সেই বাক্সটা নিল।

বিনেলো আর সিনাত্রা বাক্সটা দুপাশে ধরে কাঁধে তুলল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সবাই নগরের দিকে চলল।

তখন রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সবাই দেখল একটা সুন্দর কারুকাজকরা কালো কাঠের তিনকোণা বাক্স বিদেশীরা কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেরই ঔৎসুক্য কী আছে বাক্সটায়?

সবাই রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ালো প্রহরীরা

ফ্রান্সিসদের দেখল। বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল---আমাদের বাধা দিও না। রাজার সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। দেখা করতে হবে।

প্রহরীরা এই ক'দিনে ফ্রান্সিসদের চিনেছে। ওরা আর বাধা দিল না।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলের দরজার কাছে এল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের বলল---রাজামশাই ঘুম থেকে উঠেছেন?

—হ্যাঁ। এখন সকালের খাবার খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরেই রাজসভায় বসবেন।

—না। রাজসভায় নয়। আমাদের জন্য মন্ত্রণাকক্ষটা খুলে দাও আর রাজামশাইকে বলো যে বিদেশীরা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মন্ত্রণাকক্ষ ভোরেই খুলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা গিয়ে বসুন। প্রহরীটি বলল।

ফ্রান্সিসরা বাক্স নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে এসে বসল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল কখন রাজা আসেন তার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরেই রাজা এনিমার ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিসরা একটু উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। রাজা বসতে বসতে বললেন—বসো বসো। এই সকালে এসেছো। কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল—আপনার পূর্বপুরুষ রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি।

—কোথায় সেই রত্ন ভাণ্ডার? রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনার সম্মুখে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হাতল ধরে বাক্সটার ডালা খুলল। রাজা অবাক চোখে সেই চুনি-পান্না-হীরে জহরতের ভান্ডারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সোল্লাসে বলে উঠলেন—তোমরা তো অসাধ্য সাধন করেছো। তারপর চুনি পান্না জহরৎ মুঠো করে তুলে তুলে দেখলেন। বললেন—তোমরা উদ্ধার করেছো। তোমরাও কিছু নাও।

—না। আমরা কিছু নিই না। আমাদের মাফ করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

এবার হ্যারি কালো ছোট বাক্সটা দেখিয়ে বলল—শুধু এই বাক্সটা আমরা নেব।

—বেশ তো। রাজা বললেন।

—বলো কি? যাক গে—এই লাগাস রাজ্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইল। রাজা বললেন।

—আমার কয়েকটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

আলোয় দেখা গেল একটা তিনকোনা কালেকাঠের বাক্স। বেশ বড়। বাক্সটার গায়ে সোনার লতাপতার কাজ। বাক্সের সঙ্গে ওপরে কাঠের হাতল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ দেখল। ততক্ষনে ভোরের আবছা আলো পড়েছে। এবার ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—এটাই রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার।

—তুমি নিশ্চিত? হ্যারি বলল।

—আমি নিশ্চিত। দেখ। কথাটা বলে ফ্রান্সিস কাঠের হাতলটা ধরে বাক্সটা আস্তে তুলে আনল। চাবির জায়গায় একটা বড় ফুটো। ফ্রান্সিস হাতল ধরে টানল। বাক্স খুলল না। বিনেলো সিনাত্রাকে ডাকল। তিনজনে মিলে হাতলটা টানাটানি করল। কিন্তু বাক্স খুলল না। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—উপায় নেই। বাক্সটা ভাঙতে হবে। ও বাক্সটার ফুটোর কাছে ডালা দু'টোর ফাঁকে কুড়ুলের মাথা দিয়ে চাড় দিতে লাগল। সামান্য ফাঁক হল। ফ্রান্সিস বলল—বিনেলো ঐ মুখটায় চাড় দাও। বিনোলাও কুড়লের মুখ চেপে চাড় দিতে লাগল। আরো একটু ফাঁক হল।

—কুড়ুল চালিয়ে ভেঙে ফেললেই তো হয়। শাঙ্কো বলে উঠল।

—না। এত সুন্দর বাক্সটা অধৈর্য হয়ে এটা নষ্ট করব? ফ্রান্সিস বলল। এ ভাবেই খুলবো।

আবার চাড় দেওয়া শুরু হল। দড়াম করে বাক্সের ডালাটা খুলে গেল। উজ্জ্বল রোদে ঝিকিয়ে উঠল বাক্সের অদ্ধেক বোঝাই চুন্নি পান্না হীরে জহরত। ফ্রান্সিসরা খুবএকটা অবাক হল না। এরকম গুপ্তধন ওরা আগেও উদ্ধার করেছে। আতলেতার মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। একসঙ্গে চুনিপান্না হীরে জহরৎ দেখবে —কোনদিন কল্পনাও করেনি।

বাক্স বন্ধ করে ফ্রান্সিস মেঝেয় বসে পড়ল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এবার বাকি কাজটা। বাক্সটা ভেঙে গেছে। হাতল ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কাঁধে করে নিয়ে চলো। রাজা এনিমারকে দিতে হবে। যে বাক্সটায় শুকনো লাইলাক ফুল পাওয়া গিয়েছিল হ্যারি সেই বাক্সটা নিল।

বিনেলো আর সিনাত্রা বাক্সটা দুপাশে ধরে কাঁধে তুলল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সবাই নগরের দিকে চলল।

তখন রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। সবাই দেখল একটা সুন্দর কারুকাজকরা কালো কাঠের তিনকোণা বাক্স বিদেশীরা কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেরই ঔৎসুক্য কী আছে বাক্সটায়?

সবাই রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ালো প্রহরীরা

ফ্রান্সিসদের দেখল। বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—আমাদের বাধা দিও না। রাজার সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। দেখা করতে হবে।

প্রহরীরা এই ক'দিনে ফ্রান্সিসদের চিনেছে। ওরা আর বাধা দিল না।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলের দরজার কাছে এল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের বলল—রাজামশাই ঘুম থেকে উঠেছেন?

—হ্যাঁ। এখন সকালের খাবার খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরেই রাজসভায় বসবেন।

—না। রাজসভায় নয়। আমাদের জন্য মন্ত্রণাকক্ষটা খুলে দাও আর রাজামশাইকে বলো যে বিদেশীরা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মন্ত্রণাকক্ষ ভোরেই খুলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা গিয়ে বসুন। প্রহরীটি বলল।

ফ্রান্সিসরা বাক্স নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে এসে বসল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল কখন রাজা আসেন তার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরেই রাজা এনিমার ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিসরা একটু উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। রাজা বসতে বসতে বললেন—বসো বসো। এই সকালে এসেছো। কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল—আপনার পূর্বপুরুষ রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি।

—কোথায় সেই রত্ন ভাণ্ডার? রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনার সম্মুখে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস হাতল ধরে বাক্সটার ডালা খুলল। রাজা অবাক চোখে সেই চুনি-পান্না-হীরে জহরতের ভান্ডারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সোল্লাসে বলে উঠলেন—তোমরা তো অসাধ্য সাধন করেছো। তারপর চুনি পান্না জহরৎ মুঠো করে তুলে তুলে দেখলেন। বললেন—তোমরা উদ্ধার করেছো। তোমরাও কিছু নাও।

—না। আমরা কিছু নিই না। আমাদের মাফ করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

এবার হ্যারি কালো ছোট বাক্সটা দেখিয়ে বলল—শুধু এই বাক্সটা আমরা নেব।

—বেশ তো। রাজা বললেন।

—বলো কি? যাক গে—এই লাগাস রাজ্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইল। রাজা বললেন।

—আমার কয়েকটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বলো। রাজা বললেন।

—আমরা প্রাচীন প্রাসাদের প্রার্থনাঘরের মেঝেয় করা লাইলাক ফুলের নকশার নিচে থেকে এই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। খুব যত্নের সঙ্গে লাইলাক ফুলের নকশাটা ঐ ঘরেই রেখে দিয়েছি। বড় সুন্দর নকশাটা। অনুরোধ ওটা আপনার প্রাসাদে এনে রাখুন।

—খুব ভালো বলেছো। নিশ্চয়ই এখানে রাখবো। রাজা বললেন।

—আর একটা কথা। এই বাক্সে রত্নগুলো মাত্র অর্ধেক রাখা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আরো রত্নভান্ডার আছে? রাজা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। মহামান্য রাজা। আপনার রাজত্বে যেখানে যেখানে লাইলাক ফুলের নকশা রয়েছে যেমন অন্দরমহলের একটা দেয়ালে আর মন্দির—ঘরের বেদীতে সেসব ভাঙলে আরও মণিমাণিক্য হীরে জহরত পাওয়া যাবে।

—ওসব ভেঙে নষ্ট করবো? রাজা বললেন।

—সেটা আপনার বিবেচনা। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ভেবে দেখি। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আমাদের কাজ শেষ। আমরা জাহাজঘাটে আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।

রাজবাড়ির বাইরে এসে হ্যারি বলল—তাহলে এখন জাহাজে ফিরে যাই।

—না। দুপুরের খাওয়াটা সেরে যাবো। কাজও তো হয়ে গেছে। এখন আর এখানে থাকবো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে খাওয়া সেরে সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল। ওরা জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ছুটে এল। মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। বলল—রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে পেরেছো? ফ্রান্সিসও হাসলো। বলল—হ্যাঁ। একটা তিনকোণা বাক্স প্রায় ভর্তি চুনি পান্না হীরে জহরৎ। রাজা এলিমার খুব খুশি। কিন্তু—

আমাদের হাত শূন্য। '

—তোমরা নিরাপদে ফিরে এসেছো এটাই আমার কাছে অনেক। তবে শাঙ্কো নাকি অসুস্থ। ওকে আমি আর ভেন মিলে কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ করে তুলবো। ওর জন্যে ভেবো না।

হ্যারি এতক্ষণ সেই কালো কাঠের কারুকাজকরা ছোট বাক্সটা দুহাতে পেছনে ধরে ছিল। মারিয়া দেখতে পায়নি। এবার বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল—রাজকুমারী আমাদের হাত একেবারে শূন্য নয়। এই নিন বাক্সটা। বাক্সটা হাতে নিয়ে মারিয়া শিশুর মত লাফিয়ে উঠল—ঈস্ কী সুন্দর বাক্সটা। বিকেলের রোদ পড়ে বাক্সটার গায়ের সোনারূপোর কাজকরা ফুললতাপাতাগুলো চক্‌চক্ করছিল তখন।

বন্ধুরা ততক্ষণে বিনেলোর মুখে সব শুনেছে। কারুকার্যময় ছোট বাক্সটাও দেখল। আনন্দে সবাই ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—নোঙর তোল। পাল তোল। দাঁড় বাও। ফ্রেজারকে বলো জাহাজ চালাতে উত্তর-পূর্ব মুখো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ চলতে শুরু করল।

—বেশ। বলো। রাজা বললেন।

—আমরা প্রাচীন প্রাসাদের প্রার্থনাঘরের মেঝেয় করা লাইলাক ফুলের নকশার নিচে থেকে এই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করেছি। খুব যত্নের সঙ্গে লাইলাক ফুলের নকশাটা ঐ ঘরেই রেখে দিয়েছি। বড় সুন্দর নকশাটা। অনুরোধ ওটা আপনার প্রাসাদে এনে রাখুন।

—খুব ভালো বলেছো। নিশ্চয়ই এখানে রাখবো। রাজা বললেন।

—আর একটা কথা। এই বাক্সে রত্নগুলো মাত্র অর্ধেক রাখা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আরো রত্নভান্ডার আছে? রাজা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। মহামান্য রাজা। আপনার রাজত্বে যেখানে যেখানে লাইলাক ফুলের নকশা রয়েছে যেমন অন্দরমহলের একটা দেয়ালে আর মন্দির—ঘরের বেদীতে সেসব ভাঙলে আরও মণিমাণিক্য হীরে জহরত পাওয়া যাবে।

—ওসব ভেঙে নষ্ট করবো? রাজা বললেন।

—সেটা আপনার বিবেচনা। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ভেবে দেখি। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। আমাদের কাজ শেষ। আমরা জাহাজঘাটে আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।

রাজবাড়ির বাইরে এসে হ্যারি বলল—তাহলে এখন জাহাজে ফিরে যাই।

—না। দুপুরের খাওয়াটা সেরে যাবো। কাজও তো হয়ে গেছে। এখন আর এখানে থাকবো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে খাওয়া সেরে সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল। ওরা জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ছুটে এল। মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। বলল—রাজা সিয়োভোর রত্নভান্ডার নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে পেরেছো? ফ্রান্সিসও হাসলো। বলল—হ্যাঁ। একটা তিনকোণা বাক্স প্রায় ভর্তি চুনি পান্না হীরে জহরৎ। রাজা এলিমার খুব খুশি। কিন্তু—

আমাদের হাত শূন্য।

—তোমরা নিরাপদে ফিরে এসেছো এটাই আমার কাছে অনেক। তবে শাঙ্কো নাকি অসুস্থ। ওকে আমি আর ভেন মিলে কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ করে তুলবো। ওর জন্যে ভেবো না।

হ্যারি এতক্ষণ সেই কালো কাঠের কারুকাজকরা ছোট বাক্সটা দুহাতে পেছনে ধরে ছিল। মারিয়া দেখতে পায়নি। এবার বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল—রাজকুমারী আমাদের হাত একেবারে শূন্য নয়। এই নিন বাক্সটা। বাক্সটা হাতে নিয়ে মারিয়া শিশুর মত লাফিয়ে উঠল—ঈস্ কী সুন্দর বাক্সটা। বিকেলের রোদ পড়ে বাক্সটার গায়ের সোনারূপোর কাজকরা ফুললতাপাতাগুলো চক্‌চক্ করছিল তখন।

বন্ধুরা ততক্ষণে বিনেলোর মুখে সব শুনেছে। কারুকার্যময় ছোট বাক্সটাও দেখল। আনন্দে সবাই ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—নোঙর তোল। পাল তোল। দাঁড় বাও। ফ্রেজারকে বলো জাহাজ চালাতে উত্তর-পূর্ব মুখো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ চলতে শুরু করল।

মৃত্যু-সায়রে ফ্রান্সিস

মৃত্যু-সায়রে ফ্রান্সিস

অনিল ভৌমিক

সেদিন গভীর রাত। একেবারে অন্ধকার রাত নয়। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

প্রায় দিন পনেরো হতে চলল---ডাঙার দেখা নেই। ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। ফ্রান্সিস খুবই চিন্তায় পড়ল। তবে নিজের দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেতে দিল না। বন্ধুরা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে তাদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

রাত হলে ফ্রান্সিস জাহাজের ডেক-এ উঠে আসে। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কখনও কখনও উঁচু গলায় পেড্রোকে ডেকে বলে—পেড্রো ঘুমিয়ে পড়ো না। ডাঙার দেখা পেতেই হবে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর নিজের জায়গায় রাত জেগে জেগে চারদিকে নজর রাখে। ও চেঁচিয়ে বলে—কিচ্ছু ভেবো না। আমি জেগে আছি। পেড্রোকে একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে হয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডাঙার খোঁজ করতে হয় আবার হঠাৎ জলদস্যুদের দ্বারা তাদের জাহাজ আক্রান্ত হতে না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হয় দু'বার ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। কাজেই কড়া নজরদারি চালাতে হয় ওকে।

রাতে ফ্রান্সিস যখন একা একা ডেক-এ পায়চারি করে বেড়ায় হ্যারি উঠে আসে। একমাত্র হ্যারিকেই ফ্রান্সিস নিজের দুশ্চিন্তার কথা বলে। হ্যারি অবশ্য সান্ত্বনা দেয়। বলে---

—কেন দুশ্চিন্তা করছো? এর আগেও আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ডাঙা খুঁজে পেয়েছি। এবারও পাবো। তুমি হতাশ হয়ে পড়লে কার ওপর ভরসা করবো আমরা? তোমার মনের জোর আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। মনটা শান্ত রাখো।

—হ্যারি—আমার চিন্তা তো শুধু আমার নিরাপত্তা নিয়ে নয়। এত বন্ধু, মারিয়া সবার কথাই তো আমাকে ভাবতে হয়। বন্ধুরা তো আমার, ওপরে বিশ্বাস আমার সঙ্গী হয়েছে। যদি সত্যি বিপদ-জনক কিছু ঘটে তার দায় তো আমি এড়াতে পারি না। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—বিপদ তো যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। তোমার নেতৃত্বে আমারা তো অনেক বিপদের মোকাবিলা করেছি। এখনও করবো। তা ছাড়া তোমার ভুলে তো আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়িনি। বলা যায় এটা নিয়তি। এতে কারো হাত নেই। ডাঙার দেখা পাবোই। দেশে ফেরার পথ খুঁজে পাবই। অনুরোধ সকলের কথা ভেবে নিজের মন দুর্বল করে ফেলো না। হ্যারিও মৃদুস্বরে বলল। এসব

কথা যাতে ভাইকিং বন্ধুদের কানে না যায় তাই দু'জনেই মৃদুস্বরে কথা বলছিল। এমন কি ফ্রান্সিস এই নিয়ে মারিয়াকেও কিছু বলেনি। মারিয়া থাকুক ওর মন-খুশি নিয়ে। ওকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে কী লাভ?

রাত বাড়ছে। দু'জনে ঘুমুতে চলে গেল।

ফ্রান্সিস নিজের কেবিন-ঘরে ঢুকল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভেবেছিল মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনই শুনল মারিয়া বলছে—

—এত রাত পর্যন্ত ডেক-এ একা একা পায়চারি কর। কী ভাব এত?

—ভাবনার কি শেষ আছে? তাছাড়া রাতে ডেক-এ পায়চারি করা আমার অভ্যেস। তুমি ঘুমোও। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—তুমি ডেক থেকে না নামা পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারিনা মারিয়া বলল।

—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। তা'ছাড়া প্রত্যেক দিন তো আমি ডেক-এ পায়চারি করি না। তুমি মিছিমিছি রাত জাগবে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কোনরকম দুশ্চিন্তা হলে তুমি এটা করো। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—দুশ্চিন্তা তো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি তোমার দুশ্চিন্তা কি? মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বলল—আরে বাবা দুশ্চিন্তা তো এক সময় কেটে যায়। কতবার কয়েদঘর থেকে পালালাম, ক্রীতদাসের জীবন থেকে পালালাম। দুশ্চিন্তা একদিন কেটে যায়।

—তুমি অনেকদিন হল ডাঙ্গার দেখা পাচ্ছ না। এটাই তোমার দুশ্চিন্তা মারিয়া বলল।

—আরে না-না। মাঝে মাঝে কতদিন ডাঙা খুঁজে পাই নি। পরে তো পেয়েছি। সেসব নয়—এমনি এটা ওটা ভাব নাও। তুমি ঘুমোও। তুমি খুশি থাকো এটাই আমি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখলে আমি খুশি থাকি কী করে? মারিয়া বলল।

—ওসব পাগলামি ছাড়ো। ফ্রান্সিস হাল্‌কাসুরে বলল। মারিয়া আর কোন কথা বলল না। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আরও দিন সাতেক কাটল। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। এদিকে খাবার আর পানীয়, জল ফুরিয়ে এসেছে। শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধন। অর্থাৎ যথাসম্ভব জল কম খাওয়া খাবার কম খাওয়া। ভাইকিং বন্ধুদের চিন্তা শুরু হল। এভাবে কতদিন চলবে? ডাঙার দেখা না পেলে সবাইকে উপবাসী থাকতে হবে। উপোস করে তবু কিছুদিন থাকা যায় কিন্তু জল না খেয়ে থাকা তো মারাত্মক।

দিন কাটে। রাত কাটে। খাবার প্রায় শেষ। সবাই একটা করে রুটি আর গলা ভেজাবার মত জল খেতে লাগল। এভাবেই চলল। তারপর দুদিন না জল না খাবার। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বুঝতে না দিয়ে নিজের রুটি জল মারিয়াকে দিতে লাগল। মারিয়া জিজ্ঞেস করে—তুমি কখন খেলে?

—আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি। ফ্রান্সিস হেসে বলে। জাহাজে চরম খাদ্য জল ঘাটতির কথা মারিয়াকে বুঝতে দেয় না।

কিন্তু আর কতদিন? ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে। ফ্রান্সিস রাতে ঘুমুতে পারে না। মারিয়া ঘুমিয়ে পড়লে ও ডেক-এ উঠে আসে। প্রায় সারারাত ডেক-এ পায়চারি করে আর ডাঙার খোঁজে চারিদিকে তাকায়। মাঝে মাঝে মাস্তুলের উপর উঠে যায়। পেড্রোর সঙ্গে বসে চারিদিকে তাকায়। ডাঙার দেখা পেতেই হবে। নইলে খাদ্যাভাব জলাভাবে সবাইকে মরতে হবে। তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন বন্ধু সমুদ্রের লবণাক্ত জলই খেয়ে ফেলেছিল। বমি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা। এই ঘটনার পর বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়ল। ফ্রান্সিস তো নিজের চিন্তায় মগ্ন। বন্ধুদের অসন্তোষের কথা ওর জানার কথা নয়। তবে বন্ধুদের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল।

সেদিন রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে আর চারিদিকে তাকাচ্ছে তখনই হ্যারি এল। দু'এককথার পর বলল—ফ্রান্সিস কিছু মনে করো না। জাহাজে খাদ্য জল শেষ।

—জানি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। ওদের বক্তব্য আমরা পথ হারিয়েছি। কোথায় চলেছি আমরা জানি না। এরজন্য তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে চলেছে। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল।

—তাহলে ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। হ্যারি মাথা ওঠা নামা করল।

—ঠিক আছে। ডাকো সবাইকে। ফ্রান্সিস বলল।

—অনেকেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যারি বলল।

—কই? আমি তো ঘুমোইনি। সবাইকে ডেকে-এ আসতে হবে। ডেকে আনো সবাইকে। একে খাদ্যাভাব জলাভাব এর মধ্যে ওদের অসন্তোষ বাড়তে দেওয়া যায় না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল।

হ্যারি চলে গেল। কিছু পরে বন্ধুরা একে একে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। কয়েকজন ডেক-এ ঘুমিয়ে ছিল। তারাও উঠে দাঁড়াল।

আকাশে চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। জোর হাওয়া ছুটছে। জড়ো হাওয়া বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব। এই অভিযানে বেরোবার সময় আমি বলেছিলাম অনেক সমস্যা আমাদের সামনে আসতে পারে। জল খাদ্য ফুরিয়ে যেতে পারে। আমরা দিক্ ভ্রষ্ট হতে পারি। ভীষন বিপদে পড়তে পারি—কিন্তু অধৈর্য হলে চলবে, না ভয় পাওয়া চলবে না। অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—শুনলাম তোমাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। আমার ওপর তোমরা বিশ্বাস হারাতে বসেছো। যদি তাই হয় আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। তোমাদের মধ্যেই কেউ জাহাজের দায়িত্ব নাও। যেভাবে জাহাজ চালাতে চাও চালাও। যেভাবে পারো সমস্যার মোকাবিলা কর। ফ্রান্সিস থামল। গত কয়েকদিন কিছুই খায়নি ও। শুধু গলা ভেজানোর মত জল খেয়ে আছে। বুঝতে পারছে শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল।

বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। শাঙ্কো ভিড়ের মধ্যে থেকে গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস হারাই নি। শুধু দুশ্চিন্তায় পড়ছি এই খাদ্যাভাব জলাভাবে আর কতদিন আমাদের চলবে? আসলে আমাদের সহ্য শক্তির পরীক্ষা চলছে। আমরা নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবো। আমাদের ধৈর্য হারালে চলবে না। শাঙ্কো থামল। কয়েকজন বন্ধু শাঙ্কোকে সমর্থন করল। এবার হ্যারি উচ্চস্বরে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস শাঙ্কোর বক্তব্য শুনলে। এবার তোমরাই বিচার কর আমাদের করণীয় কি? ফ্রান্সিসের ওপর বিশ্বাস হারালে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। একমাত্র ফ্রান্সিসই আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। একটু থেমে হ্যারি বলল—খাদ্যাভাব জলাভাবের সমস্যা আমাদের কাছে খুব নতুন কিছু নয়। সেই সমস্যার সমাধানও হয়েছে। অনেকদিন জাহাজ চলছে। অচিরেই ডাঙার দেখা পাবো। সব সমস্যার সমাধান হবে। শুধু অনুরোধ-অধৈর্য হয়ো না।

বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। গুঞ্জন চলল। এবার কয়েকজন বন্ধু বলে উঠল—আমরা ধৈর্য হারাবো না। ফ্রান্সিস—তোমাকে আমরা অবিশ্বাস করবো না।

—ঠিক এই উত্তরই আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল। বন্ধুদের জটলা ভেঙে গেল। সবাই ঘুমুতে চলে গেল। সবাই জানে খালি পেটে জলের তৃষ্ণা নিয়ে ভাল ঘুম হয় না। তবু শুয়ে থাকা। শরীরের দুর্বলতা কাটাতে এছাড়া উপায় নেই।

সবাই চলে গেলে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমি জানি তুমি না খেয়ে আছো।

—উপায় কি! মারিয়া উপবাস সহ্য করতে পারবে না। ওকে তো পেট পুরে খাওয়াতে হবে।

—ঠিক আছে। দুর্বল শরীরে তুমি রাত জেগো না। ঘুমুতে যাও। হ্যারি বলল।

—তুমিও তো দূর্বল হয়ে পড়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার শরীর তো জানো বরাবরই দূর্বল। এখন আরো দূর্বল হয়ে পড়েছি এই যা। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি পেড্রোর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস উচ্চস্বরে ডাকল। পেড্রো?

—বলো। মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রোর গলা শোনা গেল।

—সাবধান। ঘুমিয়ে পড়বে না। আর একটা কথা—খাওয়া হয়েছে?

—না। না খেয়ে ভালো আছি। ঘুম আসবে না। পেড্রো বলল।

—নেমে এসে একটু জল খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি ঠিক আছি। আমার কথা ভেবো না। পেড্রো বলল।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। সিঁড়িঘরের দিকে চলল।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ মাস্তুলের উপর থেকে পেড্রোর চিৎকার শোনা

গেল—ভাইসব—ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা। ফ্রান্সিসের তন্দ্রামত এসেছিল। তন্দ্রা ভেঙে গেল। ও প্রায় ছুটে ডেক-এ উঠে এল। ডেক-এ যারা ঘুমোচ্ছিল, যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়াল। বন্ধুরাও কাছে এসে দাঁড়াল। পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল—ডানদিকে—পাহাড়—বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস চোখ কুঁচকে ডানদিকে তাকাল। মোটামুটি স্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল সমুদ্রতীরে একটা ছোট বন্দর মত। খুব বড় বন্দর নয়। বন্দরে কোন জাহাজও নোঙর করা নেই। বাড়িঘরও কিছু দেখা গেল। একপাশে একটা পাহাড়।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। জাহাজ সমুদ্রতীরে ভেড়ানো হবে কিনা। জানা নেই এটা কোন দ্বীপ না দেশের অংশ। কিন্তু জাহাজে অনাহার চলছে। জলও প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। খাদ্য চাই, জল চাই। কাজেই নামতে হবে এখানে। কারা থাকে এখানে, নামলে কোন বিপদে পড়তে হবে কিনা এসব ভাবার সময় নেই।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল—কী করবে এখন?

—নামতে হবে। আর এক্ষুণি। আটা-ময়দা-চিনি জল সব জোগাড় করতে হবে। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে। বিপদে পড়ার আগেই। ফ্রান্সিস বলল। তারপর শাঙ্কোকে ডাকল। শাঙ্কো কাছে এলে বলল—শাঙ্কো—আমি শরীরের দিক থেকে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি। তুমি সিনাত্রা বিস্কো আর একজন বন্ধুকে নিয়ে যাও। বস্তা পীপে নিয়ে যাও। আটা-ময়দা জল যা পাও নিয়ে এসো। দেরি নয়। এখুনি। ভোর হয়েছে। তৈরি হয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো সিনাত্রা বিস্কো আর এক বন্ধু তৈরি হয়ে এল। হালের দিকে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে বস্তা পীপে নিয়ে একটা নৌকোয় নামাল। অন্যটায় দাঁড় হাতে বসল। সিনাত্রারাও বসল। দুটো নৌকো তীরের দিকে চলল।

নৌকো দু'টো তীরে ভিড়ল। তীরের বালির ওপর নৌকো ঠেলে তুলে চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। ওখানকার বাসিন্দাদের দেখল। বেঁটে মত। গায়ের রঙ কিছুটা তামাটে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। নাক একটু চ্যাপ্টা মত। ওরা বেশ অবাক হয়েই শাঙ্কোদের দেখছিল। এই বিদেশীরা কোত্থেকে এল?

সামনে যে লোকটাকে পেল শাঙ্কো তাকে বলল—আটা ময়দার দোকান কোথায়? বার কয়েক বলাতে হাত দিয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করাতে লোকটা বুঝল। হাত বাড়িয়ে একটা ঘর দেখাল। শাঙ্কোরা ঘরটার কাছে এল। এবড়োখেবড়ো কাঠের দরজা বন্ধ। শাঙ্কো দরজায় ধাক্কা দিল। ততক্ষণে রোদ উঠেছে। চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাজার এলাকা। লোকজন বাজার হাট করতে আসছে। দড়াম করে দরজা খুলে গেল। একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। শাঙ্কো বলল—আটা ময়দা আছে? লোকটি বুঝল না। শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে কয়েকটা কাপড়ের বাস্তা দেখাল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো সোনার চাকতি বার করে লোকটির হাতে দিল। লোকটা খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। দ্রুত কী বলে গেল।

বোধহয় আটা ময়দা নিয়ে যেতে বলল। শাঙ্কোরা কাপড়ের বস্তাসুদ্ধ আটা ময়দা কাঁধে তুলে নিয়ে জাহাজ ঘাটার দিকে চলল।

তখনই শাঙ্কো দেখল দু'জন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে বাজারে ঘুরছে। শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—ছোটো। চারজনই বাজারের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটল। পাহারাদার দু'জন ঠিক বুঝল না। শাঙ্কোরা ততক্ষণে ভিড়ে মিশে গেছে।

ওরা বস্তাকাঁধে নৌকার কাছে এল। একটা নৌকো ঠেলে জলে নামাল। বস্তাগুলো নৌকায় তুলল। সঙ্গী বন্দুটিকে শাঙ্কো বলল—তুমি নৌকা নিয়ে চলে যাও। আমরা পীপে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছি। বন্ধুটি বস্তা বোঝাই নৌকা জাহাজের দিকে চালাল।

এবার অন্য নৌকা থেকে তিনজন তিনটে জলের পীপে কাঁধে নিয়ে বাজার এলাকায় ঢুকল। শাঙ্কো সেই দোকানদার কাছে এল। ইশারায় পীপে দেখিয়ে জলের কথা বলল। দোকানদার বুঝল। হেসে পাহাড়ের দিকে দেখাল।

তিনজনে পীপে কাঁধে পাহাড়টার দিকে চলল।

পাহাড়ের নিচে বনভূমি। গভীর বন নয়। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে দু'জন স্ত্রীলোক কাঠের বালতিমত নিয়ে আসছে। শাঙ্কো বুঝল ওরা জল আনছে। ততক্ষণে ওরা ঝর্ণার জলধারার মৃদুশব্দ শুনছে। শব্দ লক্ষ্য করে এগোতেই ঝর্নাটা পেল। তিনটে পীপেতে জল ভরল। তারপর তিনজনেই, আঁজলাভরে জল খেল। পেট ভরেই খেল। তারপর গায়ে মাথায় জল ছিটোলো। বেশ কয়েকদিন পরে তৃপ্তিভরে জল খাওয়া। তবে উপোসী পেটে এখনও খাবার পড়েনি। তবে নিশ্চিন্ত। সে ব্যবস্থা করেছে।

জলভরা পীপে কাঁধে নিয়ে ফিরে বাজার এলাকায় এল। এবার পাহারাদার দুজনের নজরে পড়ল। শাঙ্কো লক্ষ্য করল সেটা। চাপা স্বরে বলল—জোরে পা চালাও। তিনজনেই পীপে কাঁধে প্রায় ছুটে চলল। সমুদ্রতীরে পৌঁছোলোও। নৌকোয় পীপে তিনটে তুললও। টেনে নিয়ে নৌকো নামাচ্ছে তখনই পাহারাদাররা তরোয়াল তুলে ছুটে এল। শাঙ্কো বলে উঠল—তোমরা নৌকো চালাও। আমি সাঁতরে যাবো। কিন্তু তার আগেই একজন পাহারাদার শাঙ্কোর গায়ে তরোয়ালের ঘা বসাল। শাঙ্কোর আর জলে নামা হল না। ও বালির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জামার ভেতর থেকে ছোরা বের করল। এক ঝট্‌কায় সরে এসে সেই পাহারাদারেরা হাতে ছোরা বসিয়ে দিল। তরোয়াল ফেলে পাহারাদারটি বালির ওপর বসে পড়ল। অন্য পাহারাদারটি তখন সতর্ক হয়ে গেছে। সে তরোয়ালের ডগাটা শাঙ্কোর বুকের ওপর ঠেকিয়েছে। শাঙ্কো দ্রুত ওর ছোরাটা ওদের নৌকোর ওপর ছুঁড়ে দিল। ছোরা নৌকোর গলুইয়ের মধ্যে পড়ল। শাঙ্কো আর এক পাহারাদার দু'জনেই আহত। অক্ষত পাহারাদারটি শাঙ্কোকে বাজারের দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। আহত শাঙ্কো কোন কথা না বলে চলল। ওর পেছনে অক্ষত পাহারাদারটি চলল। আহত পাহারাদারও চলল।

বাজারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় অনেক লোক ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। পাহারাদাররা একটা বড় বাড়ির সামনে শাঙ্কোকে নিয়ে এল। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। ছাউনি লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস আর কাঠের। কাঠ সব এবড়োখেবড়ো। লম্বা বারান্দা পাথরের। শাঙ্কো দেখল আরও কয়েকজন পাহারাদার বারান্দায় কোমরে মোটা কাপড়ের ফেট্টিতে তরোয়াল গুঁজে বসে আছে। গত কয়েকদিন খাদ্য জল জোটে নি। শরীর এমনিতেই দুর্বল। তার ওপর পিঠ দিয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে। শাঙ্কো বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। একটাই আশা—বন্দী যখন করেছে খাদ্য জল তো খেতে দেবে। তখন যদি শরীরে কিছু জোর পায়।

এবড়ো-খেবড়ো কাঠের দরজায় একজন পাহারাদার হাত ঠুকে শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। বেশ লম্বা একজন বয়স্ক লোক দরজা খুলে দাঁড়াল। পাহারাদার মাথা একটু নিচু করে নিয়ে অনর্গল কিছু বলে গেল। আহত পাহারাদারকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। শাঙ্কো বুঝল ওর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা বলল।

লম্বা লোকটি শাঙ্কোকে ভেতরে নিয়ে আসার ইঙ্গিত করল। পাহারাদার শাঙ্কোকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। ঘরের অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে আসতে শাঙ্কো দেখল ঘরে একটা পাথর আর কাঠের তৈরি চৌকি মত। তাতে মোটা চাদর কাপড়চোপড় পাতা। লম্বা লোকটি বিছানায় গিয়ে বসল। শাঙ্কো বুঝল এই লোকটি এদের সর্দার। সর্দার স্পেনীয় ভাষায় ভাঙা ভাঙা শব্দ জুড়ে বলল—এখানে—এসেছো—কারণ?

—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। জাহাজ চড়ে এখানে এসেছি। জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। আমাদের জাহাজে খাদ্য আর জল ফুরিয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন আগে। আমরা এখানে আটাময়দা চিনি জল নিতে নেমেছিলাম। আপনার পাহারাদার—এই দেখুন—কথা থামিয়ে শাঙ্কো পিঠ দেখাল। তখনও কাটা জায়গা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল। শাঙ্কো বলল—আপনার পাহারাদারই প্রথমে তরোয়াল চালিয়েছিল। তারপরে আমি—। শাঙ্কোকে থামিয়ে দিয়ে সর্দার বলে উঠল—তোমরা দস্যু—। আগে—এসেছিলে—স্ত্রীপুরুষ ধরে—নিয়ে গেছো—ক্রীতদাস।

—না—আমরা দস্যু নই। শাঙ্কো বেশ জোর দিয়ে বলল। সর্দার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না। শাঙ্কো তবুও তারা যে দস্যু নয় এটা বোঝাবার জন্যে অনেক কথা বল। কিন্তু সর্দারের এক কথা।

শাঙ্কো বুঝল সর্দারকে বোঝানো যাবে না। ওর এক গোঁ। কারা কবে এখানকার স্ত্রীপুরুষ জাহাজে তুলে নিয়ে পালিয়েছে সেই অভিজ্ঞতা সর্দার ভুলতে পারছে না। শাঙ্কো বলেছে—আমি একা আপনাদের কী ক্ষতি করতে পারবো?

— তোমার—দল—আসবে—ক্ষতি করবে। সর্দার বলল।

—আমার বন্ধুরা এখানে আসবে না। খাদ্য জলের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। আমি গেলেই বন্ধুরা জাহাজ ছেড়ে দেবে।

—বিশ্বাস নেই—বন্দী—। সর্দার পাহারাদারদের ইঙ্গিত করল। দু'জন পাহারাদার ঘরে ঢুকল। শাঙ্কোকে ঠেলে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ছোট ঘর। মেঝেয় মোটা কাপড় পাতা। তার নিচে শুকনো ঘাস বিছোনো। ওপাশের দেয়ালে উঁচুতে একটা জানালামত। তাতে গাছের ডাল কেটে বসানো। ঘরে দু'জন বন্দী রয়েছে। একজন শুয়ে আছে। অন্যজন বসে আছে।

পাহারাদার দরজা বন্ধ করে দিল। কয়েদঘর নয়। তবে কয়েদঘরের মত ব্যবহার করা হয়। যে শুয়েছিল সে উঠে বসল। শাঙ্কো কোন কথা বলল না। বলে লাভ নেই। বন্দীরা বুঝবে না।

শাঙ্কো কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। চিৎ হয়ে শোওয়ার উপায় নেই। পিঠে ক্ষত। ও ভাবল—প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে। পিঠের ক্ষতের চিকিৎসা এখানে হবে না। সর্দারকে বলে লাভ নেই। ওষুধ না পড়লে দিন কয়েকের মধ্যেই ক্ষত বিষিয়ে উঠতে পারে। বেঘোরে মারা যেতে হবে। তার আগেই পালাতে হবে। একে বেশ কয়েকদিন খাবার জোটেনি। শুধু ঝর্ণার জল খেয়ে আছে। তার ওপর পিঠে ক্ষতের যন্ত্রণা। শাঙ্কো খুব কাহিল হয়ে পড়ল।

দুপুরে দড়াম্ করে দরজা খুলে গেল। একজন পাহারাদার মাটির হাঁড়িতে খাবার নিয়ে ঢুকল। বন্দীদের খেতে দিল। অন্য পাহারাদারটি খোলা তরোয়াল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষুধার্ত শাঙ্কো খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। পোড়া গোল রুটি আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। রুটি দিয়েছে চারটে। শাঙ্কো গোগ্রাসে গিলল। রুটি শেষ। শাঙ্কো ইশারায় আরো দুটো রুটি চাইল। পাহারাদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তরোয়াল হাতে অন্যজন দরজায় দাঁড়িয়েই রইল। পাহারাদার আরও দু'টো রুটি নিয়ে এল। শাঙ্কো খেল। ক্ষুধা মিটল। ও ইঙ্গিতে জল খেতে চাইল। পাহারাদার ইঙ্গিতে ঘরের কোনার দিকটা দেখাল। শাঙ্কো উঠে এল। দেখল একটা কাঠের গামলামত। তাতে জল। একটা কাঠের গ্লাস ভাসছে। ও গ্লাস তুলে পরপর চার গ্লাশ জল খেল। বন্দী দু'জনও খাবার খেয়ে জল খেল। পাহারাদার দু'জন দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

শাঙ্কো কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা শাঙ্কোর কোন কথাই বুঝল না। হাল ছেড়ে দিয়ে শাঙ্কো জানলার দিকে তাকাল। ঈস্-যদি ছোরাটা থাকত! ঐ ডালগুলো অনায়াসে কাটা যেত। তারপর ফোকর গলে বেরিয়ে পালানো যেত। কিন্তু সঙ্গে ছোরাটাই তো নেই।

শাঙ্কো জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে বুঝল বিকেল হয়ে এসেছে। ও পালাবার ছক কষতে লাগল।

হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল। শাঙ্কো দেখল ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঢুকছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে বসল। বলে উঠল—ফ্রান্সিস। তুমি ধরা দিতে গেলে কেন? ফ্রান্সিস বিছানায় বসতে বসতে মৃদু হেসে বলল—আহত তুমি এখানে পড়ে থাকবে আর আমি খাবো ঘুমুবো? এটা হয়?

—কিন্তু দুজনেই বন্দী হয়ে গেলাম যে। শাঙ্কো বলল।

—তাতে পালাবার সুবিধেই হবে। যাক গে—খেয়েছো তো? কয়েকদিন তো কিছুই খাও নি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ খেতে দিয়েছে। এখন অনেকটাই ভালো আছি। শাঙ্কো বলল।

—দু'পায়ে জোর পাচ্ছো? ফ্রান্সিস বলল।

—অনেকটা। শাঙ্কো ঘাড় কাত করে বলল।

—তাহলে ছুটে পালাতে পারবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা খেয়েছে তো? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। তোমার উপস্থিতবুদ্ধি আটাময়দার বস্তা জল বাঁচিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—পালাবার ছক কিছু ভেবেছো? শাঙ্কো বলল।

—খাবার দিতে ক'জন পাহারাদার আসে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—দু'জন। শাঙ্কো বলল।

—তরোয়াল থাকে কারো হাতে? ফ্রান্সিস আবার জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। একজন খাবার দিতে ঘরের মধ্যে আসে। অন্যজন খোলা তরোয়াল হাতে দরজায় পাহারা দেয়। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—ছক কষা হয়ে গেছে।

—বলো কি? তাহলে খাবার দেবার সময়ই পালাবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। যে খাবার দিতে আসবে তাকে দরজার ধাক্কায় ফেলে দেবে। তরোয়ালওয়ালাকে আমি সামলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার ছক কাজে লাগবে? শাঙ্কো বলল।

—সেটা নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি আমরা কাজ সারতে পারি তার ওপর। খাবার দেবার সময় তৈরি থেকো। ফ্রান্সিস বলল।

বন্দী দুজন ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর কথা শুনছিল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—এদের সঙ্গে কথা বলেছো?

—বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই বোঝাতে পারিনি। শাঙ্কো বলল।

—দরকার নেই। এদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। রাত বাড়তে লাগল। কখন খাবার দিতে আসে তার জন্য ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় দড়াম্ করে দরজা খুলে গেল। একজন পাহারাদার পাতায় রাখা খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। আকারে ইঙ্গিতে বোঝাল ও সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে। ও যেন খাবার রেখে দেয়।

ফ্রান্সিস দরজা দিয়ে বেরুতে অন্য পাহারাদারটি ওর পেছনে পেছনে তরোয়াল হাতে চলল। ফ্রান্সিস দেখল—সর্দার বিছানায় শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল—একটু উঠুন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলবো। সর্দার বিছানা থেকে উঠে বসল। বিরক্তির সঙ্গে বলল—কী? ফ্রান্সিস ইনিয়ে বিনিয়ে একই কথা

বলতে লাগল—আমাদের মুক্তি দিন। কথা বলার সময় ফ্রান্সিস আড়চোখে দেখল বাইরের বারান্দায় দুজন পাহারাদার রয়েছে। তরোয়াল কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো তৈরিই ছিল। খাবার দিয়েছিল যে পাহারাদারটি সে তখন দরজার কাছে এসেছে। শাঙ্কো দ্রুত হাতে খাবারের পাতা ছুঁড়ে দিল পাহারাদারের মুখে। সে মুখ নিচু করল। তখনই শাঙ্কো দরজার পাল্লা ধাক্কা দিল পাহারাদারের পিঠে। দরজার ধাক্কায় পাহারাদার ঘরের মেঝেয় উবুড় হয়ে পড়ল। দরজার ধাক্কায় পাহারাদারের পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে তরোয়াল হাতে পাহারাদারটি ঘরের দিকে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস এই সুযোগটাই চাইছিল। ও ছুটে এসে পাহারাদারটিকে এক ধাক্কায় ঘরের মেঝেয় ফেলে দিল। পাহারাদারের হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল তরোয়ালটা কোনায় জলের জায়গার কাছে পড়েছে। ফ্রান্সিস এক লাফে সেখানে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিয়ে ছুটে বাইরের ঘরে চলে এল। সর্দারের বুকে তরোয়ালের ডগাটা ঠেকিয়ে বলল—উঠে দাঁড়ান। সর্দার তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। এভাবে আক্রান্ত হবে স্বপ্নেও ভাবে নি। সর্দার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

ওদিকে এখানকার শব্দ শুনে বারান্দা থেকে দুই পাহারাদার তরোয়াল হাতে ছুটে বাইরের ঘরে ঢুকল। দেখল সর্দারের বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই হতবাক। সর্দারের জীবন বিপন্ন। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা এক টান দিল। সর্দারের বুকের কাছে পোশাক কেটে গেল। দেখা গেল চিরে গিয়ে বুক থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

পাহারাদাররা ফ্রান্সিসকে বাধা দিতে সাহস পেল না। ফ্রান্সিস গম্ভীর গলায় বলল—সর্দার আমাদের জাহাজে তুলে দেবেন চলুন।

—না—না। সর্দার বলে উঠল।

—তাহলে মরবেন। কথাটা বলে ফ্রান্সিস তরোয়ালের চাপ বাড়াল। সর্দার আর আপত্তি করতে সাহস পেল না।

—চলুন। ফ্রান্সিস তাড়া দিল।

সর্দার আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় এল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার পাহারাদারদের এখান থেকে চলে যেতে বলুন। সর্দার গলা চড়িয়ে কী বলল। পাহারাদার দুজন উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল।

ওদিকে দুই বন্দী দরজা খোলা পেয়ে এক ছুটে বাইরে চলে এল। তারপর ছুটল পাহাড়টার দিকে।

সামনে সর্দার। পেছনে সর্দারের পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস। পেছনে শাঙ্কো। তিনজনে চলল জাহাজঘাটের দিকে।

বাজার এলাকা জনহীন। রাস্তা দিয়ে তিনজন চলল। জোৎস্না অনুজ্জ্বল হলেও চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

তিনজনে জাহাজঘাটে পৌঁছল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল দূরে

পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা সমুদ্রতীরে জলের কাছে এল। হঠাৎ অনুচ্চস্বরে ফ্রান্সিস বলে উঠল—শাঙ্কো—সাঁতরে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্ষতস্থানে নোনা জল লাগতে ভীষণ জ্বালা করে উঠল। ওর মুখ থেকে কাতর ধ্বনি উঠল—আঁ। ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী হল?

—কিছু না। এসো। শাঙ্কো জাহাজের দিকে সাঁতরাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস তরোয়ালটা দাঁতে চেপে ধরে জলে ঝাঁপ দিল। তারপর জাহাজের দিকে সাঁতরে চলল।

ওদিকে বেশ কিছু বন্ধু এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের দেখছিল। সিনাত্রা দ্রুত হালের দিকে গেল। দড়ির মইটা খুলে নামিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো মই বেয়ে বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বিস্কো—নোঙর তোল। কয়েকজন দাঁড়ঘরে যাও। পাল খুলে দাও। আমরা এখান থেকে চলে যাবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নোঙর তোলা হল পাল খোলা হল। দাঁড় বাওয়া শুরু হল। জাহাজ মাঝসমুদ্রের দিকে চলল।

ফ্রান্সিস তাকিয়ে দেখল সর্দার বালিয়াড়িতে বসে আছে। তাকে ঘিরে পাহারাদারদের ভিড়। ওরা অসহায় দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে।

জাহাজ চলল মাঝসমুদ্রের দিকে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। খুশির হাওয়া ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে। ডেক-এ ছক্কাপাঞ্জা খেলছে দল বেঁধে।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস এল জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে। বলল—দিক ঠিক রাখতে পারছো?

—চেষ্টা করছি। রাতে আকাশে মেঘ জমলেই প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ি। ফ্রেজার বলল।

—তার মানে ধ্রুবতারাটা দেখতে পাও না। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—হ্যাঁ। তখন কতকটা আন্দাজেই জাহাজ চালাতে হয়। ফ্রেজার বলল।

—অগত্যা তাই করো। এখনও তো ডাঙার দেখা পেলাম না। কাজেই বুঝতে পারছি না কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। জাহাজ তো চলুক। ফ্রেজার বলল।

ভাইকিংরা জেনেছে জাহাজ ওদের দেশের দিকেই চলেছে। সংবাদটা আনন্দের। তাই শাঙ্কো ছক্কাপাঞ্জা খেলার আসর ছেড়ে এসে গলা চড়িয়ে বলল—রাতের খাওয়া সেরে ডেক-এ এসে নাচগানের আসর বসাও। প্রায় সব বন্ধুরা হৈহৈ করে শাঙ্কোর কথা সমর্থন করল।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বরাবরের মত মারিয়া ডেক-এ এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। শাঙ্কো মারিয়ার কাছে এল। বলল—রাজকুমারী আমরা

ঠিক করেছি আজ রাতে ডেক-এ নাচগানের আসর বসাবো। আপনি থাকবেন।

---নিশ্চয়ই থাকবো। সবাই আনন্দ করবে আর আমি থাকবো না? মারিয়া হেসে বলল।

—খুব খুশি হলাম। শাঙ্কো হেসে বলল। সবাই রাতের নাচগানের আসরের কথা জানল। ফ্রান্সিসও জানল। কিন্তু ওর মন থেকে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। জাহাজ কোথায় চলেছে? দিক ঠিক আছে কিনা। দিনে রাতে বার কয়েক ফ্রেজারের কাছে আসে। জানতে চায় জাহাজ ঠিক উত্তরমুখো যাচ্ছে কিনা। ফ্রেজার খুব নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারছে না ঠিক কোনদিকে জাহাজ চলেছে। এই সংশয়ের কথা ফ্রান্সিস অবশ্য বন্ধুদের বলে না। এসব জানলে বন্ধুদের মধ্যে হতাশা আসবে। সেটা এই অবস্থায় বিপজ্জনক। তাই ফ্রেজারকে মৃদুস্বরে বলে—

—এসব কথা বন্ধুরা কেউ যেন না জানে।

---ঠিক আছে। এই নিয়ে তুমি ভেবো না। জাহাজে এখন খাদ্য জলের অভাব নেই। কাজেই বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। ফ্রেজার বলল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল। ভাইকিংরা সবাই ডেক-এ উঠল। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। ফ্রান্সিস আর মারিয়াও মাস্তুলের গা ঘেঁষে বসল। মাঝখানে গোল জায়গা রেখে সবাই গোল হয়ে বসল। শাঙ্কো কোত্থেকে একটা খালি পিপে নিয়ে এল। টম্ টম্ শব্দে খালি পিপে পিটিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল---গান শুরু হোক। ফ্রান্সিস হেসে জোরে বলল—সিনাত্রা-গান শোনাও। কয়েকজন বন্ধু সেনাত্রাকে ঠেলাদিয়ে বলল—যাও—গান শোনাও।

সিনাত্রা হাসল। তারপর উঠে গিয়ে গোল জায়গাটায় দাঁড়াল। শুরু করল গান। ওদের দেশের গান। বসন্ত এলে যখন ওদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে নতুন ঘাস গজায় তখন ভেড়াপালকরা ভেড়ার পাল নিয়ে আসে সেই ঘাস খাওয়াতে। তখন ওরা ভেড়ার পাল ছেড়ে দিয়ে ঘাসের ওপর বসে গান গায়—

সবুজঘাসে ঢাকল পাহাড়
দেখে যা রে কেমন বাহার
ফুটলো কলি
জুটলো অলি
এ দেশ তোমার আমার।

সুরেলা গলায় সিনেত্রা গাইতে লাগল ভেড়াপালকদের গান। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। মারিয়া রাজপ্রাসাদে মানুষ হয়েছে। ভেড়াপালকদের গান ও কখনও শোনেনি। তাই গভীর আগ্রহ নিয়ে মারিয়া গানটা শুনতে লাগল। ফ্রান্সিসেরও শুনতে ভালো লাগছিল। কিন্তু বন্ধুদের মন আনন্দের বদলে বিষাদে ছেয়ে গেল। কারণ গান শুনে নিজেদের মাতৃভূমির কথাই বেশি করে মনে পড়ল। সবাই চুপ করে বসে রইল। শাঙ্কো বুঝল সেটা। কোথায় নাচবে হৈ হৈ করবে তা নয় সবার মন ভারাক্রান্ত। গান শেষ হতে শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে পীপে

বাজাতে বাজাতে বলে উঠল—সিনাত্রা বিয়ের গান গাও। আনন্দের উল্লাসের।

সিনাত্রা হেসে বিয়ের চটুল গান ধরল। বর বিয়ে করতে যাওয়ার সময় যে গান গাওয়া হয়। ছন্দে তালে সুরে গান জমে উঠল। শাঙ্কোর পীপের বাজনার তালে তালে কয়েকজন উঠে ডেক-এর ওপর থপ্ থপ থপ্ পা ঠুকে নাচতে আরম্ভ করল।

একটা গান শেষ হতেই সিনাত্রা আর একটা তালের গান ধরল। চলল থপ্ থপ্ থপ্ নাচ। এবার প্রায় সবাই নাচতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াও বাদ গেল না। শুধু বয়েসে বড় ভেন হাসিমুখে নাচ দেখতে লাগল। মারিয়া রাজপ্রাসাদে ঢিমে লয়ে বাজনার সঙ্গে নাচতে অভ্যস্ত। এত দ্রুত তালের নাচ ও কোনদিন নাচে নি। আজকে নাচল। এই নাচে একটা উন্মাদনা আছে। মারিয়া ফ্রান্সিসের সঙ্গে নেচে উপভোগই করছিল নাচটা।

প্রায় দুঘণ্টা নাচ চলল। শেষের দিকে জাহাজ চালক ফ্লেজার কড়ার সঙ্গে হুইল আটকে রেখে নাচে যোগ দিল। নাচগানের শব্দ জ্যোৎস্না ধোওয়া সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় সিনাত্রা গান থামাল। বাজনা নাচ বন্ধ হল। একঘেয়ে জাহাজী জীবনে এই বৈচিত্র্য ভালো লাগল সবার। একমাত্র পেড্রো এই আসরের মজা থেকে বঞ্চিত হল। ওকে তো নজরদারি চালাতে হয়। এর পরে কয়েকদিন পরপরই রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ডেক-এ নাচগানের আসর বসতে লাগল। এই আনন্দঘন সময় সবাই উপভোগ করতে লাগল। ফ্রান্সিস এই ব্যাপারে উৎসাহই দিল। ওরা আনন্দে থাকুক এটাই ফ্রান্সিস চাইছিল।

দিন কুড়ি কাটল। জাহাজ দ্রুতই চলেছে। তবে ডাঙার দেখা নেই। ফ্রান্সিস একটু চিন্তায় পড়ে। কিন্তু উপায় নেই। ডাঙার দেখা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।

পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় বসে চারদিক নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। তার জন্যে পেড্রোকে রাতেও জাগতে হচ্ছে।

দিনরাত জাহাজ চলেছে। ডাঙার দেখা নেই। এই নিয়ে ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন হয়। তবে ফ্রান্সিসের ওপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। ফ্রান্সিসের চিন্তা হয়। এতগুলো মানুষের জীবনের দায়িত্ব তো ওর কাঁধেই। বন্ধুরা হৈ হৈ করে। আনন্দ করে। নাচগানের আসর বসায়। আর ফ্রান্সিস থাকে নিজের চিন্তা নিয়ে। হ্যারি সান্ত্বনা দেয়—খাদ্য আছে জল আছে। চলুক না জাহাজ। ডাঙার দেখা পাবই।

দিন পনেরো পরে ডাঙার দেখা মিলল। মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রোর চিৎকার শোনা গেল—ভাইসব—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি ডেক-এই ছিল। গলা চড়িয়ে বলল—কোনদিকে?

—ডানদিকে। পেড্রো গলা চড়িয়ে বলে। কয়েকজন ভাইকিং পেড্রোর কথা শুনল। ওরা রেলিং ধরে দাঁড়াল। ডানদিকে তাকাল। দেখল জঙ্গল। জঙ্গল ঘন না ছাড়া ছাড়া গাছগাছালির সেটা বুঝল না।

হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে ডেকে আনল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মারিয়াও এল।

জাহাজটা ততক্ষণে জঙ্গলের অনেক কাছাকাছি এসেছে। বোঝা গেল জঙ্গলটা মোটামুটি ঘনই। বড় বড় গাছের জঙ্গল। বালিয়াড়ির পরেই জঙ্গলের শুরু। এখান থেকে সমুদ্র অনেকটা গভীর। সেটা বোঝা গেল জাহাজটা যখন তীরভূমির কাছাকাছি এল।

ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—

—কী মনে হয় তোমার। জাহাজ তীরে ভেড়ানো যাবে?

—তা যাবে। জলে গভীরতা আছে। ফ্রেজার বলল।

—তাহলে জাহাজ তীরে ভেড়াও। ফ্রান্সিস বলল।

—কী ভাবছো ফ্রান্সিস। এখানে নামবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। জাহাজঘাটটা ছোট। কোন জাহাজও নোঙর করা নেই। তবে বোঝা যাচ্ছে জাহাজঘাট হিসেবেই এটা ব্যবহার করা হয়।

—লোকজন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল।

—নেমে দেখতে হবে। হয়তো জঙ্গলের ওপারে বসত আছে। সেখানে গিয়েই খোঁজ করতে হবে। জানতে তো হবে কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন তো বিকেল হয়ে এসেছে। এখনই নামবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। দিনে দিনেই খোঁজখবর নেওয়া ভাল। রাতে কিছু করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রেজারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—জাহাজ তীরে ভেড়াও।

ফ্রেজার আস্তে আস্তে জাহাজ তীরে ভেড়াল। শাঙ্কো আর বিস্কো মিলে পাটাতন ফেলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর সিনাত্রাকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। শাঙ্কো বলল—তাহলে এখনই নামবে?

—হ্যাঁ। একটু পরেই নামবো। দেরি করবো না। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো আর সিনাত্রা তৈরি হয়ে এল। তিনজনে পাটাতনের দিকে এগোল। হ্যারি মারিয়া আর অন্য কয়েকজন বন্ধু রেলিং ধরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরা তরোয়াল নিল না।

ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটায় নেমে দেখল একটা রাস্তামত বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। তার মানে এই পথে লোক চলাচল করে। কাজেই নিশ্চয়ই বনের পরে লোকবসতি আছে।

তিনজনে বনের পথ ধরে পশ্চিমমুখো হাঁটতে লাগল। রাস্তার দুপাশে ঘন বন। এখানে ওখানে ভাঙা রোদ পড়েছে। তবে বনতল অন্ধকারই।

ওরা কিছুটা এগিয়েছে। হঠাৎ শুকনো পাতা ভাঙার জোর শব্দ। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—পালাও। ওরা ঘুরে দঁড়াতে যাবে তখনই হঠাৎ দেখল প্রায় অন্ধকারে পথের ওপর দাঁড়িয়ে তিনজন লোক। হাতে উদ্যত বর্শা। বনের অন্ধকারে মোটামুটি দেখা গেল ওদের পরনে মোটা কাপড়ের আঁটোসাটো পোশাক। গায়ের রং কালো। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—পেছনে ছোটো।

ঘুরে দাঁড়িয়েই ওরা দেখল আরো তিনচারজন কালো মানুষ উদ্যত বর্শা হাতে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসদের পালানো হল না। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কোনরকম বাধা দিও না। আমাদের নিয়ে কী করে দেখি।

রাস্তার দু'দিক থেকে দু'দল যোদ্ধা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। একজন মোটামত যোদ্ধা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের সামনের দিকে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। সবাই বনপথ দিয়ে চলল। সামনে তিনজন। পেছনে চারজন। সবার হাতেই লম্বা ডাল কেটে তৈরি ছুঁচোলো মুখ লোহা বাঁধানো বর্শা। সবাই চলল। বন শেষ। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ফ্রান্সিস দেখল বাঁদিকে শুকনো লম্বা লম্বা ঘাস ঢাকা হল দূরবিস্তৃত। সম্মুখে বাড়িঘর দোর। ঘরগুলো ছাউনি ঘাসের। দেয়াল মাটি পাথরের। বসতি এলাকা। বাড়িঘরের মধ্যে বাইরে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ের ওরা অনেকেই বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখছিল।

বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল একটা বেশ বড় উঠোনমত। উঠোনের মাঝখানে একটা খুঁটির মত আস্ত একটা শুকনো গাছ পোঁতা। ঐ পরিষ্কার উঠোন ঘিরেই বাড়িঘর।

সামনেই একটা বড় ঘর। তার মাটির বালিপাথরে তৈরি বারান্দায় একটা কাঠের আসনে বসে আছে এক যুবক। মাথায় লম্বা চুল পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। গায়ের রং তামাটে। পরনে আঁটো সাটো মোটা কাপড়ের পোশাক। কাঠের গ্লাস করে কিছু খাচ্ছে। টকটকে লাল চোখ ক্রুর দৃষ্টি। তার সামনে এসে ফ্রান্সিসদের দাঁড় করানো হল। মোটা যোদ্ধাটি মাথা একটু নুইয়ে এক নাগাড়ে কিছু বলে গেল। বোঝাই গেল ফ্রান্সিসদের বন্দী করার ঘটনা বলল। আরো বোঝা গেল যুবকটি এখানকার সর্দার।

যুবক সর্দার এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—কে তোমরা?

—আমরা বিদেশী। য়ুরোপ থেকে জাহাজ চড়ে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কীভাবে? সর্দার জানতে চাইল।

—জাহাজে চড়ে। ফ্রান্সিস বলল।

সর্দার একটু চুপ করে থেকে গ্লাসের পানীয় সবটা খেয়ে গ্লাসটা পাশে রাখল। তারপর সরাসরি বলে বসল—না—তোমরা—রাজা প্রোফেনের—গুপ্তচর—আমাদের যোদ্ধা—সংখ্যা—খবর।

—আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন। রাজা প্রোফেন নামে কাউকে আমরা চিনি না। কোথায় তার রাজত্ব তাও জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস—নেই। বন্দী—হত্যা। সর্দার বলল।

ফ্রান্সিস ভীষনভাবে চমকে উঠল। বুঝল চরম বিপদের মুখে ওরা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের কেন হত্যা করবেন? কী অপরাধ করেছি আমরা?

—রাজা প্রোফেনের গুপ্তচর—রাতে—দেখবে—শাস্তি।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা প্রোফেনের যোদ্ধাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে ওদের

মুক্তি নেই। পরে ওদেরও শাস্তি দেওয়া হবে। আজ রাতেই ঐ যোদ্ধাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কীরকম শাস্তি সেটা দেখে বোঝা যাবে ওদেরও ভাগ্যে কীরকম শাস্তি জুটবে। সর্দার বলছে—হত্যা। ওদেরও হত্যা করা হবে। এই চিন্তাটাই ফ্রান্সিসকে উদ্বিগ্ন করল। ফ্রান্সিস অবার বলল—আমাদের শাস্তি দেওয়া হবে কেন? আমরা তো আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি।

—কথা নয়—যাও—বন্দী। সর্দার গম্ভীরস্বরে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই সর্দারের মনে কোন দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। নরহত্যা এর কাছে কোন অন্যায়ই নয়। ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধ হল। চিৎকার করে বলে উঠল—আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করলে আপনিও রেহাই পাবেন না। সর্দার এক লাফে উঠে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে কী বলে উঠল। যোদ্ধারা ছুটে এসে তিনজনের পিঠে বর্শা খোঁচা দিয়ে হাঁটতে ইঙ্গিত করল। তিনজনকে নিয়ে যোদ্ধারা উঠোনের মাঝখানে লম্বা খুঁটির কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল দু'জন বন্দীকে খুঁটির সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়েছে। শক্ত বুনো লতা দিয়ে ফ্রান্সিসদেরও খুঁটর সঙ্গে বাঁধা হল। পা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হল। বাঁধা হাত আর খুঁটির সঙ্গে বাধা হল না। একজন যোদ্ধা ওদের সামনে পাহারায় রইল। অন্য যোদ্ধারা চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—যে করেই হোক পালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—ছক কষেছি। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—তুমি মাথা গরম করে ফেললে—শাঙ্কো অনুযোগের সুরে বলল।

—কোন কারন নেই—আমাদের হত্যা করা হবে? এসব শুনলে কারো মাথার ঠিক থাকে। ফ্রান্সিস বলল। বেশ ভয়ার্তস্বরে সিনাত্রা বলল—তাহলে আমরা আর বাঁচবো না?

—নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবো সিনাত্রা। ইচ্ছে করলে তুমি এখন গান গাইতে পারো।

—কী পাগলের মত কথা বলছো? মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে—

—অত সহজে ফ্রান্সিস মৃত্যু মেনে নেয় না। শুধু সময় সুযোগের অপেক্ষা। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যি কি সর্দার আমাদের মেরে ফেলবে? সিনাত্রা বলল।

—ওর চোখের দৃষ্টিই বলছে। ও নরঘাতক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লে—সিনাত্রা বলতে গেল। ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—

—ভয় পেওনা। মনে সাহস রাখো। সাহস হারিও না।

তারপর ওরা আর কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস পালানোর উপায় ভেবে চলল। শাঙ্কোর কেমন মনে হল বন্দী দু'জন নিশ্চয়ই রাজা প্রোফেনের যোদ্ধা। ধরা পড়ে এখন শাস্তির মুখে। শাঙ্কো নিশ্চিত হতে বলল—ভাই তোমরা কি রাজা প্রোফেনের দেশের যোদ্ধা? শাঙ্কোর সব কথা ওরা বুঝল না। কিন্তু রাজা প্রোফেন শুনে একজন মাথা ওঠা নামা করল। শাঙ্কো বুঝল ওর অনুমান ঠিক। এবার শাঙ্কো বলল—তোমাদের দেশ কোনদিকে? বার কয়েক বলার পর ওরা

বুঝল। একজন দু'হাত তুলে শুকনো ঘাসের বনের দিকে দেখাল। ফ্রান্সিস এসব দেখছিল। বুঝল ঐ ঘাসের বনেরও পাশেই রাজা প্রোফেনের রাজত্ব। সন্দেহ নেই এই সর্দার রাজা প্রোফেনের শত্রু।

সন্ধ্যে হয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দেখল যোদ্ধারা জঙ্গল থেকে শুকনো গাছডাল নিয়ে আসছে। আর একদল বড় বড় আঁটি বেঁধে শুকনো ঘাস নিয়ে আসছে। উঠোনের ওপাশে একটা গাছের নীচে সব জড়ো করছে। ঘাস ডালপাতার স্তূপ গাছটার নিচে কাণ্ডের চারিদিকে জড়ো করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ উঁচু হয়ে গেল শুকনো ঘাস, গাছ ডালের স্তূপ। সিনাত্রা এসব দেখে বলল—এরা বোধহয় আগুন জ্বেলে নাচ গান করবে। শুধু ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—সিনাত্রা এখন এই সর্দারকে চেনোনি। শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে।

—বলো কি! শাঙ্কো বলে উঠল—তার মানে এই বন্দী দু'জনকে—ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ পুড়িয়ে মারা হবে।

—কী সাংঘাতিক! সিনাত্রা আঁৎকে উঠল।

—এর আগেও কতজনকে এভাবে শাস্তি দিয়েছে কে জানে। কাজেই এই সর্দারের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। শুধু ভাবছি যা সন্দেহ করছি তা ঘটে কি না। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল।

সন্ধ্যের পরেই ফ্রান্সিসদের, বন্দীদের খেতে দেওয়া হল। গোল গোল পাতায় পোড়া পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল।

একটু রাত হতেই সব নারীপুরুষ খেয়ে নিল। উঠোনে এসে সবাই জড়ো হতে লাগল। গাছটা ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল।

এবার বন্দী দুজনকে যোদ্ধারা বন্দী পায়ের বাঁধন খুলে গাছটার দিকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস যা আশঙ্কা করছিল তাই ঘটতে চলল। বন্দী দু'জনকে সেই কাঠের স্তূপের ওপরে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হল। বুনো লতা দিয়ে গাছের সঙ্গে তাদের বেঁধে দেওয়া হল। উপস্থিত লোকজনরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। বন্দী দু'জনে যোদ্ধাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ওদের হাত এড়াতে পারল না। দু'জনে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

তখনই সর্দার ডানপাশের একটা বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যোদ্ধা কয়েকজন সর্দারের কাঠের আসনটা পেতে দিল। সর্দার গ্লাসে নেশার তরল পদার্থ নিয়ে আসনে বসল। যোদ্ধারা সর্দারের নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল। একসময় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সর্দার ডানহাত উঁচু করল। একজন যোদ্ধা চকমকি পাথর ঠুকে গাছের নীচে শুকনো ঘাসে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আগুন দ্রুত জ্বলে উঠে ছড়িয়ে গেল। শুকনো কাঠে আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। বন্দী দু'জনকে আগুন আচিরেই স্পর্শ করল। বন্দী দু'জন উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে দেখতে পারল না। মুখ নিচু করে চুপ করে বসে রইল। মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনতে শুনতে ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। শাঙ্কো সিনাত্রাও

মুখ নিচু করে বসে রইল। ওদিকে জড়ো হওয়া মানুষের মধ্যে উল্লাসের ধ্বনি উঠল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কী নিষ্ঠুর এই মানুষেরা। বোঝাই যাচ্ছে এখানকার মানুষেরা এরকম দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত।

শাস্তি শেষ। ভোর হয়ে এল। সর্দার নিজের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়ল। লোকজন নিজেদের ঘরে ফিরে গেল।

সেদিন দুপুরে দু'জন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের খাবার দিতে এল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বলল—আমি খাব না। যোদ্ধা দু'জন অবাক। বার বার খাবারের পাতা এগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস সরিয়ে দিল। শাঙ্কো আর সিনাত্রাও মাথা নেড়ে খেতে অস্বীকার করল। যোদ্ধারা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ওরা খাবার নিয়ে ফিরে গেল। বোধহয় সর্দারকে গিয়ে সেকথা বলল।

কিছু পরে সর্দার এল। হাত নেড়ে বলল—খাও। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। সর্দার কিছুক্ষণ চাপাচাপি করল। তারপর আর কিছু না বলে চলে গেল। তরপর থেকে ফ্রান্সিস একটি কথাও বলল না।

রাত হল। শাঙ্কো ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ওর দিকে ফিরে তাকাল।

—রাতেও খাবে না। শাঙ্কো জানতে চাইল।

—রাতে খাব। পালাতে গেলে উপবাসী পেটে থাকা চলবে না।

রাতের খাবার যোদ্ধা দু'জন দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল। সারা দিন উপোবাসী থেকে বেশ দূর্বল লাগছিল শরীর। রাতে খেয়ে গায়ে একটু জোর পেল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—একটু ঘুমিয়ে নাও। কয়েদঘরে কখনও কখনও হাত পা বাঁধা অবস্থায় থেকে ঘুমোন ফ্রান্সিসদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তিনজনে ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। ঘুম ভেঙে দেখল একজন পাহারাদার বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে।

তখন শেষ রাত। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোর গলার কাছ দিয়ে বাঁধা দু'হাত ঢোকাল। তারপর আস্তে আস্তে ছোরাটা তুলল। শাঙ্কোর বাঁধা হাতে দিল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের হাতের বাঁধা লতা কাটতে লাগল। একটু সময় লাগল। বুনো লতাটা বেশ শক্ত। ফ্রান্সিসের হাতের লতা কেটে গেল। এবার ছোরাটা নিয়ে শাঙ্কোর হাতের বাঁধন কাটল। শাঙ্কো ছোরা নিল। সিনাত্রার হাতের বাঁধন কাটল। তারপর সকলেই পায়ের বাঁধন কাটল। সিনাত্রা চাপা স্বরে বলে উঠল—সাবাস শাঙ্কো।

তিনজনের খোলা হাত পা নিয়ে একটু বসে রইল। ফ্রান্সিস চোরা দৃষ্টিতে পাহারাদারদের দেখতে লাগল। পাহারাদাররা পায়চারি করছিল। একবার ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে একলাফে পাহারাদারের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। পাহারাদার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে বর্শাটা ছিটকে গেল। ফ্রান্সিস একলাফে গিয়ে বর্শা তুলে নিল। ওদিকে শাঙ্কো হাতের ছোরাটা পাহারাদারের পেটে ঢুকিয়ে দিল। পাহারাদারের মুখে মৃদু

শব্দ উঠল —ওঃ। ততক্ষণে ফ্রান্সিস সর্দারের ঘরের দরজার কাছে ছুটে এসেছে। জোরে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরে মশালের আলোয় দেখল দরজা ভাঙার শব্দে সর্দার বিছানায় উঠে বসেছে। সর্দার আগে বুঝে ওঠার আগে ফ্রান্সিস বর্শাটা সর্দারের বুকে ঢুকিয়ে দিল। সর্দার দু'হাতে বেঁধা বর্শাটা ধরে চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল—আঁ—আঁ—।

ফ্রান্সিস এক লাফে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে উঠল—উত্তর দিকের বনের দিকে ছোটো। তিনজনে ঘাসের বনের দিকে ছুটল। কিন্তু দরজা ভাঙার শব্দে সর্দারের চিৎকারে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। যোদ্ধারা কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। এরা যোদ্ধার জাত। লড়াই করতে অভ্যস্ত। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মূহুর্ত। চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোতে ফ্রান্সিসদের ঘাসবনের দিকে ছুটতে দেখল। বন্দীরা পালাচ্ছে। মুখে থাবড়া দিয়ে উ—উ শব্দ তুলল। আরো যোদ্ধা বর্শা হাতে ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এল। সবাই ছুটল ফ্রান্সিসদের দিকে।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা ঘাসের বনে ঢুকে পড়েছে। ঘাসের উচ্চতা বুক পর্যন্ত। তাও ফ্রান্সিসদের মাথা ঢাকা পড়ল না। ওদের মাথা দেখে যোদ্ধারা বর্শা হাতে ছুটে এল। শুকনো ঘাসের বনে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসদের ধাওয়া করল। ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল। কিন্তু ঘাসের গোড়ায় পা জড়িয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসদের গতি কমে আসতে লাগল। অনেকটা কাছে এসে পড়ল যোদ্ধার দল। ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে দেখল সেটা। ফ্রান্সিস হঠাৎ নিচু হয়ে এক মুঠো ধূলো তুলল। উড়িয়ে দেখল বাতাস দক্ষিণমুখী। অর্থাৎ যেদিক থেকে যোদ্ধারা ছুটো আসছে। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— সিনাত্রা— চকমকি —পাথর লোহা আছে তো।

—কোমরে ফেট্টি তে গোঁজা। সিনাত্রা বলল।

—ঘাসে আগুন লাগাও। জলদি। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা বসে পড়ল। কোমর থেকে চকমকি পাথর লোহা বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে ঠুকতে লাগল। চকমকি পাথর থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে শুকনো ঘাসে লাগল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো ঘাসে আগুন লেগে গেল। উত্তরমুখী হাওয়া। ওদিক থেকে যোদ্ধারা ছুটে আসছিল। আগুনের ধোঁয়া ছুটল যোদ্ধাদের দিকে। যোদ্ধারা মরিয়া হয়ে বর্শা ছুঁড়ল। কিন্তু সে সব বর্শা আগুনের মধ্যে পড়ল। আগুন তখন হাওয়ায় ভর করে ওদের দিকে ছুটে আসছে। ওরা চিৎকার করতে করতে পিছনে ফিরে ছুটল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে তখন ওদের আগুনের ব্যবধান। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাসের বনের বাইরে চলে এসেছে। সামনেই একটা জলাশয় মত। ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জল গভীর নয়। কোমর পর্যন্ত। ওরা জল ঠেলে চলল। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট কিছু বাড়িঘর দেখল। ফ্রান্সিস পেছনে ফিরে দেখল সারা ঘাসের বনে আগুন আর ধোঁয়া। সামনের বাড়িঘর দেখে ফ্রান্সিস বলল—ওটা নিশ্চয়ই রাজা প্রোফেনের রাজত্ব। সর্দারের শত্রু রাজা। ওখানেই আশ্রয় নিতে হবে।

জলাশয়টার মাঝামাঝি এসে ফ্রান্সিস বাঁদিকে তাকাল। অনেক দূরের সমুদ্রের বিস্তার দেখে বুঝল এটা জলাশয় নয়। সমুদ্রের খাঁড়ি। এখানে নিশ্চয়ই জোয়ার ভাঁটা খেলে।

জল ঠেলে এগোতে সময় লাগছিল। ততক্ষণে চাঁদ নিভে গেছে। পূর্বদিকের আকাশে কমলা রং ধরেছে। ফ্রান্সিসরা ওপারে পৌঁছাল। তিনজনই বালির পারে বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস দেখল অনেক বাড়ি ঘরদোর। পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল খাঁড়ি থেকে একটা উঁচু পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড়টার নিচে বিস্তৃত বনভূমি।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল---চলো। দেখি কোথায় এলাম।

শাঙ্কো সিনাত্রা উঠে দাঁড়াল। তিনজনে হেঁটে চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। দু'পাশের বাড়ির পুরুষ স্ত্রী লোক বাচ্চারা বেশ আবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। সবারই বোধহয় জিজ্ঞাসা এই বিদেশীরা কোত্থেকে এল? কার কাছেই বা যাচ্ছে। ফ্রান্সিসরা এসব দেখে অভ্যস্থ। ওরা হেঁটে চলল। বাড়িগুলোর পরেই একটা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। তারপরই একটা বড় বাড়ি। কাঠ পাথর বালি দিয়ে তৈরী বাড়ি। মাথায় শুকনো ঘাসের ছাউনি।

প্রান্তর পার হয়ে বাড়িটার কাছাকাছি আসতে কয়েকজন প্রহরী ছুটে এল। ওদের কোমর বন্ধনীতে তরোয়াল ঝুলছে। শুধু দু'জনের হাতে বর্শা। ওরা এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। কোমরে তরোয়াল ঝোলা একজন এসে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমরা কে? কোথায়?

—এটা কি রাজা প্রোফেনের দেশ?

প্রহরী কোন কথা না বলে মাথা ওঠা নামা করল। তারপর বলল—তোমরা কোত্থেকে এসেছো? ফ্রান্সিস আঙুল তুলে পোড়া ঘাসবন দেখাল।

—ও—এলুডা দেশ থেকে। কোথায় যাবে? প্রহরী জিজ্ঞেস করল।

—এখানেই কোন সরাইখানায় থাকব। কয়েকদিন বিশ্রাম নেব। তারপর চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই ফ্রান্সিস দেখল---বড় ঘরটার পেছন থেকে একজন লোক আসছে। পেছনে আট দশ জন যোদ্ধা। লোকটির পরনে আটসাটো মোটা কাপড়ের পোশাক। কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী। তাতে পেতলের বাটওয়ালা তরোয়াল ঝুলছে। লোকটি প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। লোকটিকে দেখে ফ্রান্সিসের কেমন মনে হল লোকটি এদেশীয় নয়। য়ুরোপীয়। ধাঁধা কাটাতে ফ্রান্সিস প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলে---ঐ লোকটি কে?

---উনি মন্ত্রী স্তিফানো। প্রহরী বলল।

---রাজা প্রোফেনের মন্ত্রী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

---হ্যাঁ।

---আমি ভেবেছিলাম সেনাপতি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। প্রহরী বলল।

স্তিফানো ততক্ষণে তরোয়াল কোষমুক্ত করেছে। যোদ্ধারাও তরোয়াল খুলে স্তিফানোকে ঘিরে দাঁড়াল। শুরু হল তরোয়ালের খেলা। স্তিফানো ঘুরে ঘুরে যোদ্ধাদের তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন যোদ্ধা অল্প আঘাত নিয়ে খেলা থেকে সরে দাঁড়াল। স্তিফানোর অভিজ্ঞ হাতে তরোয়াল চালানো দেখে মৃদুস্বরে ফ্রান্সিস বলল—পোড় খাওয়া লড়িয়ে। তারপর চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো—আমি নিশ্চিত মন্ত্রী স্তিফানো য়ুরোপীয় জলদস্যু।

—বলো কি? শাঙ্কো একটু আবাকই হল। তখন নকল লড়াই চলছে। আরো তিনজন যোদ্ধা লড়াই থেকে সরে দাঁড়াল। এবার ফ্রান্সিস প্রহরিটিকে জিজ্ঞেস করল উনি কি এদেশের লোক?

—না—স্পেন দেশের লোক।

—তাহলে রাজা প্রোফেনের মন্ত্রী বিদেশী। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। উনি নিয়মিত যোদ্ধাদের অস্ত্র শিক্ষা দেন। প্রহরীটি বলল।

—আর সেনাপতি? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—শুধু সেনাপতি নয় রাজা প্রোফেন ও মন্ত্রীমশাইয়ের নির্দেশে চলেন। এখানে মন্ত্রী স্তিফানোর কথাই শেষ কথা। তাঁর ওপরে কথা বলার কেউ নেই। প্রহরী বলল।

নকল লড়াই শেষ। মন্ত্রী স্তিফানো তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। তারপর কোমরে গোঁজা একটা রুমাল বের করে মুখের কপালের ঘাম মুছতে লাগল। প্রহরী ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—

—মন্ত্রী মশাইয়ের কাছে চল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর প্রহরীর পেছন পেছন স্তিফানোর কাছে এল। স্তিফানো ফ্রান্সিসদের দেখে সামান্য চমকাল। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল—তোমরা তো দেখছি বিদেশী।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তোমরা তো জলদস্যুতা কর। স্তিফানো বলল।

—এসব অভিযোগ আমরা এর আগেও শুনেছি। আমরা এসব গায়ে মাখি না। তবু বলি—আমরা জলদস্যু নই। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। তোমরা কোত্থেকে কেন এখানে এলে? স্তিফানো জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস এলুডায় কী ঘটেছে সব বলল।

—হুঁ। এলুডার সর্দার নিজেকে রাজা মনে করতো। দু'দুবার ওরা এদেশে আক্রমণ করেছিল। দু'বারই ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। যাক গে। স্তিফানো প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—এদের রাজসভায় নিয়ে এসো। স্তিফানো চলে গেল।

—যাক—কয়েদঘরের হাত থেকে বাঁচলাম। শাঙ্কো শ্বাস ফেলে বলল।

—এখনই অতটা নিশ্চিত হয়ো না। স্তিফানো খুব ধুরন্ধর পুরুষ। ও বুঝেছে

আমি ওকে সহজেই চিনে ফেলেছি। কাজেই আমাদের মুক্ত রাখবে সে ভরসা কম। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

প্রহরী ওদের চলার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা প্রহরীটির পেছন পেছন চলল। সদর প্রবেশ পথ দিয়ে ওরা রাজবাড়িতে ঢুকল। একটা ছোট দরজা পার হয়ে ওরা রাজসভায় এল। প্রজাদের বেশ ভিড়। রাজা প্রোফেন প্রবীন পুরুষ। মুখে কাঁচা পাকা দাঁড়ি গোঁফ। একটু রোগাটে। মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট। গায়ে মোটা চকচকে কাপড়ের ঢোলা হাতা জামা। রাজাপ্রজাদের দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় কিছু বলছিলেন। সিংহাসনে কাঠের চকচকে কাপড়ের গদি পাতা। সিংহাসনের গায়ে রুপোর গিল্টি। দু'পাশে দুটি আসন। মন্ত্রী স্তিফানো আর সেনাপতি বসে আছে।

রাজা প্রোফেনের বক্তৃতা শেষ হল। প্রজারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। ভিড় কমল।

মন্ত্রী স্তিফানো রাজাকে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিসদের দেখলেন। হাত নেড়ে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এল। রাজা স্পেনীয় ভাষায় কথা বলতে লাগলেন—তোমাদের কথা বলো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে এলুডায় যা ঘটেছে সব বলল। পরে বলল—আপনার রাজত্বে আত্মরক্ষার জন্যে এসেছি। কোন সরাইখানায় আশ্রয় নেব। কয়েকদিন থেকে জাহাজে ফিরে যাব। মন্ত্রী স্তিফানো এবার গলা চড়িয়ে বলল—সব শুনলাম। কিন্তু এদেশের নিয়ম হচ্ছে বিদেশী দেখলেই তাকে বন্দী করা।

—আপনিও তো বিদেশী। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও প্রথমে বন্দী হয়েছিলাম। পরে নিজের যোগ্যতা প্রমান করে মন্ত্রী হয়েছি। স্তিফানো বেশ গর্ব্বের সঙ্গে বলল।

—আমরাও আমাদের যোগ্যতা প্রমান করতে—

—প্রয়োজন নেই। স্তিফানো ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিল। তারপর বলল—তোমাদের কয়েদঘরে ঢোকানো হবে। কথাটা বলে স্তিফানো রাজার মুখের দিকে তাকাল। রাজা আমতা আমতা করে বললেন এখানকার নিয়ম, কী করা যাবে। এখানে এটাই নিয়ম। বোঝা গেল স্তিফানোর ওপর কথা বলার ক্ষমতা রাজার নেই।

—কিন্তু আমাদের অপরাধ? ফ্রান্সিস বলল।

—অপরাধ নিয়ে কোন কথা নেই। বিদেশী হলেই হল। স্তিফানো হাত ঘুরিয়ে বলল—ফ্রান্সিস বুঝল—কয়েদঘরের বাস থেকে মুক্তি নেই। আবার পালাবার উপায় ভাবতে হবে। স্তিফানো প্রহরীদের ইঙ্গিত করল। একজন প্রহরী এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। তিনজন প্রহরী ফ্রান্সিসদের নিয়ে রাজবাড়ির বাইরে এল। ওদের নিয়ে চলল রাজবাড়ির পিছন দিকে।

রাজবাড়ির পূব কোণায় কয়েদঘর। ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই।

একজন প্রহরী কোমরে ঝোলানো চাবির বড় রিং বের করল। কয়েদঘরের তালা খুলল। ঢং ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কয়েদঘরে ঢুকে দেখা গেল মেঝেয় শুকনো ঘাসপাতা ছড়ানো। ফ্রান্সিস বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসতে গিয়ে দেখল এক রোগাটে চেহারার বন্দী দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছে। ততক্ষণে শাঙ্কোর চোখে ঘরের অন্ধকার সয়ে এল। এবার ভালো করে দেখল লোকটাকে। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। শুকনো চোখমুখ।

শাঙ্কো লোকটার কাছে গেল। বলল—ভাই তুমি কতদিন বন্দী হয়ে আছো?

—হিসেব রাখি নি। লোকটি স্পেনীয় ভাষায় বলল। শাঙ্কো বেশ অবাক হল। বলল—তুমি স্পেনদেশী? লোকটি মাথা ওঠানামা করল।

—তোমাকে রাজা প্রোফেন বন্দী করেছেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—রাজা নয়। স্তিফানো—স্তিফানো। আমার সাথী-সঙ্গী। লোকটি বলল।

—তোমার সঙ্গী হয়ে তোমাকে বন্দী করল? অবাক কান্ড। শাঙ্কো বলল।

—স্তিফানোর সব কান্ডই অবাক হওয়ার মত। লোকটি বলল।

—তোমার নাম কী? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সার্ভো। লোকটি বলল।

—মনে হচ্ছে স্তিফানোর ওপরে তোমার বেশ রাগ। শাঙ্কো বলল।

—সব শুনলে বুঝবে স্তিফানো কী সাংঘাতিক লোক। সার্ভো বলল।

—কী ব্যাপার বলো তো। বলছো স্তিফানো তোমার সঙ্গী সাথী আবার বলছো সাংঘাতিক লোক। শাঙ্কো বলল।

—যাক গে। সে সব শুনে কী হবে। তোমরা তো স্তিফানোকে শায়েস্তা করতে পারবে না। সার্ভো কাশতে লাগল। কাশি আর থামে না।

—তুমি তো বেশ অসুস্থ দেখছি। শাঙ্কো বলল।

—বেঁচে আছি এটাই আমার ভাগ্য। তবে স্তিফানো যে কোনদিন আমাকে ফাঁসিতে লটকাতে পারে। আমার সঙ্গী হয়েও আমাকে মেরে ফেলতে ওর হাত কাঁপবে না। সার্ভো বলল।

—কী ভাবে তোমরা সঙ্গী ছিলে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সার্ভো আবার কাশতে লাগল। কাশির শব্দে ফ্রান্সিস বিরক্ত হল। সার্ভোর দিকে তাকিয়ে বলল—এত কাশছো কেন? শরীর ভালো নেই? কাশি থামল। সার্ভো বলল—দিনের পর দিন এই কয়েদঘরে পড়ে থাকলে শরীর সুস্থ থাকে? বোকার মত কথা বলছো। ফ্রান্সিস আর কথা বলল না। বুঝল রোগার্ত মানুষটা বেশিদিন বাঁচবে না।

—ঠিক আছে। সবকিছু খুলে বলো তো। শাঙ্কো বলল।

—সে অনেক কথা। তুমি শুনে কী করবে? সার্ভো বলল।

—কিছু করতে পারি কিনা ভেবে দেখবো। শাঙ্কো বলল।

—আমরা দুজনে ছিলাম এক জাঁদরেল জলদস্যুর দলে। তুমি তো জানো না

একবার জলদস্যুদের দলে ঢুকলে পালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। দস্যু সর্দার তার সঙ্গীদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। নিরীহ নিরস্ত্র জাহাজযাত্রীদের ধনসম্পদ লুঠ করে ভাগ পেতাম। আমাদের সুখে থাকারই কথা। কিন্তু ভয়ও ছিল। য়ুরোপের কোন কোন রাজা দক্ষ সেনাপতির অধীনে সশস্ত্র সৈন্যসহ জাহাজ সমুদ্রে পাঠাতো। জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতো। তারপর ফাঁসি দিতো। এই ভয় ছিল। তাই পালাবার তালে ছিলাম। স্তিফানো ছিল আমার দলের সঙ্গী। এই দেশের কাছ দিয়ে সেই রাতে আমাদের ক্যারাভেল জাহাজ যাচ্ছিল। একদিন গভীর রাতে জাহাজের গায়ে বাঁধা নৌকো খুলে নিয়ে পালালাম। এই দেশে এলাম।

সার্ভো আবার কাশতে লাগল। কাশি থামলে শাঙ্কো বলল—

—তারপর?

—এই দেশে আশ্রয় নিয়ে কিছুদিন সুখেই কাটল। স্তিফানো আমাকে বারবার বোঝালো রাজা প্রোফেন কোনভাবেই যেন জানতে না পারেন যে আমরা জলদস্যু ছিলাম। আস্তে আস্তে স্তিফান যোদ্ধাদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। স্তিফান তরোয়ালের লড়াই ভালোই জানতো। ওর নিপুণহাতে তরোয়াল চালানো দেখে এদেশের যোদ্ধারা অবাক। স্তিফান ওদের তরোয়াল চালানো শেখাতে শেখাতে যোদ্ধাদের নিজের দলে টানতে লাগল। যোদ্ধাদের ওপর সেনাপতির আর কোনও প্রভাবই রইল না। স্তিফান সর্বশক্তিমান হয়ে উঠল। এবার স্তিফান রাজাকে মৃত্যুভয় দেখাতে লাগল। রাজাও দেখলেন যোদ্ধারা স্তিফানের কথায় ওঠে বসে। স্তিফান যে কোন মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করতে পারে। অসহায় রাজা স্তিফানের আধিপত্য মেনে নিলেন। সার্ভো থামল। একটু কাশতে লাগল।

----পরের ঘটনা বলো। শাঙ্কো বলল।

—এবার স্তিফানোর নজর পড়ল আমার ওপর। স্তিফানের আসল পরিচয় একমাত্র আমিই জানি। আমার ওপর রাজাকে বিরূপ করে তুলল। বলল—এক, আমি বিদেশী। দুই আমি জলদস্যু ছিলাম। অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছি। স্তিফানের পরামর্শে রাজা আমাকে কয়েদঘরে বন্দী করলেন। সার্ভো থামল।

—আমার মনে হয় রাজা বাধ্য হয়ে তোমাকে বন্দী করেছেন। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক তাই। তবে রাজা আমাকে দেশত্যাগ করার শাস্তি দিতে পারতেন। তাহলে এই কয়েদঘরে আমাকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হত না। সার্ভো বলল।

—ঠিক আছে। ভাই সার্ভো----পরে কথা হবে। শাঙ্কো বলল।

তারপর ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল ফ্রান্সিস----তোমার অনুমানই ঠিক। স্তিফানো জলদস্যুদের দলে ছিল। সার্ভোকে দেখিয়ে বলল—

—ও সার্ভো। ও নিজেও সেই জলদস্যুদের দলে ছিল। তারপর শাঙ্কো আস্তে আস্তে সার্ভোর কাছে যা শুনেছে সব বলল। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল---

—স্তিফানোকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি ও সাংঘাতিক মানুষ। সার্ভোকে যে এতদিনে মেরে ফেলেনি এটা সার্ভোর সৌভাগ্য। তারপর ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—দেখবে—স্তিফানো সার্ভোকে এখান থেকে সরাবে।

—কেন? শাঙ্কো বলল।

—কারণ স্তিফানো জানে ওর আসল পরিচয় জানে একমাত্র সার্ভো। এখন এই ঘরেই ও আছে। আমরাও আছি। ও নিশ্চয়ই কথাপ্রসঙ্গে স্তিফানোর আসল পরিচয় আমাদের কাছে বলবে। এটা স্তিফানো চাইবে না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

ফ্রান্সিসের অনুমান যে সঠিক সেটা কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল। একজন প্রহরী লোহার দরজায় ঢং ঢং শব্দ করে বলল—সার্ভো—তুমি বেরিয়ে এসো।

—কেন? বেশ তো আছি। সার্ভো বলল।

—না। মন্ত্রীর আদেশ—তুমি অন্য জায়গায় থাকবে। প্রহরী বলল।

—না। আমি অন্য কোথাও যাবো না। সার্ভো মাথা নেড়ে বলল।

—মন্ত্রীমশাই ডেকেছেন। তোমাকে যেতেই হবে। প্রহরী চেঁচিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল—মন্ত্রীমশাইকে এখানে আসতে বলো।

—কী বলছো? মন্ত্রীমশাই এলে তোমাদের দু'জনেরই প্রাণ যাবে। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমাদের মরতে হবে। প্রহরী বলল। তারপর চলে গেল।

শাঙ্কো বলল—এটা কি ভালো হল? স্তিফানো চটে গেলে আমাদের বিপদই বাড়বে।

—আমি নিশ্চিত স্তিফানো সার্ভোকে মেরে ফেলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। সিনাত্রা বলল।

—তা হয় না। একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করবে—এটা নির্দ্বিধায় মেনে নেবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি সার্ভোকে বাঁচাতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

—এখানে থাকলে ওর জীবন বিপন্ন হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্তিফানো এসে হাজির। ঢং ঢং শব্দে দরজা খুলে গেল। স্তিফান কয়েদঘরে ঢুকল।

—সার্ভো—স্তিফানো প্রায় গর্জন করে উঠল—তোমার এত সাহস আমার হুকুম অমান্য করো।

সার্ভো ভয়ে কুকঁড়ে গেল। ভীতস্বরে বলল—আমি তো যেতেই চেয়েছিলাম। ফ্রান্সিসসকে দেখিয়ে বলল—ও আমাকে যেতে দিল না। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে স্তিফানো বলল—তুমি সার্ভোকে যেতে দাও নি?

—হ্যাঁ। ও এখানেই থাকবে। ফ্রান্সিস শান্তভঙ্গীতে বলল।

—সার্ভো আমার সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলেছে? স্তিফানো জানতে চাইল।
—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।
—কী বলেছে? স্তিফানো বলল।
—বলেছে—ও আর আপনি একসঙ্গে এক জলদস্যুর দলে ছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।
—মিথ্যে কথা। স্তিফানো বলল।
—আমি সত্যি কথাটাই বললাম। ফ্রান্সিস বলল। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তিফোনো তরোয়াল কোষমুক্ত করল। দাঁত চাপাস্বরে বলল—
—এই পাহারাদারদের সামনে আমাকে অপমান করছো। জানো তোমাদের দু'জনকে এক্ষুণি আমি হত্যা করতে পারি। স্তিফানো বলল।
—নিশ্চয়ই পারেন। আমরা নিরস্ত্র। ফ্রান্সিস বলল।
—অস্ত্র থাকলে কী করতে। স্তিফানো বলল।
—বাঁচবার চেষ্টা করতাম। ফ্রান্সিস বলল।
—বেশ। তোমাকে তরোয়াল দেওয়া হবে। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। স্তিফানো দাঁতচাপাস্বরে বলল।
—মিছিমিছি লড়াই—ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে দিল না।
—কাপুরুষ। স্তিফানো দেঁতো হাসি হেসে বলে উঠল।
—ঠিক আছে। আমি রাজি। ফ্রান্সিস বলল।
—কাল সকালে তোমাকে ডাকা হবে। স্তিফানো বলল।
—বেশ তবে লড়াইয়ের জায়গায় আমার বন্ধুরা আর সার্ভো থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।
—হুঁ।। পাহারায় থাকতে হবে। স্তিফানো কট্‌মট্ করে একবার সার্ভোর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল। তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। তারপর চলে গেল। শাঙ্কো বলল—
ফ্রান্সিস—এটা কী করলে? স্তিফান তোমাকে হত্যা করবে। তারপর সার্ভোকেও—শাঙ্কোর কথা শেষ হল না। ফ্রান্সিস বলল—
—জানি। জেনেশুনেই আমি রাজি হয়েছি। শোন—স্তিফানোকে তরোয়াল চালাতে দেখেছি। আক্রমন করার সময় ও বাঁদিকটা অরক্ষিত রাখে। ওখান দিয়েই আমি আক্রমন করবো। ফ্রান্সিস বলল।
রাতে খেতে বসে সার্ভো ফ্রান্সিসকে বলল—
—ভাই—তুমি আমার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন করছো। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে সার্ভোর পিঠ চাপড়াল।
—জানো না স্তিফানো কত বড় যোদ্ধা। তরোয়ালের লড়াইয়ে ওকে কখনও হারতে দেখিনি। সার্ভো বলল।
—দেখা যাক্। ফ্রান্সিস খেতে খেতে মাথা ওঠা নামা করল।
পরদিন সকালের খাবার দিতে এসে প্রহরী বলল—

—খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে নাও। তোমাদের সবাইকে যেতে হবে।

প্রান্তরের একপাশে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নীচে একটা কাঠের আসন পাতা হয়েছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের খবর রটে গেছে। দলে দলে লোক ভিড় করল। যোদ্ধারাও ভিড় করল এসে।

এক সময় রাজা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে স্তিফানো। রাজা এসে আসনে বসলেন। পাশে সেনাপতি।

কড়া পাহারায় ফ্রান্সিস ও শাঙ্কোরা এল। একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসকে একটা তরোয়াল দিল। তরোয়াল নিয়ে ফ্রান্সিস রাজার সামনে গোল ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। এবার স্তিফানো এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল। ঝনাৎ শব্দে তারবারি কোষমুক্ত করল। বলল—

—আমাকে যে অপবাদ দিয়েছো। তার জন্যে সর্বসমক্ষে মাপ চাও।

—আমি মিথ্যে অপবাদ দিই না। যা বলেছি সত্যি বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মরো। স্তিফানো বলল।

স্তিফানো তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত মার ঠেকাল। দু'জনেই তরোয়াল চালাতে লাগল ঠং ঠং ধাতব শব্দ হতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই লড়াই জমে উঠল। স্তিফানো ভেবেছিল সহজেই ফ্রান্সিসকে কাবু করা যাবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। সহজে হারানো যাবে না। দু'জনেই তীক্ষ্ণ চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। তরোয়ালের মার কোনদিক থেকে আসছে আন্দাজ করে নিচ্ছে। দু'জনেই ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছে। উপস্থিত রাজা প্রজারা, শাঙ্কোরা দুই যোদ্ধার দ্বন্দযুদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। ফ্রান্সিস খুব বেশি আক্রমন করছিল না। ও স্তিফানোকে বেশি নড়া চড়া করতে বাধ্য করল। এতে স্তিফানো বেশি পরিশ্রান্ত হল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগটা নিল। এবার স্তিফানোর মার ঠেকিয়ে এক লাফে এগিয়ে বাঁ দিক দিয়ে স্তিফানোর তরোয়ল প্রানপনে এক ঘা মারল। স্তিফানোর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। স্তিফানো বসে পড়ল। নিরস্ত্র স্তিফানে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। চোখে মুখে মৃত্যু-ভীতি। ফ্রান্সিস স্তিফানোর বুকের ওপর দিয়ে তরোয়ালের ডগা টেনে নিল। স্তিফানোর জামা বুকের দিকে কেটে গেল। দেখা গেল বুকে তরোয়ালের ঘা-এর ক্ষত। গভীর ক্ষত চিহ্ন। স্তিফানো তাড়াতাড়ি জামা টেনে বুক ঢাকল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এবার তো বলবেন আমি মিথ্যে অপবাদ দিইনি। স্তিফানো কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে হাঁপাতে লাগল। ওর আশঙ্কা ছিল হয়ত ফ্রান্সিস ওর বুকে তরোয়াল বসিয়ে দেবে। ফ্রান্সিস তা করল না দেখে ওর মৃত্যু ভয়ে কেটে গেল। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

উপস্থিত লোকেদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ওরা কল্পনাও করেনি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্তিফানো হেরে যাবে। সার্ভো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল।

রাজা আসন থেকে উঠে রাজবাড়ির দিকে চললেন। দর্শকদের ভিড় পাতলা

হতে লাগল। স্তিফানো মাটি থেকে তরোয়াল তুলে কোষবদ্ধ করল। তারপর কোন কথা না বলে রাজবাড়ির পেছন দিকে চলল। বোধহয় ওদিকেই মন্ত্রীর আবাস। ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের কাছে এল।

চার পাঁচজন প্রহরী ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদের কয়েদঘরের দিকে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিসের শরীরও অক্ষত ছিল না। বাঁ বাহুতে তরোয়ালের খোঁচা লেগেছিল। রক্ত পড়ছিল। ক্ষতস্থান ডানহাতের চেটো দিয়ে চেপে ধরে হাঁটতে লাগল। একজন প্রহরী ফ্রান্সিসের হাত থেকেও তরোয়ালটা নিয়ে নিল।

কয়েদঘরের সামনে এল ওরা। প্রহরী ঢং ঢং শব্দে দরজা খুলল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একজন প্রহরীকে ডাকল।

প্রহরী ওর কাছে এল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—

—ওর হাত কেটে গেছে। একজন বৈদ্যি ডাকো।

—মন্ত্রীমশায়ের হুকুম ছাড়া বৈদ্যি ডাকা যাবে না। প্রহরী বলল।

—ওর হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর কষ্ট হচ্ছে। অথচ মন্ত্রীর হুকুম ছাড়া বৈদি আনাবে না। শাঙ্কো বেশ গলা চড়িয়ে বলল।

—নিয়ম নেই। প্রহরীরও এক কথা।

—বেশ মন্ত্রীকে গিয়ে ওর অবস্থার কথা বল। দেখা যাক মন্ত্রী কী বলে। শাঙ্কো বলল। প্রহরী কিছুক্ষণ পরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধকে নিয়ে এল। বৃদ্ধের হাতে কাপড়ের ঝোলা। বোঝা গেল বৈদ্যি। বৈদ্যি কয়েদঘরে ঢুকল। শায়িত ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে উঠে বসতে বলল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। একটু ক্লান্ত স্বরে বলল—ওষুধের দরকার নেই। এমনিতেই সেরে যাবে।

—হুঁ—দেখছি। বৈদ্যি বিড় বিড় করে বলল।

বৈদ্যি ফ্রান্সিসদের জামার হাতা সরিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে কাটা জায়গাটা দেখলো। আস্তে আস্তে বলল—ঘা বিষিয়ে উঠতে পারে। শুনলাম তরোয়াল লড়াইয়ে তুমি মন্ত্রীমশাইকে হারিয়েছো। তুমি বাহাদুর—এটা বলতেই হবে।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। বৈদ্যি কাপড়ের ঝোলা থেকে কয়েকটা কাঠের বোয়াম বের করল। বোয়ামগুলো থেকে আঙ্গুলের ডগায় কালো হলুদ সবুজ রঙের গলা কিছু বের করল। তারপর সব মিশিয়ে হাতের তালুতে ঘষে বড়ি বানাল। একটা হাতে পিষে ক্ষতস্থানে লাগাল। উঃ ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বোধহয় জ্বালা করে উঠেছে। একটু পরেই বোধহয় জ্বালা কমল। বৈদ্যি বড়িগুলো হাতে নিয়ে শাঙ্কোর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল—প্রতিদিন একটা বড়ি খাওয়াবে। ভয় নেই। সেরে যাবে।

বৈদ্যি কাঠের বোয়ামগুলো ঝোলায় ভরল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াল। দরজায় দাঁড়নো প্রহরীদের দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল—মন্ত্রীমশাই লোক ভালো না। সাবধান। ফ্রান্সিসের ক্ষতস্থান দেখল। যাক্—রক্ত। পড়া বন্ধ হয়েছে। বৈদ্যিবুড়ো চলে গেল।

একটু বেলায় দু'জন প্রহরী খাবার নিয়ে এল। গোল একটা পোড়া রুটি। আর সামুদ্রিক মাছের ঝোল। খেতে খেতে শাঙ্কো বলল—এখন কেমন বোধ করছো?

—ভালো। জ্বালা যন্ত্রনা অনেকটা কমেছে ফ্রান্সিস বলল।

—স্তিফানো আমার ওপর এত সদয় হল—বৈদ্যি পাঠাল। সিনাত্রা বলল।

—স্তিফানো ধুরন্ধর পুরুষ। সময় সুয়োগ বুঝে ঠিক আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে। ওকে বিশ্বাস নেই। দীর্ঘদিন নিরস্ত্র নিরীহ জাহাজ যাত্রীদের হত্যা করেছে। দয়া মায়া বলে ওর মনে কিছু নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমারও তাই মনে হয়। তার ওপরে রাজার সামনে প্রজাদের সামনে যোদ্ধাদের সামনে ওভাবে তোমার কাছে হেরে গেল। শোধ তুলতে ও তক্কে তক্কে থাকবেই। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক বলেছো। আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। সার্ভো ফ্রান্সিসদের কথা শুনছিল। এবার বলল—স্তিফানো অনেক বড়কিছুর জন্যে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে।

—বড় কিছু মানে? ফ্রান্সিস সার্ভোর দিকে তাকাল।

—তাহলে তো তোমাদের এখানকার এক অতীত ইতিহাস বলতে হয়। সার্ভো বলল।

—বেশ বলো।

—খেয়ে নিয়ে বলছি। সার্ভো বলল।

দুপুরে খাওয়ার পাট চুকল। এবার ফ্রান্সিস বলল—এখানকার অতীত ইতিহাস কী বলছিলে।

—এখানে এসেই জেনেছি সেই ইতিহাস। একটু থেমে সার্ভো বলতে লাগল—প্রায় শ'দেড়েক বছর আগে এখনকার রাজা প্রোফেনের এক পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন—মুস্তাকিন। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন তিনি। সোনা হীরে মনি মুক্তোর ভান্ডার ছিল তাঁর। কীভাবে তিনি সেসব সংগ্রহ করেছিলেন তা কেউ জানে না। এই নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলে। তিনি সেসব কোথায় গোপনে রাখতেন তা তাঁর রানিও জানতেন না। সার্ভো থামল।

—তাহ'লে রাজা মুস্তাকিনের ধনসম্পদের হদিশ কেউ জানে না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা প্রোফেনও কিছু জানে না?

—রাজা প্রোফেন সেই ধনভান্ডার উদ্ধার করার চেষ্টাও করেন নি?

—শুনেছি রাজা হয়ে প্রোফেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন ঐ ধনভান্ডার উদ্ধার করতে কিন্তু পারেন নি। সার্ভো বলল।

—স্তিফানো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—সেটাই তো আমার বলার। ঐ ধনভান্ডার খুঁজে বেড়িয়েছে। তখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। আমাকেও বার কয়েক সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

—কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—ঐ লুভিনা পাহাড়ে। পাহাড়ের নিচে জঙ্গলে। সার্ভো বলল।

—রাজবাড়িতে খোঁজে নি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। রাজবাড়িতেও খুঁজেছে। কিন্তু কোন হদিশ পায়নি। তখনই আমাকে ও বলেছিল—ঐ ধনভান্ডার খুঁজে বের করে সব নিয়ে এই রাজত্ব থেকে পালিয়ে যাবো। ওর লোভের শেষ নেই। সার্ভো বলল।

—তাই স্তিফানো এখানে ঘাঁটি গেড়েছে। ওর লক্ষ্য ঐ ধনভান্ডার চুরি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক বলেছো। সার্ভো বলল।

—কিন্তু আমি তা হতে দেব না। ঐ ধনভান্ডার আমিই উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি! পারবে? সার্ভো অবাক হয়ে বলল—কেউ পারছে না তুমি পারবে? এবার শাঙ্কো বলল—ওর নাম ফ্রান্সিস —এর আগে অনেক গুপ্ত ধনভান্ডার ও আবিষ্কার করেছে চিন্তা বুদ্ধি আর পরিশ্রমের সাহায্যে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকো ফ্রান্সিস ঠিক ঐ ধনভান্ডারের হদিশ বের করতে পারবে।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু গুপ্ত ধনভান্ডার আবিষ্কৃত হলে স্তিফানো আসল চেহারা ধরবে। তোমাদের খুন করতেও পেছপা হবে না। নরহত্যা করেও ও নির্বিঘ্নে ঘুমোয়। ও কী নির্মম কী নিষ্ঠুর তা কল্পনাও করতে পারবে না। সার্ভো বলল।

—সে সব সময়মত ভাববো। এখন রাজা প্রোফেনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। ফ্রান্সিস বলল। সিনাত্রা সব শুনছিল। এবার একটু ভীত স্বরে বলল—রাজাকে চটিও না যেন।

—না-না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়িয়ে হেসে বলল—আমি শুধু জানতে চাইবো এই গুপ্ত ধনভান্ডার সম্পর্কে উনি কী জানেন। দেখি রাজা কী বলেন? দেখি রাজার কথা থেকে কোন সূত্র পাই কিনা। তারপর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—প্রহরীকে বলো তো আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করব।

—বলছি। শাঙ্কো দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকল। প্রহরী কাছে এলে বলল—রাজা প্রোফেনকে গিয়ে বলো যে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—মন্ত্রীমশাই-এর হুকুম নাহলে রাজার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। প্রহরী ঘাড় নেড়ে বলল।

—মজা মন্দ না—শাঙ্কো হেসে বলল—সব ব্যাপারেই মন্ত্রীমশাইয়ের অনুমতি নিতে হবে। প্রহরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বলল না।

—যাও। শাঙ্কো তাড়া লাগল।

—মন্ত্রী মশাইকে বলছি। এই বলে প্রহরীটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্তিফানো এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—কী ব্যাপার? রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন? ফ্রান্সিস দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—যা বলার রাজাকেই বলবো।

—উঁহু—তার আগে আমাকে বলো।

—বেশ। শুনলাম রাজা প্রোফেনের এক পূর্বপুরুষ রাজা মুস্তাকিম তাঁর প্রচুর ধনসম্পদ গোপনে এই রাজ্যের কোথাও রেখে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কী ভাবে শুনলে? স্তিফানো জানতে চাইল।

—সার্ভো বলেছে। ফ্রান্সিস বলল। স্তিফানো গলা চড়িয়ে বলল—সার্ভো তুমি এসব বলেছো?

—এটা গোপনে রাখার ব্যাপার নয়। প্রজাদের জিজ্ঞেস করুন। বোধহয় তারাও জানে। তবে কেউ জানে না সেই ধনসম্পদ গোপনে কোথায় রাখা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। এসব জেনে তোমার লাভ? স্তিফানো বলল।

—আমি সেই ধনসম্পদ উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

স্তিফানো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—রাজা প্রেফেনের পূর্বপুরুষরা কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন রাজা প্রোফেনও কম চেষ্টা করেননি—কেউ সেই ধনভান্ডারের হদিশ পেল না আর তুমি কোত্থেকে এলে সেসব উদ্ধার করতে। এসব পাগলামি ছাড়ো।

—ঠিক আছে। ধরে নিন না এটা আমার পাগলামি। রাজার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। কাল সকালে রাজসভায় এসো। তবে এটাও জেনো রাজার পূর্বপুরুষ রাজা এবং আমিও তোমার চাইতে কম বুদ্ধিমান নই। স্তিফানা বলল।

—তাহ'লে কাল সকালে আমরা রাজসভায় যাবো? শাঙ্কো বলল।

—এসো। দেখ কথা বলে। তবে গুপ্ত ধনভান্ডার খুঁজতে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হাল ছেড়ে দেবে। যেমন অনেকেই অনেকদিন আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। স্তিফানো বলল

—দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

স্তিফানো হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সবে সকালের খাবার খাওয়া শেষ করেছে একজন প্রহরী কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। বলল—চলো—তোমাদের রাজসভায় নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। কিন্তু সার্ভো নামে যে আছে সে যেতে পারবে না। শাঙ্কো সার্ভোকে বলল—তুমি ভাই থাকো। আমরাই যাচ্ছি।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘর থেকে বের করা হল। তিনজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা যখন রাজসভায় পৌঁছল তখন বিচারের কাজ চলছিল। ফ্রান্সিসদের অপেক্ষা করতে হল।

বিচার শেষ। বিচার প্রার্থী চলে গেল। ফ্রান্সিস একটা জিনিস লক্ষ্য করল বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও রাজা স্তিফানোর সঙ্গে পরামর্শ করে নিচ্ছেন। বোঝাই গেল স্তিফানো রাজাকে বেশ ভালো ভাবে কব্জা করেছে।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

ফ্রান্সিস এগিয়ে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

—কী প্রয়োজন?

ফ্রান্সিস রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনের কথা বলে বলল—আপনার কাছে জানতে এসেছি এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?

—কেন বলো তো? রাজা বললেন।

—আমরা সেই গুপ্তধন খুঁজে বের করব। ফ্রান্সিস বললেন।

—অসম্ভব। পারবে না। রাজা বললেন।

—আমি ওদের সেকথা বলেছি। স্তিফানো হেসে বলল।

—ঠিক আছে। মান্যবর রাজা—তবু আপনাকে অনুরোধ করি—এ ব্যাপারে আপনি যা জানেন বা শুনেছেন বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যি বলতে কি আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা মুস্তাকিম বেশ খেয়ালি ধরনের মানুষ ছিলেন। সময় নেই অসময় নেই মাঝে মাঝেই ঐ লুভিনা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। তখন তিনি তাঁর দেহরক্ষীদেরও সঙ্গে নিতেন না। রাজা বললেন।

—আচ্ছা— এই রাজবাড়িতেও খোঁজা হয়েছে কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। রাজা স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো বলল—তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কোন হদিশ মেলে নি।

—ঠিক আছে। এবার আমার একটা অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বললেন।

—পাশের রাজ্য এলুডায় নিরপরাধকেও পুড়িয়ে মারা হয়। এই পাশবিক শাস্তি বন্ধ হোক এটাই আমি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এলুডা জয় করতে হয়। রাজা বললেন।

—আমি তাই করতে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ওখানকার সর্দারকে আমরা হত্যা করেছি। কিন্তু আবার কেউ না কেউ সর্দার হয়েছে আর ঐ অমানবিক শাস্তির নিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ঐ ব্যবস্থা বন্ধ করতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তোমরা তো মাত্র তিনজন। রাজা বললেন।

—না। আমাদের জাহাজে আরোও পঁচিশ তিরিশ জন বন্ধু রয়েছে। সবাই মিলে আমরা এলুডা আক্রমন করবো। আমাদের জয় হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা প্রোফেন স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো কিন্তু ফ্রান্সিসের অনুরোধে রাজি হল। ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল যখন স্তিফানো বলল—এ তো ভাল কথা। এলুডা জয় করতে পারলেই আমরা ঐ শাস্তির ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারবো।

—আর একটা অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বললেন।

আমাদের বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। তাদের তো এনে কয়েদঘরে তোলা যায় না। আপনি একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করুন। কথা দিচ্ছি আমরা পালাবো না। ফ্রান্সিস আরো বলল—তাছাড়া গুপ্ত ধনসম্পদ খুঁজতে গেলে আমাদের তিনচারজনকে স্বাধীনভাবে চলা ফেরার সুযোগ তো দিতে হবে। রাজা স্তিফানোর দিকে তাকালেন।

—এ ব্যাপারে আমার একটা নিয়ম তোমাদের মানতে হবে। স্তিফানো বলল—

—বলুন—কী নিয়ম? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এক—তোমরা জঙ্গল পাহাড় থেকে পালাতে পারবে না। দুই—গুপ্তধন উদ্ধার করে সেসব নিয়ে পালাতে পারবে না। স্তিফানো বলল।

—বেশ—আপনার নিয়মে আমরা রাজি। তবে এই সঙ্গে বলে রাখি গুপ্ত ধনভান্ডার উদ্ধার করতে পারলে একটা রুপোর মুদ্রাও আমরা নেব না। রাজাকেই সব দেব। কারণ গুপ্তধনের উপর একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

স্তিফানো হেসে বলল—এমন ভাবে বলছ যেন এরমধ্যেই গুপ্তধন আবিষ্কার করে ফেলেছো।

—এখনই সে কথা বলার সময় যে আসেনি—সেটা আমি জানি। গুপ্তধন আবিষ্কার করার পর আমরা কি করব সেটাই বলে রাখলাম। এবার আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

স্তিফানো সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—যান—সৈন্যাবাসের একটা ঘর ওদের ছেড়ে দিন। সেনাপতি আসন থেকে উঠে ফ্রান্সিসদের তার সঙ্গে আসার জন্যে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখনই স্তিফানো বলে উঠল—কিন্তু সার্ভো কয়েদঘরে থাকবে। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। বলল—মান্যবর রাজা—সার্ভোকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে দিন। সার্ভো এখানকার সব জায়গা ভালোভাবে চেনে জানে। ওকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে আমাদের সুবিধে হবে। রাজা একবার স্তিফানোর দিকে নিয়ে তাকিয়ে বলল—সার্ভোর দায়িত্ব তুমি নিচ্ছো?

—হ্যাঁ। সার্ভো পালালে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। ফ্রান্সিস বলল। স্তিফানো আর কোন আপত্তি করলো না। বোধহয়, ভাবল সার্ভো পালালে ফ্রান্সিসকে চিরদিনের জন্যে কয়েদঘরে আটকে রাখা যাবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

ফ্রান্সিসরা সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির বাইরে চলে এল। সেনাপতি সৈন্যবাসের দিকে চলল। সৈন্যবাসের কাছে এসে কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা বড় লম্বাটে ঘরের সামনে এল। দরজা ভেজানো ছিল। সেনাপতি দরজা খুলল। খালি ঘর। বলল—এই ঘরে তোমরা থাকবে। কিন্তু পালাবে না। পালাবার চেষ্টা করলে বাঁচবে না।

—জানি। আর একটা অনুরোধ—আমাদের একজন বন্ধু আপনার সঙ্গে যাবে। কয়েদঘরে সার্ভো নামে একজন বন্দী হয়ে আছে। তাকে মুক্ত করে এই ঘরে পাঠিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আমার সঙ্গে কে আসবে এসো। সেনাপতি বলল।

—চলুন। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

দু'জনে কয়েদঘরের দিকে চলল। কয়েদঘরের সামনে এসে সেনাপতি প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—একজন বন্দী আছে। ওকে ছেড়ে দাও। প্রহরীদের মধ্যে একজন লোহার দরজা ঢং ঢং শব্দ খুলে ডাকল—ওহে—বাইরে এসো। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সার্ভো দু'লাফে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—আমার সঙ্গে চলো। সেনাপতি চলে গেল। সার্ভো দাঁড়িয়ে রইল। ও তখনও ওর মুক্তির ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। শাঙ্কো হেসে বলল—আবার কয়েদঘরে ঢোকার ইচ্ছে নাকি?

—না-না—সার্ভো বলল—ভাই তোমরা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলে। আমি তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

—ঠিক আছে। এখন চলো। শাঙ্কো বলল।

সার্ভোকে নিয়ে শাঙ্কো ওদের ঘরে নিয়ে এল। সার্ভো প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—ভাই তোমার জন্যেই আমি মুক্তি পেলাম। ফ্রান্সিস বলল—

—এখনও তুমি সম্পূর্ন মুক্ত নও। তবে আমি তোমাকে সম্পূর্ন মুক্ত করবো। কিন্তু একটা কথা। তোমার পক্ষে এখন পালানো খুব সহজ। কিন্তু আমার অনুরোধ পালাবার চেষ্টা কর না। যদি তুমি পালিয়ে যাও আমাদের সারা জীবন ঐ কয়েদঘরে পচতে হবে। আশা করি তুমি সেটা করবে না।

—না-না। ফ্রান্সিস—ভাই তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করবো। সার্ভো বলল।

—কথাটা মনে থাকে যেন। ফ্রান্সিস বলল।

ঘরের মেঝেতে শুকনো ঘাস পাতারই বিছানা। তবে সেসব দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। তার ওপর পরিষ্কার মোটা কাপড়ের বিছানা পেতে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—একটু আরাম করা যাক। কয়েদঘরে যেভাবে দিনরাত কেটেছে। শাঙ্কোও আধশোয়া হল। সিনাত্রা আর সার্ভো বসে রইল।

তখন দুপুর। সৈন্যবাসের রাঁধুনি ওদের খেয়ে নিতে ডাকল। সৈন্যবাসের লাগোয়া খাবার ঘরে ফ্রান্সিসরা খেতে গেল। মেঝেয় টানা খাবারের জায়গা করা হয়েছে। সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সিসরাও খেতে বসল। খেতে দেওয়া হল তেলে ভাজা রুটি আর পাখির মাংস। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমরা তাহলে জাতে উঠেছি। ঐরকম মাংস খেয়ে বুদ্ধি আর শক্তি দুটোকেই কাজে লাগানো যায়।

—যা বলেছো। শাঙ্কোও হেসে বলল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—

—এখন চিন্তা হল বন্ধুদের কী করে এখানে আনা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা তো সমস্যাই। এলুডা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে না। ওরা আমাদের কাউকে পেলে পুড়িয়ে মারবে। ওদের নজর এড়িয়েও যাওয়া আসা করা যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—একমাত্র উপায় খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছানো কিন্তু তার জন্যে নৌকা তো চাই। নৌকা পাবো কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

সার্ভো খেতে খেতে ওদের কথা শুনছিল। এবার বলল—তোমাদের নৌকা চাই?

—হ্যাঁ। তুমি জানো এখানে কোথায় নৌকা পাবো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লুভিনা পাহাড়ের এপারে জেলেদের নৌকার ঘাট আছে। সেখানে নৌকা পাবে। এপারেই জেলেদের নৌকা রাখার ঘাট।

—তুমি শাঙ্কোকে নিয়ে যেতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—কেন পারবো না। আমি এই রাজ্যের সব জায়গা ভালভাবেই চিনি। সার্ভো বলল।

—তাহলে খাওয়া সেরে শাঙ্কোকে ওখানে নিয়ে যাও।

—বেশ তো। সার্ভো বলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—

—শাঙ্কো-খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে নৌকা চালিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। ওখান থেকে সমুদ্রের ধারে ধারে গিয়ে জাহাজ ঘাটায় আমাদের জাহাজে যেতে পারবে।

—খুব সহজেই যাওয়া যাবে। এলুডা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। শাঙ্কো বলল।

—তিনটে নৌকা নিয়ে যেও। আমাদের দুটো নৌকা রয়েছে। মারিয়া আর ভেন বাদে সবাইকে এক ভাবে নিয়ে আসতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল—সার্ভো চলো। সার্ভোও উঠে দাঁড়াল।

খাওয়া শেষ। শাঙ্কোদের ফ্রান্সিস বলল—চেষ্টা করবে সন্ধ্যের আগেই চলে আসতে। আমি বেশি দেরি করতে রাজি নই।

শাঙ্কো আর সার্ভো সৈন্যবাস থেকে সামনের প্রান্তরে নামল। সার্ভো আগে আগে চলল। পেছনে শাঙ্কো।

বসতি এলাকায় এল। এপথ সেপথ দিয়ে ওরা খাঁড়ির কাছে এল। সার্ভো আগে আগে চলল। পেছনে শাঙ্কো।

দূর থেকে শাঙ্কো বেশ কয়েটা দেশি নৌকা তীরে বাঁধা। ওরা ঘাটে এল। দেখল কিছু জেলেদের বাড়ি ঘর। কয়েকজন জেলে ঘরের বাইরে বসেছিল। সার্ভো ওদের একজনকে দেশীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল—

—তোমাদের কর্তা কোথায়? একজন আঙুল তুলে একটা ঘর দেখাল। সার্ভো আর শাঙ্কো সেই ঘরে ঢুকল। দেখল একজন কালো মানুষ মেঝের ঘাসপাতার বিছানার ওপর বসে আছে। সার্ভো বলল—কর্তা— তিনটে নৌকা চাই।

—নৌকা নিয়ে কী করবেন? কর্তা জানতে চাইল।

—এল্‌ডার জাহাজ ঘাটায় একটা জাহাজ আছে। সেই জাহাজে যাবো।

—ভোরে মাছ ধরতে যাবো আমরা। তার আগেই নৌকা নিয়ে ফিরে আসা চাই। জেলে কর্তা বলল।

—আমরা সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবো। শার্ভো বলল।

—বেশ। কিন্তু ভাড়া লাগবে। জেলে কর্তা বলল।

সার্ভো শাঙ্কোর দিকে তাকাল। ভাড়ার কথা বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে কর্তাকে দিল। সোনা দেখে কর্তা খুব খুশি। বলল—নৌকা চালানোর লোক লাগবে? সার্ভো শাঙ্কোকে সেই কথা বলল। শাঙ্কো বলল—বলো যে আমি একাই নৌকা বেঁধে নিয়ে যাবো। সার্ভো কর্তাকে বলল—সে কথা। কর্তা আপত্তি করল না। শুধু বলল—আজ রাতে জোয়ার আসবে? তার আগেই চলে আসে যেন। জোয়ারের সময় নৌকা চালানো কঠিন। সার্ভো শাঙ্কোকে সে কথা বলল। শাঙ্কো বলল— বলো যে আমরা ভাইকিং। নৌকা চালানোয় দক্ষ। সার্ভো কর্তা সে কথা বলল। কর্তা আর কিছু বলল না। শাঙ্কো সার্ভোকে বলল—কর্তাকে বল একগাছি দড়ি দিতে। সার্ভো তা বলল। কর্তা ঘরের কোনা থেকে দড়ি বের করে আনল।

সবাই ঘরের বাইরে এল। কর্তা ঘাটের দিকে চলল। পেছনে শাঙ্কোরা। কর্তা তিনটে নৌকা দেখাল। তার মধ্যে একটা নতুন নৌকা। শাঙ্কো সেই নৌকাটায় উঠল। পেছনে আরো দু'টো নৌকা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল। তারপর নৌকাগুলোর ঘাটে বাঁধা দড়ি খুলে দাঁড় হাতে নিল। সার্ভো দুটো নৌকা পেছনে বেঁধে নিল শাঙ্কো দাঁড় বাইতে লাগল। ও দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকাগুলো দ্রুতই চলল। ফেরার তাড়া রয়েছে। কাজেই শাঙ্কো দ্রুত দাঁড় বইতে লাগল।

খাঁড়ির জলে ঢেউ কম। খাঁড়ি পার হতেই সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের মুখোমুখি হল। নৌকার ওঠাপড়া শুরু হল। সমুদ্রতীরের কাছ দিয়ে দিয়ে শাঙ্কো নৌকা বেয়ে চলল।

ওদের জাহাজের কাছাকাছি যখন পৌঁছাল তখন বিকেল হয়ে গেছে। মারিয়া তখন সূর্যাস্ত দেখার জন্যে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। মারিয়া প্রথম শাঙ্কোকে দেখল। মারিয়া গলা চড়িয়ে বলে উঠল—দেখ—শাঙ্কো আসছে। ডেক-এর ওপর শুয়ে বসে থাকা কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু শুনল কথাটা। রেলিংয়ের কাছে ভিড় করল সবাই। বিস্কো ছুটে গিয়ে দড়ি মই ঝুলিয়ে দিল। শাঙ্কো নৌকাগুলো জাহাজের গায়ে ভেড়াল। বিস্কো চেঁচিয়ে বলল—

—শাঙ্কো—ফ্রান্সিসরা ভালো আছে তো?

—সবাই ভালো আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল। এতক্ষণে মারিয়া হাসল—যাক্—ফ্রান্সিসের কোন বিপদ হয় নি।

শাঙ্কো দড়ির মই বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। সবাই ওকে ঘিরে ধরল। শাঙ্কো তখন হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সব ঘটনা বলল। তারপর বলল—তোমরা

এখনই তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুণি ফিরে যাবো। সন্ধ্যের আগেই রাজা প্রোফেনের দেশে পৌঁছতে হবে। ফ্রান্সিস আর দেরি করতে চাইছে না। আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামব এই ভেবেই ওরা খুশি। এভাবে জাহাজে অলস জীবন ওদের ভালো লাগে না। হাজার হোক—বীরের জাত। লড়াইটা ওরা ভালোবাসে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পোশাক পাল্টে কোমরে তরোয়াল গুঁজে ভাইকিং দল বেঁধে ডেক-এ উঠে এল। তারপর একে একে দড়ির মই বেয়ে নৌকোগুলোয় উঠতে লাগল। নিজেদের নৌকাতেও অনেকে বসল। শুরু হল দাঁড় বাওয়া। একেবারে সামনে রইল শাঙ্কোর নৌকো। তার পেছনে পেছনে অন্য নৌকাগুলো চলল।

তখন সূর্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিম আকাশ জুড়ে লালচে আভা ছড়িয়েছে। মারিয়া জাহাজের রেলিং ধরে একবার সূর্যাস্ত দেখছে আর একবার শাঙ্কোদের চলন্ত নৌকাগুলো দেখছে।

সমুদ্রের তীরের কাছ দিয়ে এসে নৌকাগুলো খাঁড়িতে এল। বাঁক ঘুরে চলল রাজা প্রোফেনের দেশের দিকে।

জেলেদের নৌকার ঘাটে যখন নৌকাগুলো পৌঁছালো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে চারদিকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল জ্যোৎস্না পড়েছে জেলে পাড়ায় খাঁ ড়িতে ওপারের লুভিনা পাহাড়ে।

কর্তার ঘর থেকে সার্ভো বেরিয়ে এল। এতক্ষণ সার্ভো শাঙ্কোর ফিরে আসার জন্যে ঐ ঘরেই অপেক্ষা করছিল। ওর চিন্তা ছিল এই কাজটা শাঙ্কো একা পারবে কিনা। দেখল শাঙ্কো পেরেছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় ভাইকিংরা বীরের জাত। সমুদ্রের নাড়ি নক্ষত্র ওরা চেনে।

ভাইকিংরা দল বেঁধে নৌকা থেকে নেমে এল। সবাই চলল সৈন্যবাসের দিকে। সবচেয়ে আগে শাঙ্কো। তারপরে বন্ধুরা। বসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন লোকজন ওদের দেখছে। এত বিদেশি দল বেঁধে কোথায় চলেছে?

তারপরই সবুজ ঘাসের প্রান্তর। প্রান্তর পার হয়ে ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল। বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস আমরা এসেছি।

সবাই ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। সবাই এঁটে গেল। ভাইকিংরা বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—শাঙ্কোর কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছো। আমরা কালকেই এক সর্দারের দেশ এলুডা আক্রমন করবো। রাজা প্রোফেনের সৈন্যরাও আমাদের সঙ্গে থাকবে। আক্রমন করবো শেষ রাতে। এবার সার্ভো বলবে আমরা কোথা দিয়ে অক্রমণ করবো। সার্ভো বলল—লুভিনা পাহাড় তোমরা আসার সময় দেখেছো। ঐ পাহাড়ের নিচেই গভীর জঙ্গল। খাঁড়ি পার হবো আমরা ওপারে যাবো। ওখানে তখন ভাঁটা চলবে। জল বড় জোর কোমর পর্যন্ত থাকবে। খাঁড়ি পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকব। জঙ্গল এলুডার বসতি এলাকার খুব কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বসতি এলাকায় ঢুকে পড়তে

পালন। তারপর লড়াই কীভাবে করবে সেটা তোমরাই ঠিক করো। ফ্রান্সিস বলল — এবার একটু অন্যরকম ভাবে লড়াই করবো। এলুডাবাসী যোদ্ধারা বর্শা দিয়ে লড়াই করে। আমরাও প্রথমে বর্শা দিয়ে লড়াই করবো। তারপর তলোয়ালের লড়াই চালাবো।

তার জন্যে আমাদের তো বর্শা চাই। শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ। আমি কাল সকালে রাজসভায় যাচ্ছি। আমরা আমাদের জন্যে বর্শা চাইবো। কীভাবে আমরা লড়াই করতে চাই সেটা সেনাপতিকে বুঝিয়ে বলবো। কেউ কিছু বলবে? কেউ কোন কথা বলল না। বোঝা গেল লড়াইয়ের জন্যে ফ্রান্সিসের পরিকল্পনাই মেনে নিল সবাই।

পরদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রাজদরবারে গেল। তখন রাজদরবারের কাজকর্ম চলছিল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি একপাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কাজকর্ম শেষ হল। উপস্থিত প্রজারা বেরিয়ে গেল। রাজা প্রোফেন ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা কাল গভীর রাতে খাঁড়ি পার হয়ে এলুডা আক্রমন করবো স্থির করেছি। আমার বন্ধুরা এসে গেছে। এবার আপনার সেনাপতিকে দয়া করে নির্দেশ দিন তিনি যেন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের সঙ্গে যান।

রাজা প্রোফেন যথারীতি স্তিফানোর দিকে তাকালেন। স্তিফানো বলল—ঠিক আছে সেনাপতি প্রান্তরে সৈন্য সামাবেশ করবেন। তখন তোমরা যাবে। সেনাপতি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তোমাদের পেছনে পেছনে যাবে।

—বেশ। তবে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী সমস্যা? রাজা জানতে চাইলেন।

—আমাদের তো বর্শা নেই। আমাদের সবাইকে বর্শা দিতে হবে।

—কেন? স্তিফানো একটু বিরক্তির ভঙ্গীতে বলল। ফ্রান্সিস সেই বিরক্তি গায়ে মাখল না। বলল—এলুডার যোদ্ধারা বর্শা দিয়ে লড়াই করবে। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে বর্শাও চাই।

—তোমরা কীভাবে লড়াই করতে চাও? সেনাপতি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা প্রথমে বর্শা দিয়ে লড়াই করে ওদের আহত করবো। আমরা হত্যাটা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি। তারপর তরোয়াল দিয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতির সঙ্গে কথা বলে।

নিজেদের ঘরে ফিরল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। বন্ধুরা সব জানতে চাইল। ফ্রান্সিস রাজা ও স্তিফানের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সেসব বলল। আর বলল সন্ধ্যের সময় আমরা বর্শাগুলো পেয়ে যাবো।

দুপুরে সৈন্যবাসের খাবার ঘরে ফ্রান্সিসরা যখন খাচ্ছে তখনই সেনাপতি এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল—

—কী? তোমরা তৈরি তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

—কখন রওনা হবে তোমরা? সেনাপতি জানতে চাইল।

—একটু বেশি রাতে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা আগে প্রান্তরে জমায়েত হবে। তোমরা এলে আমাদের সৈন্যরা আসবে। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ, বন্দী ছিল—সার্ভো—ও-ও কি যাবে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—ওকে দরকার পড়বে। আমার কিছু বলার থাকলে সার্ভো এদেশীয় ভাষায় আপনার সৈন্যদের বোঝাতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সব নির্দেশ আমিই দেব। সেনাপতি গলায় একটু জোর দিয়েই বলল।

—সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। তবে সময় বিশেষে আমার নির্দেশও আপনার সৈন্যদের মানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। শুধু আমার নির্দেশই সবাইকে মানতে হবে। সেনাপতি বলল।

তখন হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস উনি সেনাপতি। কী ভাবে আমরা লড়াই করবো সেটা তো উনিই বলবেন।

—বেশ। ও কথাই রইল। তবে কখনো আমি কোন নির্দেশ দিলে আপনার অনুমতি নিয়েই সেই নির্দেশ দেব। এতে আপনি রাজি তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। এতে আমার আপত্তি নেই। সেনাপতি বলল। তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যের কিছু আগে। ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে শুয়ে বসে আছে এমন সময় কয়েকজন যোদ্ধা বর্শা নিয়ে এল। বর্শা রেখে ওরা চলে গেল। ফ্রান্সিসদের পাঁচটা বর্শা কম পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে যা পেয়েছি তাই নিয়ে লড়বো।

রাতের খাবার বেশ তাড়াতাড়িই খাওয়া হল।

ফ্রান্সিসরা সবাই শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—কেউ ঘুমুবে না। বিশ্রাম নাও।

রাত বেড়ে চলল। এক সময় ফ্রান্সিস উঠে বসল। গলা চড়িয়ে বলল—সবাই উঠে পড়। বাইরের প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াও। রাজার সৈন্যরা ওখানেই আসবে।

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সার্ভো বলল—

—ফ্রান্সিস—আমি আর যাবো না।

—না। তুমিও চলো। তোমাকে লড়াই করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে থাকবে শুধু। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই তৈরি হয়ে প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। আজকে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। চারিদিক ভালোই দেখা যাচ্ছে।

কিছু পরে রাজা প্রোফেনের সৈন্যরা দল বেঁধে এল। সেনাপতি এল। উঁচু গলায় বলল—সবাই জেলেপাড়ার দিকে চলো। ওখান দিয়েই আমরা খাঁড়ি পার হবো।

ফ্রান্সিসরা আগে পেছনে চলল রাজার সৈন্যরা। তাদের সঙ্গে সেনাপতি।

এত লোকেরা যাচ্ছে। শব্দ হল। জেলেপাড়ার লোকেদের কারো কারো ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে সৈন্যদের যেতে দেখে বুঝল ওরা লড়াই করতে যাচ্ছে। ফ্রান্সিসদের দেখে ভাবল তাহলে এই বিদেশীরাও সৈন্যদের সঙ্গে চলেছে লড়াই করতে।

জেলেপাড়ায় ঘাট দিয়ে সবাই জলে নামল। অগভীর খাঁড়ি। জল হাঁটুর ওপর উঠল না। কিন্তু জল ঠেলে যাওয়ার শব্দ হতে লাগল। ফ্রান্সিস জল ঠেলে সেনাপতির কাছে এল। বলল—

—জলে যাতে বেশি শব্দ না হয় সেটা আপনার সৈন্যদের বলুন। সেনাপতি একটু গলা চড়িয়ে দেশীয় ভাষায় বলল সে কথা। এবার জলে কম শব্দ হতে লাগল।

খাঁড়ি পার হল সবাই। জনা পাঁচেক বাদে ফ্রান্সিসদের সবার হাতে বর্শা। সেনাপতি ও সৈন্যদের কোমরে তরোয়াল। খাঁড়ি থেকে উঠে সামনেই বনভূমি। খুব ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছ গাছালি। সবাই বনের মধ্যে দিয়ে চলল। ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে বনের এখানে ওখানে। গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে সবাই চলল।

কিছু পরে বন শেষ। হাত পঞ্চাশেক দুরে এলুডার বসতি এলাকা শুরু হয়েছে। বন থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিস আক্রমনের জন্যে তৈরি। হঠাৎ পেছনে সেনাপতি উঁচু গলায় দেশীয় ভাষায় কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল না সেটা। ভাবল সার্ভোকে জিজ্ঞেস করবে সেনাপতি কী আদেশ দিল। পেছন ফিরে দেখল সার্ভোরা তখনও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেনি। ওদিকে নিস্তব্ধ রাতে সেনাপতির নির্দেশের শব্দ বেশ জোরালো হল। কাছেই বসতি এলাকার লোকদের কানে পৌঁছাল সেই কথা। সঙ্গে সঙ্গে এসব ঘর থেকে কোন যোদ্ধার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল—কু—উ—উ—উ। সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশে ঘর গুলো থেকে বর্শা হাতে যোদ্ধারা বেরিয়ে আসতে লাগল। এরা যোদ্ধার জাত। সবসময় লড়াই-এর জন্যে তৈরী থাকে। কু—উ—উ ধ্বনি চলল।

ফ্রান্সিস বুঝল এখন লড়াই ছাড়া উপায় নেই। ও পেছনে ফিরে তাকাল। সেনাপতি বা তার সৈন্যদের চিহ্নমাত্র নেই। ও ভাবল হয় তো আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু এক্ষুণি তো লড়াই শুরু করতে হবে। তখনই সার্ভো ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—সেনাপতি তার সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

—বলো কি। ফ্রান্সিস ভীষনভাবে চমকে উঠল। কিন্তু এখন আর পিছু ফেরা যাবে না। এলুডার যোদ্ধারা অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—আক্রমন কর। ভাইকিংরা ছুটে গেল এলুডার যোদ্ধাদের দিকে। মুহূর্তে লড়াই শুরু হল।

প্রথম সংঘর্ষেই দুতিনজন ভাইকিং যোদ্ধা অল্পবিস্তর আহত হল বর্শার ঘায়ে। অন্যেরা আগুপিছু বর্শা চালাতে লাগল। এলুডার যোদ্ধারা বর্শা ছুঁড়তে লাগল।

একটা বর্শা উড়ে এসে সার্ভোর বুকে বিঁধে গেল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। ও ছুটে গিয়ে বর্শাটা সার্ভোর বুক থেকে টেনে বের করল। রক্ত পড়তে লাগল। সার্ভো ম্লান হাসল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বুঁজল। সার্ভো মারা গেল। তখনই একটা বর্শা উড়ে এসে ফ্রান্সিসের মাথার ওপর দিয়ে সামনে মাটিতে গেঁথে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তারপর বর্শা ছুঁড়ে মারল এলুডার যোদ্ধার দিকে। একজন যোদ্ধার কাঁধে গেঁথে গেল সেই বর্শা।

ততক্ষণে এলুডার অনেক যোদ্ধার হাতে বর্শা ছুঁড়ে মারার আর কোন অস্ত্র নেই। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—

—তরোয়াল—আক্রমন। বর্শা ফেলে ভাইকিংরা তরোয়াল বের করে ছুটল নিরস্ত্র যোদ্ধাদের দিকে। নিরস্ত্র যোদ্ধারা তখন অসহায়। প্রাণভয়ে ওরা পালাতে করল। যাদের হাতে বর্শা ছিল তাদেরও পরাস্ত করল ভাইকিংরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাঠের মধ্যে পড়ে রইল আহত এলুডার যোদ্ধারা। ফ্রান্সিসের নির্দেশে আহত ভাইকিং কজন বনের আড়ালে চলে গেল।

ফ্রান্সিস এবার নিরস্ত্র যোদ্ধাদের তাড়া করল। বাকি যোদ্ধারা পালাতে লাগল। ফ্রান্সিস বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ল।

বাড়ি ঘরে আড়াল পড়ে যাওয়ায় বিস্কো একা পড়ে গেল। এপথ ওপথ ঘুরে ও সেই উঠোনের মত জায়গাটায় এল। এক কোণে দুটো মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখল উঠোনের মাঝখানে একটা বড় কাঠের খুঁটি। খুঁটির সঙ্গে পা বাঁধা তিনজনের দু'জন পুরুষ আর একটি মেয়ে। বিস্কো ঠিক করল ওদের মুক্তি দেবে। বিস্কো আস্তে আস্তে ওদের কাছে গেল। বিস্কোকে খোলা তরোয়াল হাতে ওদের দিকে আসতে দেখে মেয়েটি ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল। বিস্কো হেসে হাতের তেলো দেখিয়ে মেয়েটিকে আশস্ত করল। তারপর নিচু হয়ে তরোয়াল দিয়ে পোঁচ দিয়ে দিয়ে ওদের পায়ে বাঁধা শুকনো লতার বাঁধন কেটে দিল। বাঁধন কাটতেই পুরুষ দু'জন ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়েটিও পালাত। কিন্তু পালাল না যখন দেখল একটা ঘরের আড়াল থেকে একজন এলুডার যোদ্ধা একটা বর্শা ছুঁড়ে মারছে আর বিস্কো সাবধান হবার আগেই বর্শা বিস্কোর বাঁ কাঁধে কেটে দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বিস্কো উঃ শব্দ করে বাঁ কাধ চেপে ধরল। রক্ত বেরিয়ে এল। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে যোদ্ধাটি পালিয়ে গেছে। মেয়েটির শুকনো মুখ। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ওর আর পালানো হল না। ও বিস্কোর ডান হাত ধরল। ইঙ্গিত করল ওর সঙ্গে হাঁটার জন্যে। বিস্কো মাথা নাড়ল। মেয়েটি করুণ চোখে বিস্কোর দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় কিছু বলল। বিস্কো কিছু বুঝল না। মেয়েটি বার বার ওর কাটা জায়গাটা দেখতে লাগল। বিস্কো বুঝল যে ও যে আহত সেটাই মেয়েটা বোঝাতে চাইছে। দেখা যাক মেয়েটি ওকে কোথায় নিয়ে যায়। বিস্কো ওর পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি একসঙ্গে হাঁটার জন্যে ইঙ্গিত করল। তারপর হাঁটতে লাগল।

তখন লড়াই শেষ। এলুডার যোদ্ধারা হেরে গেছে। বিস্কো তার কিছুই জানে

না। ও মেয়েটির পেছনে পেছনে হেঁটে চলল। বসতি এলাকায় এসে একটা ঘরের সামনে মেয়েটি এসে দাঁড়াল। পাথর বালি মাটির ঘর। ছাউনি শুকনো ঘাসপাতার। ঘরের এবড়ো খেবড়ো কাঠের দরজা। মেয়েটি দরজা খুলে ফেলল। ঘরে একজন বয়স্ক লোক মেঝের বিছানায় শুয়ে ছিল। মেয়েটিকে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এসে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বিস্কো তো জানে না কী ভয়ানক শাস্তি থেকে ও মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে।

মেয়েটি ঐ অবস্থায়ই বিস্কোকে দেখিয়ে বার বার কী বলল। বয়স্ক লোকটি বিস্কোকেও জড়িয়ে ধরল। তখন লোকটি কাঁদছে। এবার কান্না থামিয়ে বিস্কোকে ঘাসের বিছানায় বসতে ইঙ্গিত করল। বিস্কো বিছানায় করল। রক্ত পড়ায় বিস্কো নিজেকে বেশ দুর্বল মনে করছিল। ও একটু বসে থেকে শুয়ে পড়ল। লোকটি পাশের ছোট ঘরটায় ঢুকল। একটা হলুদ রঙের গলা ডেলা নিয়ে এল। বিস্কোর কাঁধের জায়গায়টায় ঐ ডেলাটা চেপে ধরল। ক্ষতস্থানটা যেন জ্বলে উঠল। বিস্কোর মুখ থেকে কাতরোক্তি বেরিয়ে এল—আ—হ্। মেয়েটি একটু হেসে হাতের তেলো দেখিয়ে ওকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল। এবার মেয়েটির সঙ্গে লোকটির কিছু কথাবার্তা চলল। বিস্কো কিছুই বুঝল না। তবে এটা বুঝল লোকটি মেয়েটির বাবা। বোধহয় মা নেই।

আস্তে আস্তে কাটা জায়গার জ্বালা কমল। রক্ত পড়াও বন্ধ হল। মেয়েটি তখন একটা মোটা কাপড়ের ন্যাকড়া নিয়ে এল। কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল। বিস্কো অনেকটা আরাম বোধ করল।

মেয়েটি বয়স্ক লোকটিকে কী বলল, লোকটি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি হাত নেড়ে বিস্কোকে অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। বিস্কো শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ও তো দলছাড়া হয়ে গেল। চারপাশের শান্ত অবস্থা দেখে বুঝল লড়াই শেষ। আর এলুডা যোদ্ধাদের কু উ উ—ডাক শোনা যাচ্ছে না। ওরা নিশ্চয়ই হেরে গেছে। ফ্রান্সিসরা ওর খোঁজ না পেয়ে নিশ্চয়ই চিন্তায় পড়েছে। বিস্কো ভাবল—এখানেই থাকি। সুস্থ হয়ে রাজা প্রোফেনের দেশে গিয়ে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যোগ দেব।

অল্প পরে মেয়েটি পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এল। হাতে দুটো কাঠের বাটি। একটা বাটি বিস্কোর দিকে এগিয়ে ধরল। বিস্কো বাটিটা নিল। দেখল বাটিতে আনাজপত্রের ঝোলমত। মেয়েটি নিজেও একটা বাটি নিয়ে চুমুক দিয়ে খেতে লাগল। বিস্কোও খেতে লাগল। বেশ সুস্বাদু। খেতে খেতে বিস্কো বলল— তোমার নাম কি? প্রোমা। মেয়েটি হেসে বলল।

তখন সকাল হয়ে গেছে। বাইরে লোকজনদের কথাবর্তা শোনা যাচ্ছে। প্রোমা বাটি নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। বিস্কোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি বিস্কো লড়াইএ মরে গেল? তিনচারজন ছুটল বিস্কোকে খুঁজতে। ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে এল।

ভোরের আলো ফুটল। ফ্রান্সিস সর্দারের বাড়ির সামনে এল। মোটামুটি কাঠের ভালো দরজা জানালা।

—সিনাত্রা—দরজায় ধাক্কা দাও তো। ফ্রান্সিস বলল। সিনাত্রা এগিয়ে গিয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা দিল। বার কয়েক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই মোটামত লোকটা এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে দেখেই চিনল। বলল—তোমরা—হত্যা—সর্দার। ফ্রান্সিসও লোকটাকে আগে দেখেছিল।

—তাই তো তুমি সর্দার হতে পারলে। যাক্‌গে—তোমরা হেরে গেছ। এই এলুডা দেশ এখন আমাদের দখলে। তবে আমরা এখানে থাকবো না। তোমাদের দেশ এখন তোমরাই রাজত্ব করবে। কিন্তু এই দেশ জয় করার পিছনে আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী? নতুন সর্দার বলল।

—এখানে অপরাধী যে কোন রকম অপরাধ করুন না কেন তাকে জ্যান্ত পোড়ানো চলবে না। এই প্রথা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। এই শর্তে তোমাকে সর্দার রেখে এ দেশ ছেড়ে আমরা চলে যাব। কী—রাজি? ফ্রান্সিস বলল।

—এবার তোমাদের একটা উঠোনমত আছে যেখানে খুঁটির সঙ্গে তোমাদের বিবেচনায় যে বা যারা অপরাধী তাদের বেঁধে রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। রেজাম। সর্দার বলল।

—তার মানে ঐ উঠোনের নাম। সর্দার মাথা ওঠা নামা করল।

—কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ রেজামে দেশবাসীদের যোদ্ধাদের একত্র কর। তাদের উদ্দেশে আমার কিছু বলার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। খবর—হবে। সর্দার বলল।

—তাহলে আমরা রেজামে যাচ্ছি। তুমি এর মধ্যে খবর দাও। সবাইকে একথাও বলো যে আমরা কারোও কোন ক্ষতি করবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তবে—পুড়িয়ে মারা—বিরোধী—আমি—সর্দার—তাড়িয়ে—আমাকে—মাপ—ফিরেছিলাম। সর্দার বলল।

—হুঁ। ঠিক আছে। তুমি সবাইকে ডাকো। আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

সর্দার চলে গেল।

দুপুরের আগে থেকেই রেজামে লোক জড়ো হতে লাগল। অনেক যোদ্ধাও এল। রেজাম ভরে গেল লোকে।

ফ্রান্সিস সেই জমায়েতের সামনে এসে দাঁড়াল। সর্দারকে ওর কাছে ডাকল। বলল—আমার সব কথা তো সবাই বুঝবে না। তুমি আমার কথা ওদের ভাষায় বুঝিয়ে দাও। সর্দার ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—এলুডার—ভাই বোনেরা—আমরা এদেশ জয় করেছি। কিন্তু আমরা এখানে থাকব না। তোমাদের দেশ তোমাদের সর্দারই শাসন করবে। স্বাধীন ভাবে। মাত্র একটা উদ্দেশ্যেই আমরা এই দেশ জয় করেছি। এখানে অপরাধীকে

পুড়িয়ে মারার প্রথা প্রচালিত আছে। আমাদেরও বন্দী করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখানে এই অমানবিক ভয়াবহ প্রথা বন্ধ করতে হবে। তোমাদের সর্দারকে সেই নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের কাজ শেষ। আমরা আমাদের এক মৃত বন্ধুকে কবর দিয়ে রাজা প্রোফেনের দেশে ফিরে যাব। রাজা প্রোফেনকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখেন। তোমরাও রাজা প্রোফেনের দেশের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখবে—এই অনুরোধ। আমার আর কিছু বলার নেই। ফ্রান্সিস থামল। সর্দার দেশীয় ভাষায় ফ্রান্সিসের বক্তৃতা গলা চড়িয়ে বলল। উপস্থিত জনতা বেশ সমর্থন জানাল। সভা ভেঙে গেল। সবাই চলে যেতে লাগল।

তখনই শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমাদের এক আহত বন্ধু মারা গেল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করল। সখেদে বলে উঠল—ওদের চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারলাম না। যাক গে—চলো—ওদের কবরের ব্যবস্থাটা আগে করি।

—কিন্তু ফ্রান্সিস—আমরা সবাই খুব ক্ষুধার্ত। সিনাত্রা বলল।

—না। ওদের কবর না দিয়ে আমরা কেউ খাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—পরে খাবারের ব্যবস্থা করি। শাঙ্কো বলল।

—বেশ—সর্দারকে বলো আমাদের এখানেই খাবারের বন্দোবস্ত করুক। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথায় কবর দেবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ঐ এলুডা পাহাড়ের নীচের বনভূমিতে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—মাটিতে গর্ত খোঁড়ার জন্য বেলচা জাতীয় কিছু জোগাড় কর। শাঙ্কো চলে গেল। সঙ্গে দু'তিনজন বন্ধুও গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শাঙ্কোরা বেলচা জাতীয় জিনিস নিয়ে ফিরে এল। সবাই দল বেঁধে বনভূমির দিকে চলল। বনভূমির কাছে পৌঁছে ওরা দেখল মৃতদেহ দুটিকে ঘিরে কয়েকজন বন্ধু বসে আছে। ফ্রান্সিসরা যেতেই ওরা উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস মৃত সার্ভো আর বন্ধুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল—বনের ভিতর মৃতদেহ নিয়ে চলো। কয়েক জন বন্ধু মৃতদেহ দু'টি কাঁধে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। বনের মধ্যে ঢুকে ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলল। কিছুদুর যেতেই দেখল একটা বড় গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। জংলা গাছ। কিন্তু বেগুনি রঙের ফুলগুলি দেখতে বড় সুন্দর। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

-এই গাছের নীচেই কবর দেওয়া হবে। গর্ত কর। ফ্রান্সিস বলল। বন্ধুরা সেই জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। সিনাত্রা মৃদুস্বরে দেশের গান গাইতে লাগল। শোকের গান, দুঃখের গান।

খুব বেশি সময় লাগল না। দুটো কবর খোঁড়া দেওয়া হল। মৃতদেহ দুটি

আস্তে আস্তে করে নামিয়ে দেওয়া হল। বন্ধুরা সেই গাছে আর ধারে কাছের গাছগুলোয় উঠে দু'হাত ভরে ফুল নিয়ে এল। মৃতদেহের ওপর ছড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিস গর্তে নামল। দুটো তরোয়াল নিয়ে মৃতদেহের বুকের ওপর রেখে দিল। বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসকে ওপরে তুলে নিল। ভাইকিং বন্ধুরা মারা গেলে ভেনই শেষকৃত্য করে। কিন্তু ভেন জাহাজে। কাজেই শেষকৃত্য কিছু হল না। ফ্রান্সিস এক মুঠো মাটি মৃতদেহের ওপর ছড়িয়ে দিল। এবার সবাই মাটি ঢেলে কবর ভরাট করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে কবর ভরাট হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়িয়ে বলল---চলো। বসতি এলাকার দিকে ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও চলল। তখন সেই জংলা গাছ থেকে টুপটুপ ফুল ঝরে পড়ছে কবরের ওপর।

ওরা রেজামে যখন এল তখন বিকেল হয়ে এসেছে। সেই খুঁটির কাছে সর্দার দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল---রান্না হয়ে এসেছে। একটু পরেই খাওয়া।

ভাইকিংরা রেজাম চত্বরে বসে পড়ল। সবাই ক্ষুধার্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার সামনে লম্বাটে পাতা পেতে দেওয়া হল। পরিবেশন করা হল একটু পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল। তারপর মাংস। ক্ষুধার্ত ভাইকিংরা চেটে পুটে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। ফ্রান্সিস চত্বরে বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল---হ্যারি---সবাই কে বলো। আর এখানে নয়। আমরা এখন ফিরে যাব। এখনো বিস্কোর খোঁজ পেলাম না। ও নিশ্চয়ই একাই ফিরে গেছে। এখানে আর দেরি করবো না। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলল---ভাইসব---উঠে পড়ো। আমরা এখন ফিরে যাবো। এখানে আর নয়।

সব ভাইকিংরা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বনভূমির দিকে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে ভাইকিং বন্ধুরাও চলল। বন পার হয়ে খাঁড়ির কাছে এল। বোধহয় জোয়ার শুরু হয়েছে। জল একটু বেড়েছে। জলে নামল সবাই। জলের মধ্যে পা টেনে টেনে পার হল সবাই।

বসতি এলাকা পার হয়ে প্রান্তর আর রাজবাড়ির কাছে যখন এলো তখন হ্যারি বলল---ফ্রান্সিস---রাজার সঙ্গে এখন দেখা করবে না?

---না। আগে দেখি বিস্কো ফিরল কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

প্রান্তর পার হ'য়ে ফ্রান্সিস দ্রুত এসে ওদের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়াল। ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। বিস্কো ফিরে আসে নি। ফ্রান্সিস চিন্তা হল। ও বিছানায় বসল। হ্যারি ওর কাছে এল। বলল---তাহলে বিস্কো ফিরে আসেনি।

---তাইতো দেখছি। ওর কি হল কিছুই বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

---তাহলে হয়তো জাহাজে ফিরে গেছে। হ্যারি বলল।

---কিন্তু এভাবে না বলে কয়ে? ফ্রান্সিস একটু অবাক হয়েই বলল।

---বলার মত কাউকে কাছে পায়নি হয়তো। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো। ও নিশ্চয়ই আসবে। হ্যারি বলল।

উবু হয়ে বসল। তারপর একসঙ্গে কড়াটা ধরে টানতে লাগল। কয়েকটা জোর হ্যাঁচকা টান পড়তে পাটাতনটা নড়ল। তারপর আরো কয়েকটা জোরে টান পড়তে পাটাতনটা উঠে এল। ভেতরে নিষ্প্রভ আলোয় দেখা গেল পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

—শাঙ্কো—মশাল জ্বালো। শাঙ্কো কোমরে গোঁজা চকমকি পাথর আর লোহার টুকরো বের করল। পাথর ঠুকে দু'টো মশাল জ্বালল।

ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশাল হাতে নামতে যাবে শাঙ্কো জামার তলা থেকে ওর ছোরাটা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস ছোরাটা কোমরে গুঁজে নিল। তারপর আস্তে আস্তে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

মশালের আলোয় ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নিরেট এব্ড়োখেব্ড়ো পাথরের ঘর। একপাশে একটা মাটির বড় জ্বালা। আরও একটা কী। কাছে এসে দেখল একটা ভাঙা কাঠের সিংহাসন। সিংহাসনটা সরাতে গেল। ওটা একেবারেই ভেঙে পড়ল। বেশ শব্দ হল।

—কী হল? ওপর থেকে মারিয়ার ভয়ার্ত গলা শোনা গেল।

—কিছু না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল। ফ্রান্সিস মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক ভালোভাবে দেখতে লাগল। মাকড়সার জাল একটা নাক চাপা গন্ধ এসব নিয়ে পরিত্যক্ত ঘর। কে জানে কত বন্দীর দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে এখানকার পরিবেশে। নাঃ। কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। উৎসুক মারিয়া জিজ্ঞেস করল—কিছু হদিশ পেলে? ফ্রান্সিস মাথা এপাশ ওপাশ করল।

মশাল নিভিয়ে ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির বাইরে চলে এল। যোদ্ধা দু'জনকে ফ্রান্সিস বলল—আজকে আর কোন খোঁজাখুঁজি নয়। তোমরা চলে যেতে পারো। যোদ্ধারা চলে গেল।

ঘরে এসে ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। হ্যারি বলল—

—কোন সূত্র পেলে?

—নাঃ। ঐ গর্ভগৃহে গুপ্তধন রাখা হয়নি। এখন বাকি রইল লুভিনা পাহাড়। কালকে পাহাড়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্তধনের ব্যাপারটাই গন্ডগোলে। মারিয়া মন্তব্য করল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—গুপ্তধন বলে কথা। ওসব বরাবরই গোলমেলে ব্যাপার।

—বনেজঙ্গলে দেখলে গর্ভগৃহে দেখলে কোথাও তো পেলে না। মারিয়া বলল।

—পাহাড়টাও দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি ওখানে না পাও। মারিয়া বলল।

—আমরা সব নতুন করে দেখবো।

—আবার? মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। বলল—সত্যি তোমার ধৈর্যশক্তি খুবই কম। এত সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছো?

—না বাপু। জাহাজে ফিরে চলো। মারিয়া বলল।

—শাঙ্কো যাক—তোমাকে জাহাজে রেখে আসুক। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়ার একটু অভিমানই হল। দেয়ালে হেলান দিতে দিতে বলল—

—তাহলে ধৈর্য ধরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। মারিয়া ফ্রান্সিসদের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে রাজবাড়ি চলে গেল। বার বার বলে গেল—আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো কিন্তু।

—রাজকুমারী আপনাকে রেখে আমরা যাবো না। আপনি সকালেই চলে আসবেন। হ্যারি বলল।

পরদিন ভোরেই মারিয়া চলে এল। সকালের খাবার খেয়ে এসে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—দেরি করো না। রোদ চড়ে যাবে। এখনই চলো।

তখনই সেনাপতি এল। সঙ্গে গতকালের সেই দুই পাহারাদার যোদ্ধা। সেনাপতি হেসে বলল—শুনলাম কালকে রাজবাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছো?

—কে আর দু'হাত ভরে গুপ্তধন দেবে? ফ্রান্সিসও হেসে বলল।

—হদিশ পেলে কিছু? সেনাপতি বলল।

—সময়ের সদ্ব্যবহার কীভাবে করবো? খাবোদাবো ঘুমুবো? ফ্রান্সিস বলল।

—না—তা নয়—মানে—

—আমরাই সময়ের ঠিক সদ্ব্যবহার করছি। চিন্তাভাবনা করছি—বুদ্ধির গোড়ায় শান দিচ্ছি। বুদ্ধিকে শাণিত করছি। আলস্যে সময় কাটাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক্‌গে—যেমন তোমাদের মর্জি। চলি। সেনাপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা দ্রুত তৈরী হয়ে নিল। প্রান্তর পার হয়ে জেলেপাড়ার ঘাটের দিকে চলল। সঙ্গে যোদ্ধা দুজনও চলল।

যেতে যেতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল বেশ বলশালী যোদ্ধাটি মাঝে মাঝেই ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নৌকোয় উঠেও সে ফ্রান্সিসের পাশে বসল। এতে দাঁড় টানতে ফ্রান্সিসের বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু ও কিছু বলল না ব্যাপারটা হ্যারিও লক্ষ্য করেছিল।

বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে যখন তখন হ্যারি নিম্নস্বরে বলল—ফ্রান্সিস কী ব্যাপার বলো তো?

—কোন ব্যাপারে বলছো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—একজন যোদ্ধা তোমার মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। হ্যারি বলল।

—হুঁ—ফ্রান্সিসও [illegible] আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে কেন এরকম করছে [illegible]

[illegible] ওরা তরোয়ালও নিয়ে এসেছে। [illegible] দেখা। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল।

—আরে যেতে দাও। ফ্রান্সিস তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল।

—উঁহু—তুমি ব্যাপারটা এভাবে উড়িয়ে দিও না। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

বনভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে সবাই লুভিনা পাহাড়ের নিচে এল। খুব একটা উঁচু পাহাড় নয়। আর খুব ছোটও নয়।

ফ্রান্সিস যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল-আমাদের গুহাটার মুখে নিয়ে চলো।

—তাহলে পাহাড়ে উঠতে হবে। যোদ্ধাদের একজন বলল

—চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজন এ পাথর সে পাথর কখনও ধরে কখনও ডিঙিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। পেছনে লাইনে ফ্রান্সিসরাও উঠতে লাগল। মারিয়ার উঠতে দেরি হচ্ছিল। শাঙ্কো মারিয়াকে পাহাড়ে উঠতে সাহায্য করছিল।

একসময় গুহার মুখে এসে পৌঁছল সবাই। রোদের বেশ তেজ। আর জোর হাওয়া বইছিল। তাতে কষ্টটা কম হচ্ছিল। ফ্রান্সিস গুহার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো—মশাল জ্বালো। শাঙ্কো দুটো মশাল কোমরে ফেট্টিতে গুঁজে উঠেছিল। ও চকমকি পাথর লোহার টুকরো বের করল। ঠুকে ঠুকে মশাল জ্বালল। একটা মশাল ফ্রান্সিস অন্যটা হ্যারিকে দিল। শাঙ্কো মারিয়াকে হাত ধরে নিয়ে চলল।

কিছুটা এগোতেই নিকষ অন্ধকার। গুহার মেঝেয় পাথরের টুকরো ছড়ানো। একটু উঁচু নিচুও। চারদিক থেকে দেখে হাঁটছিল। এবড়ো খেবড়ো পাথর এখানে ওখানে উঁচিয়ে আছে। বেশ কিছুটা যেতে গুহা পথের উত্তর মুখো ঢাল শুরু হল। এখানে গুহার অংশটা উঁচু। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা উঁচু করে তুলে ওপরের দিকে তাকাল। দেখল এক খোঁদল মত ওপ[illegible]কেও উঠে গেছে। ওপরে কী আছে বোঝা গেল না। এবার উত্তরের ঢাল বে[illegible]বা চলল। এরকম অভিযানে তো মারিয়া অভ্যস্ত নয়। ও ভাবছে কতক্ষণে গুহা থেকে বেরোবে। আর সবাই নির্বিকার হেঁটে চলেছে।

কিছু পরে ওদিককার গুহামুখ দেখা গেল। প্রায় গোল মুখ। যেমন একটা রোদ মাখানো গোলাকার কাপড় ঝুলছে। গুহা পথ শেষ। সবাই বাইরে উজ্জ্বল রোদে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার থেকে এসে চোখে একটু অস্বস্তি হল। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অস্বস্তিটা কেটে গেল।

উত্তরের বনের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা ব্যাপার দেখে বেশ আশ্চর্য হল। এদিকে নিচে বেশ দূর পর্যন্ত টানা উধর মাটি। ঘাসের বা গাছের কোন চিহ্ন নেই বেশ কিছু দূর পর্যন্ত। যেন এই টানা জায়গাটা আগুনে পুড়ে গেছে। অথচ দু পাশে ঘাস গাছগাছালি। ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখাল সেটা। দেখেটেখে হ্যারি বলল—এখানে হয়তো দাবাগ্নি জ্বলেছিল।

—তেমনি কিছু হবে। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস ওপরের দিকে তাকাল। পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো গা উঠে গেছে সেই চূড়ো পর্যন্ত।

ফ্রান্সিস ফিরে যোদ্ধাদের বলল—মৃত্যু সায়রটা কোথায়?

---এদিক দিয়ে উঠেও যাওয়া যায় আবার ওদিক থেকেও উঠেও দেখা যায়। বলশালী যোদ্ধাটি বলল?

—-আমরা এদিক দিয়ে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল। এবার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল---তুমি শাঙ্কোর সঙ্গে এখানে থাকো। পাহাড়ে উঠতে পারবে না।

—না আমি উঠতে পারবো। শাঙ্কো উঠতে সাহায্য করবে। মারিয়া বলল

—-বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই এপাথরের চাঁই ওপাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে কখনো চাঁই ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বেশ সময় লাগল উঠতে। পাহাড়ের চুড়োর কাছাকাছি উঠে দেখল একটা মাত্র শুকনো আঁকাবাঁকা ডালওয়ালা গাছ। তার পাশেই একটা ছোট জলাশয়। বলিষ্ঠ যোদ্ধাটি বলল—এটাই মৃত্যু-সায়র।

ছোট জলাশয়। ফ্রান্সিস ঢাল বেয়ে জলাশয়ের একেবারে কাছে চলে এল। ভালো করে মৃত্যু-সায়রটা দেখতে লাগল। হলদেটে রঙের জল। কেমন একটা নাক-চাপা গন্ধ। পাথরের গা থেকে নিশ্চয়ই বিষাক্ত কিছু বেরিয়ে এই জলে মেশে। তাতেই বিষাক্ত হয়ে গেছে এই জল।

হঠাৎ শাঙ্কোর উত্তেজিত ডাক শুনল ফ্রান্সিস। সেইসঙ্গে মারিয়ার ভয়ার্ত চিৎকার। ফ্রান্সিস এক পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ যোদ্ধাটি তখন দ্রুত ওর সামনে নেমে এসেছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে মৃত্যু-সায়রে ফেলে দেওয়া। ফ্রান্সিস তৎক্ষণাৎ শরীর ঘুরিয়ে সরে গেল। ঢালু পাথরে টাল সামলাতে পারল না যোদ্ধাটি। পাথরের নুড়িতে পা হড়কে মৃত্যু-সায়রে পড়ে গেল। একগাদা নুড়ি পাথরও সেইসঙ্গে জলে পড়ল। ঝপাৎ করে শব্দ হল। যোদ্ধাটি দু'হাত তুলে জলে ডুবে গেল। আর উঠল না। আস্তে আস্তে জলে ঢেউ বন্ধ হল।

মুহূর্তে ঘটে গেল সব। মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে হাঁপাতে গাছটার কাছে উঠে এল। সঙ্গের যোদ্ধাটির মুখ তখন ভয়ে সাদা। এরকম অঘটন ও হয়তো কল্পনাও করেনি। ফ্রান্সিস ওর কাছে এল। বলল—তোমার যোদ্ধা বন্ধু আমাকে ঠেলে ফেলতে চেয়েছিল কেন? মাথা দুলিয়ে যোদ্ধাটি বলল—জানি না।

—ফ্রান্সিস? হ্যারি ডাকল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

—আর এখানে নয়। নেমে চলো। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। মৃত্যু-সায়রটাই দেখা বাকি ছিল। চলো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে এল। মারিয়া তখনও ফোঁপাচ্ছে। মারিয়ার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে বলল---কেঁদো না। অত সহজে আমার মৃত্যু হবে না। এবার তো বুঝলে এ সব অভিযানে এমনি ভয়ানক ঘটনা ঘটে। তাই তোমাকে সঙ্গে আনিনা। যাক্‌গে—শান্ত হও। মারিয়ার ফোঁপানি বন্ধ হল।

এবার ফ্রান্সিসরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে নামতে লাগল। নামতে নামতে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—এর মূলে স্তিফানো। নিশ্চয়ই ওর এরকম নির্দেশ ছিল।

—অসম্ভব নয়। ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল। ফ্রান্সিস দেখল দক্ষিণ দিক দিয়ে পাহাড়টায় ওঠানামা সহজ। প্রান্তরের কাছে এসে যোদ্ধাটি সৈন্যাবাসের দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। মারিয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হ্যারি শাঙ্কো বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজল। কেউ কোন কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল—কালকে আবার লুভিনা পাহাড়ে যাবো। গুহাটা ভালো করে দেখা হয়নি। গুহাটা আর তার চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে।

—আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। যেও। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে সেনাপতি এল। ফ্রান্সিসকে বলল—

—তোমাকে রাজা মন্ত্রীমশাই দু'জনেই ডেকেছেন। রাজসভায় চলো।

—ফ্রান্সিস—কালকের ব্যাপারটা। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল—বোঝাই যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—আমি আর হ্যারি যাচ্ছি।

দুজনে যখন রাজসভায় পৌঁছল দেখল রাজসভায় কোন বিচার চলছে না। বোধহয় আগেই সে সব কাজ সেরে ফেলা হয়েছে। রাজসভায় প্রজাদের ভিড় নেই।

রাজা প্রোফেন ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে বললেন। পাশে বসা মন্ত্রী স্তিফানোর মুখ বেশ গম্ভীর।

—কালকে তোমরা লুভিনা পাহাড়ে গিয়েছিলে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

—আমাদের একজন যোদ্ধা কী করে মৃত্যু-সায়রে পড়ে গেল? রাজা বললেন।

—সে আমাকে ঠেলে মৃত্যু-সায়রে ফেলতে চেয়েছিল। আমি সময়মত সরে যেতে সে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মৃত্যু-সায়রে পড়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—দুর্ঘটনাটা কি এভাবেই ঘটেছিল? স্তিফানো বলল। ফ্রান্সিস চারপাশে তাকাল। দেখল সঙ্গী যোদ্ধাটি কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস তাকে দেখিয়ে বলল—আমাদের কথা বিশ্বাস না হলে এই যোদ্ধাটিকে জিজ্ঞেস করুন। সত্যি ঘটনাটা ওই বলবে।

—ও যা বলার বলেছে। রাজা বললেন।

—নিশ্চয়ই দুর্ঘটনার কথা বলেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা বলেছে—কিন্তু আমার সন্দেহ যাচ্ছে না। স্তিফানো বলল।

—আমি অকারণে নরহত্যা করি না। তাছাড়া সেই যোদ্ধা এদেশের একজন যোদ্ধা। ওর সঙ্গে তো আমার রাগদ্বেষের সম্পর্ক থাকার কথা নয়। ও নিজেই পা পিছলে পড়ে গেছে।

—যাক গে—ব্যাপারটা আমি দেখছি। তোমরা এ দেশ ছেড়ে যেতে পারবে না। স্তিফানো বলল।

—আমরা গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ করছি। কাজেই এখান থেকে চলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে আমার স্ত্রী রয়েছে। তাকে ফেলে রেখে আমরা পালাতেও পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কি লুভিনা পাহাড়ে আবার যাবে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। আজ দুপুরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার চারজন যোদ্ধা তোমাদের পাহারা দিতে যাবে। স্তিফানো বলল।

—সমস্ত সৈন্যবাহিনী গেলেও আমাদের আপত্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশি বাজে বকো না। স্তিফানো প্রায় গর্জে উঠল। হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। তারপর বলল—

—মান্যবর রাজা আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে রাজবাড়ি থেকে চলে এল।

মারিয়া জানতে চাইল রাজা ডেকেছিলেন কেন? ফ্রান্সিস সব কথা বলল।

—আশ্চর্য। তুমি ঐ যোদ্ধাকে হত্যা করেছো বলে সন্দেহ করছে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। আমাকে বিপদে ফেলাই স্তিফানোর উদ্দেশ্য। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে সেনাপতির কাছে পাঠাল। কিছু পরে চারজন যোদ্ধার সঙ্গে শাঙ্কো ফিরে এল। যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে প্রান্তরে এসে নামল। পেছনে চারজন যোদ্ধাও চলল।

জেলেপাড়াঘাট বন পার হয়ে লুভিনা পাহাড়ের গুহামুখে এল। শাঙ্কো দুটো মশাল জ্বালল। শাঙ্কো আর ফ্রান্সিস মশাল হাতে গুহায় ঢুকল।

গুহার এবড়োখেবড়ো মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল সবাই। প্রায় মাঝামাঝি এসে মাথার ওপর খোঁদলের জায়গাটা পার হবার সময় ওপরের খোঁদলটা দেখল একবার। খোঁদলটা হাত দশবারো উঁচুতে। একনজর দেখে হাঁটতে শুরু করল ফ্রান্সিস।

গুহা শেষ। উত্তর দিকে সামনেই সেই অনুর্বর এলাকা। ফ্রান্সিস এবার বলল—হ্যারি এখন আমরা দেশীয় ভাষায় কথা বলবো। যোদ্ধারা কিছু কিছু স্পেনীয় ভাষা বোঝে। শোন—সামনে যে অনুর্বর লম্বাটে জায়গাটা দেখছো সেই জায়গা দিয়ে নিশ্চয়ই অন্তত একবার মৃত্যু-সায়রের বিষাক্ত জল বয়ে গিয়েছিল। কারণ গুহার ঢালটা এদিকেই। কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে বিষাক্ত জল নামল কী করে?

—কোনভাবে নেমেছে।

—জল বাইরে দিয়ে পড়ে নি। গুহার মধ্যে পড়ে এসেছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মৃত্যু-সায়রের সঙ্গে গুহাটার যোগ আছে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ আছে। এখন সেই যোগটা খুঁজে দেখতে হবে। মনে হয় আজ রাতেই সেই যোগটা খুঁজে পাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু চারজন যোদ্ধা পাহারায় থাকবে। হ্যারি বলল।

—না। ওদের নজর এড়িয়ে আমি আর শাঙ্কো আসব। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ না হয় জল নেমে এল। তাতে কী হল? হ্যারি বলল।

—মৃত্যু-সায়রের শুকনো তলদেশটা দেখতে পারবো। আমার কেমন মনে হচ্ছে ওটার তলদেশে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অসম্ভব নয়। হ্যারি বলল।

যোদ্ধারা ওদের দেশীয় ভাষা কিছুই বুঝল না। বোকার মত তাকিয়ে রইল।

—এখন ফিরে চলো। আর কিছু দেখবো না। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই ফিরে চলল। নৌকোয় উঠে মারিয়া মৃদুস্বরে বলল—গুহা দেখে কিছু হদিশ পেলে?

—প্রায়। তবে আজ রাতে সব লুকিয়ে দেখতে হবে। ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল।

ঘরে এসে ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে চিন্তা করতে লাগল। চোখ বুঁজেই ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—সেনাপতিকে বলে একটা কুড়ুল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজেই বলল।

শাঙ্কো চলে গেল। একটু পরেই একটা কুড়ুল নিয়ে ফিরল। পেছনে পেছনে সেনাপতিও এল। হেসে বলল—কুড়ুল দিয়ে কী করবে?

—মই বানাবো।

—মই? মই দিয়ে কী করবে?

—লুভিনা পাহাড়ের মাথায় উঠবো। পাহাড়ের চূড়োটা দেখা হয়নি।

—মইয়ে চড়ে চূড়োয় উঠবে? অদ্ভুত কথা শোনালে। সেনাপতি হাসতে লাগল।

—হ্যাঁ। আমরা একটু অদ্ভুত। আমাদের কান্ডকারখানাও একটু অদ্ভুত। ফ্রান্সিস হেসে বলল। সেনাপতি হাসতে হাসতে চলে গেল।

রাত হল। খাওয়াদাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—শাঙ্কো এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। গভীর রাতে লুভিনা পাহাড়ে যেতে হবে।

—রাতে কী খোঁজাখুঁজি করবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—আছে—আছে। এখনও দেখার মত কিছু আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—পাহারাদার যোদ্ধারা? শাঙ্কো বলল।

—খুব গোপনে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলল—তাহলে আমিও যাবো।

—না মারিয়া। এই কাজটা খুব গোপনে সারতে হবে। তোমাকে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমি রাজবাড়ি শুতে যাচ্ছি। কাল ভোরে এসে সব শুনবো।

মারিয়া রাজবাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ডাকল—শাঙ্কো। কুডুল আর মশাল।

—সব গুছিয়ে রেখেছি।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—হ্যারি তোমাকে আর নিয়ে যাব না।

—না-না। লোক যত কম হয় ততই ভালো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রান্তরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। ফ্রান্সিস দেখল রাজবাড়ির ছায়া পড়েছে। ও শাঙ্কোর হাত টেনে সেই ছায়ায় নিয়ে এলো। ছায়ার মধ্যে দিয়ে দুজন চলল।

প্রান্তর শেষ। বসতি এলাকার শুরু। পাহারাদারদের এলাকাটা নির্বিঘ্নে পার হওয়া গেল।

নৌকোয় খাঁড়ি পার হয়ে বনভূমি পার হয়ে যাচ্ছে তখনই শাঙ্কোকে বলল—লম্বা গাছ কেটে মই বানাতে হবে। চলো গাছ কাটতে হবে। খুঁজে খুঁজে দুটো সরু অথচ লম্বা গাছ পেল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে। সেটুকু আলো কাজে লাগাল। দুটো লম্বা গাছ কাটল। তারপর গাছের ডালগুলো কাটল। বুনো শুকনো লতা জোগাড় করে কাটা ডাল বেঁধে বেঁধে মই বানাল।

এবার লুভিনা পাহাড়ের দিকে চলল। শাঙ্কো মই কাঁধে চলল।

গুহামুখে এসে দাঁড়াল। মশাল জ্বালল। মশাল আর মই নিয়ে দু'জনে গুহায় ঢুকল। যেতে যেতে প্রায় মাঝামাঝে জায়গায় মইটা নিয়ে এল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস খোঁদলটা দেখল। তারপর মই পাতল। মইটা প্রায় মাপমত হল। শাঙ্কোকে মইটা ধরতে বলে ফ্রান্সিস মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। হাতে মশাল। মশালের আলোয় দেখল খোঁদলটা ওপরে বড়। একপাশে পাথরের থাক। সেই থাকটা আর সামনের পাথুরে অংশটা কেটে কেটে তৈরি। প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। মানুষের হাত পড়েছে এখানে। এখানে মানুষ এসেছিল কেন?

ফ্রান্সিস মশালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। তখনই স্তম্ভের মত পাথরের গায়ে একটা পাথরের ফলক মত দেখল। ফলকটা মোটামুটি কেটে মসৃণ করা। বাঁদিকে একটা পাথুরে খাঁজ। সেই খাঁজে মশালটা রেখে ফলকটায় হাত দিয়ে দেখল। কী যেন কুঁদে তোলা আছে। নিশ্চয়ই কুঁদে কিছু লেখা। ফ্রান্সিস লেখাটা পড়বার চেষ্টা করল। নাঃ কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু বুঝল স্পেনীয় অক্ষর। তাও দুর্বোধ্য। ও ফলকটা ধরে কয়েকবার নাড়া দিল। আশ্চর্য। ফলকটা নড়ে গেল। ও চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো কুডুলটা। শাঙ্কো মই বেয়ে উঠে ওকে কুডুলটা দিয়ে গেল। ও কুডুলের মাথা ফলকের কোনাগুলোতে চেপে চেপে

আস্তে ঠুকতে লাগল। ফলকটা নড়ল। তারপর আস্তে আস্তে খুলে এল। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। ফলকটা একহাতে ঝুলিয়ে নিল। মশালটা পাথুরে দেয়ালে ঘষে নিভিয়ে ফেলল।

এবার নামা। ফ্রান্সিস ফলকটা বাঁহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মই বেয়ে নেমে এল। শাঙ্কো বলল— কিছু হদিশ পেলে?

—একটা সূত্র পেয়েছি। এই ফলকটা। এটায় কিছু কুঁদে লেখা। লেখাটা কী সেটা জানতে হবে। তবে অক্ষরগুলো স্পেনীয় ভাষায়। চলো। আগে এই ফলকের পাঠোদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—মইটা কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—মইটা নিয়ে চলো। জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে মইটা নামিয়ে ধরে ধরে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বনভূমিতে ঢুকল। একটা ঝাঁকড়াপাতার গাছের আড়ালে মইটা লুকিয়ে রাখল। জায়গাটা ভালো করে দেখে রাখল ফ্রান্সিস। পরে যাতে খুঁজে পাওয়া যায়।

বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল। প্রান্তর রাজবাড়ির ছায়ায় ছায়ায় পার হয়ে নিজেদের ঘরের দরজায় টোকা দিল। হ্যারি দরজা খুলে দিল। হ্যারির হাতে পাথরের ফলকটা নিয়ে ফ্রান্সিস বলল—এটাতে কুঁদে কিছু লেখা আছে। দেখতো পড়তে পারো কিনা।

—কোথায় পেলে এটা? হ্যারি জানতে চাইল।

—সব বলছি। তার আগে লেখাটা পড়তে পারো কিনা দেখ। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। তারপর বিছানায় বসে পড়ল। হ্যারি ঘরের মশালের আলোর কাছে নিয়ে ফলকের লেখাটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজার বাগানের গাছগাছালিতে পাখির ডাক শোনা গেল। বাইরে ভোর হল।

হ্যারি পাথরের ফলকটা বিছানায় রাখতে রাখতে বলল—পড়তে পারলাম না। তবে মনে হয় প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় কিছু লেখা।

—এখন কাকে দিয়ে পড়াবো তাই ভাবছি। অথচ এই শব্দের অর্থ জানাটা খুবই জরুরী। ফ্রান্সিস বলল।

—সেনাপতিকে একবার বলে দেখতে পারো। হ্যারি বলল।

—অন্যভাবে বলতে হবে। এই ফলকের কথা বলা চলবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—সেনাপতিকেই অন্যভাবে বলো। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল—

—শাঙ্কো একবার সেনাপতিকে ডাকো। শাঙ্কো চলে গেল। তখনই মারিয়া এল। মৃদুস্বরে বলল—কিছু হদিশ করতে পারলে?

—অনেকটা এগিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পাথরের ফলকটা বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল—এই ফলকটা পেয়েছি। এটার মধ্যে কিছু

লেখা আছে। সেটার পাঠোদ্ধার করতে পারলেই গুপ্তধনের হদিশ পেয়ে যাবো।

সেনাপতি শাঙ্কোর সঙ্গে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—আপনাদের বৈদ্যি আমাকে একটা ওষুধ দিয়েছিল। তার নামটা মনে পড়ছে না। বৈদ্যিকে যদি একবার ডেকে দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বৈদ্যিবুড়োর কথা বলছো। ও তো পুরনো আমলের লোক। ওর চিন্তাভাবনা সবই পুরোনো আমলের। এমন সব ওষুধের নাম বলে যার অর্থই আমরা বুঝি না। সেনাপতি বলল।

—তাই বলছিলাম যদি বৈদ্যিকে একবার ডেকে দেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। লোক পাঠাচ্ছি। সেনাপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিসদের এক চিন্তা—বৈদ্যিবুড়ো কি শব্দটা পড়তে পারবে? অর্থটা বলতে পারবে?

কিছুক্ষণ বাদেই বৈদ্যিবুড়ো কাঠের বোয়াম ঝোলায় নিয়ে এল।

—কার কী হয়েছে? বৈদ্যিবুড়ো বিছানায় বসল।

—সব বলছি। তার আগে একটা কথা। আপনি তো পুরোনো আমলের লোক। পুরোনো স্পেনীয় শব্দের অর্থ বলতে পারবেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কী শব্দ? আমি প্রাচীন স্পেনীয় ভাষা মোটামুটি জানি। বৈদ্যি বলল।

—আর একটা কথা অতীতের রাজা মুস্তাকিম কি স্পেনীয় ভাষা মানে—প্রাচীন ভাষা জানতেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কী যে বলো। রাজা মুস্তাকিম বিদেশেও ব্যবসার কাজে যেতেন। স্পেনীয় পোর্তুগীজ ইংরেজি ভালো জানতেন। বেশ খেয়ালি মানুষ হলেও যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। বৈদ্যি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে পাথরের ফলকটা বের করল। বিছানায় ফলকটা পেতে বলল—এই পাথরের ফলকে কিছু কুঁদে লেখা আছে—দেখুন তো আপনি এর অর্থ বোঝেন কিনা।

—এই পাথরের ফলক কোথায় পেলে? বৈদ্যি জানতে চাইল।

—সামনের প্রান্তরের পূবকোনায় মাটির নিচে। ফ্রান্সিস মিথ্যে করে বলল।

—ও দেখি তো। বৈদ্যিবুড়ো মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলল—প্রাচীন স্পেনীয় শব্দ। যতদূর বুঝতে পারছি কথাটা হল—এ বিয়ের্তো ইনন্দার।

—তার মানে। ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

—মুক্ত ধারা। বৈদ্যিবুড়ো বলল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ বৈদ্যিবুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উচ্ছ্বাস গোপন করে বলল—

—ঠিক আছে। আমাদের কারো অসুখ করেনি। আপনি যেতে পারেন। বৈদ্যিবুড়ো ঝোলা হাতে বেরিয়ে যেতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে চাপাস্বরে বলে উঠল—হ্যারি রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনভান্ডার হাতের মুঠোয়। শাঙ্কো মারিয়া কেউই ফ্রান্সিসের কথা থেকে কিছুই বুঝল না। শুধু হ্যারি বলল—

—সাবাস ফ্রান্সিস।

এবার ফ্রান্সিস শান্ত হয়ে বিছানায় বসল। তারপর চাপাস্বরে বলল—আজ রাতে আবার লুকিয়ে লভিনা পাহাড়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজল। কী করতে হবে তাই ভাবতে লাগল।

গভীর রাত তখন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল। দুটো মশাল নিয়ে তৈরি হলো। ফ্রান্সিস কুড়ুলটা নিল।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে উজ্জ্বল জোৎস্না। রাজবাড়ির ছায়ার আড়ালে আড়ালে বসতি এলাকায় ঢুকল। নৌকোয় উঠে খাঁড়ি পার হয়ে বনভূমিতে ঢুকল। একটু খুঁজতেই মাটিতে শুইয়ে রাখা মইটা পেল। শাঙ্কো মই কাঁধে চলল।

গুহার মুখ দিয়ে ঢুকলো দু'জনে। ফ্রান্সিস সেই খোঁদলের কাছে এসে মই পাতল। শাঙ্কো চকমকি পাথরে লোহা ঠুকে আগুন জ্বালল। দু'টো মশালে। ফ্রান্সিস বলল—এবার শাঙ্কো—তুমি গুহার দক্ষিণদিকে গিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। সাবধান। উত্তরে ঢালের দিকে যাবে না আর বাইরে গিয়ে মশাল নিভিয়ে ফেল।

ফ্রান্সিসের কথামত শাঙ্কো দক্ষিণদিক দিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল। মশাল নিভিয়ে ফ্রান্সিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ফ্রান্সিস একহাতে জ্বলন্ত মশাল আর অন্যহাতে কুড়ুল নিয়ে ভারসাম্য রেখে আস্তে আস্তে মই বেয়ে সেই খাঁজটার জায়গায় এসে দাঁড়াল। পাথরের দেয়ালে গর্ত ছিল। সেখানে মশালটা ঢুকিয়ে রাখল। তারপর যে পাথরে ফলকটা বসানো ছিল সেই পাথরে কুড়ুলের ঘা মারতে লাগল। কুড়ুলের ঘায়ের শব্দ গুহায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখনই ও কুড়ুলের ঘা সাবধানে মারতে লাগল যাতে বেশি শব্দ না হয়।

পরপর কয়েকটা জোর ঘা পড়তেই পাথরটা দু'ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ল। ঝরঝর্ করে হলদেটে জলের ধারা নেমে এল। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল—মৃত্যু-সায়রের জল। ও খাঁজের দেয়ালে পিঠ চেপে দাঁড়াল যাতে বিষাক্ত জলের ছিঁটে না লাগে। জল পড়তে লাগল।

গুহার বাইরে দাঁড়ানো শাঙ্কো কুড়ুলের ঘায়ের জল পড়ার মৃদু শব্দ শুনল। বুঝল মৃত্যু সায়রের জলই পড়ছে। এই ওর চিন্তা হল এই বিষাক্ত জল যদি ফ্রান্সিসের গায়ে লাগে। তবে এটা ভাবল ফ্রান্সিস সব দিক ভেবেই ঐ জল নামিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জলপড়া বন্ধ হল। মৃত্যু-সায়রে জল নিঃশেষ। তবু টুপটাপ্ জল পড়ছিল। সেটাও যেন গায়ে না লাগে। সাবধান হল ফ্রান্সিস। ও অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টুপটাপ জল পড়াও বন্ধ হল। ফ্রান্সিস মশালটা তুলে নিয়ে মই বেয়ে নিচের দিকে নামল। মই থেকেই দেখল ওর অনুমান সঠিক। বিষাক্ত জলধারা উত্তরের ঢাল বেয়ে গুহার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এইবার ও চিন্তায়

পড়ল। গুহার মেঝেয় অল্প হলেও কিছু পরিমাণ বিষাক্ত জল জমে আছে। পা ফেলা যাবে না। জল যাতে না লাগে তার উপায় ভাবতে হল। ও ভাবল ওপরে পাথরের চাঙর দিয়ে যে বা যারা ঐ 'মুক্তধারা' কথাটি ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ করেছিল তারা নিশ্চয়ই মই ব্যবহার করে নি। অন্য কোন পথে ঐ খাঁজে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বা তাদের জলের স্পর্শ এড়াতে হয়েছিল। সেই পথ ওখানেই আছে যে পথ দিয়ে সে বা ওরা ওখানে এসেছিল আবার বেরিয়েও গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস মশাল হাতে মই বেয়ে ওপরের পাথরের খাঁজে উঠে এল। তারপর মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। বার কয়েক মশাল ঘোরাতেই নজরে পড়ল একটা ছোট মুখ। কাছে গিয়ে দেখল একটা সুড়ঙ্গের মুখ। আগে এই সুড়ঙ্গমুখ ওর নজরে পড়ে নি।

সুড়ঙ্গের মুখের কাছে গেল। ভেতরে তাকিয়ে দেখল অন্ধকার। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা ছুঁড়ে দিল সুড়ঙ্গের মধ্যে। একটু দূরে গিয়েই পড়ল মশালটা। মশালের আলোয় দেখল ভেতরটা মুখের মত ছোট নয়। বড়ই।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। তারপর মাথা ঢুকিয়ে শরীর হিঁচড়ে টেনে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকল। সুড়ঙ্গের এবড়োখেবড়ো মেঝে দিয়ে চলল মশালটার দিকে।

মশালের কাছে এল। আবার ছুঁড়ে দিল মশালটা। মশালটা কিছু দূরে পড়ল। আমার শরীর হিঁচড়ে টেনে চলল। মশালের কাছে এসেই দেখল একটু দূরে সুড়ঙ্গের মুখ। অস্পষ্ট চাঁদের আলো ঐ মুখে। আবার হিঁচড়ে চলল। সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড় গাছগাছালি।

হাঁপাতে হাঁপাতে চলল গুহামুখের দিকে। গুহামুখে এসে দেখল—শাঙ্কো দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসতে বসতে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো গুহামুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে পিছু ফিরে তাকাল। দেখল ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসে হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিসের সারা গায়ে ধূলোবালি। নতুন জামার এখানে ওখানে ছেঁড়া। শাঙ্কো বলে উঠল—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

—অক্ষত ফিরে এসেছ। এটাই যথেষ্ট। ফ্রান্সিস হাতের মশাল নেভাল।

—গুহার ভেতরে কুড়ুলের শব্দ জলের শব্দ। কী ব্যাপার? শাঙ্কো বলল।

—সব বলবো। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—ভোর হতে দেরি নেই। শেষ কাজটা এখনো বাকি। চলো।

—কোথায়? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—মৃত্যু-সায়রে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? শাঙ্কো বলল।

—গিয়ে দেখবে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

দুজনে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছু পরে মৃত্যু-সায়রের পাশে শুকনো ডালের গাছটার কাছে এল। ঢাল বেয়ে দু'জনে নেমে মৃত্যু সায়রের মধ্যে তাকাল। মৃত্যু সায়র জলশূন্য। পড়ে আছে একটা নরকঙ্কাল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—সেই যোদ্ধার কঙ্কাল। আমাকে যে হত্যা করতে চেয়েছিল।

—বিষাক্ত জল কোথায় গেল? শাঙ্কো তখনও ঠিক বুঝতে পারছিল না।

—সব বিষাক্ত জল গুহায় নেমে গেছে। ভালো করে নিচে তাকিয়ে দেখ। শাঙ্কো চাঁদের আলোয় দেখল মৃত্যু-সায়রের তলদেশে হীরের অলঙ্কার সোনার মুকুট। আরো কী কী রয়েছে। শাঙ্কো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল তাহলে—

—হ্যাঁ। রাজা মুস্তাকিমের গুপ্ত ধনভান্ডার। মশাল জ্বালো। আরো দেখতে পাবো। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালটা মৃত্যু-সায়রে ছুঁড়ে ফেলল।

দপ্ করে মৃত্যু-সায়রের গন্ধকের স্তরে আগুন লেগে গেল। ফ্রান্সিস সরে যেতে যেতে বলে উঠল—বিষাক্ত ধোঁয়া বেরুবে। সরে এসো।

ওরা গাছটার কাছে উঠে এল। মৃত্যু-সায়র থেকে নীলচে ধোঁয়া বেরোতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়া কেটে গেল। মৃত্যু-সায়রের ধারে এসে দাঁড়াল দু'জনে। তখনও মৃত্যু-সায়রের তলদেশে অল্প আগুন জ্বলছিল। সেই আগুনের আলোয় দেখা গেল তলদেশে কত সোনার চাকতি হীরে মণিমানিক্য ছড়ানো। শাঙ্কো খুশিতে মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

—এখন এই ধনসম্পদ তুলবে না? শাঙ্কো বলল।

—না। সে সব রাজা করবেন। তিন চারদিন পর। ভোর হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি নেমে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে বেশ দ্রুতই নেমে এল পাহাড় থেকে। তখন বনভূমিতে পাখিদের কাকলি শুরু হয়েছে। বনভূমি পার হতে হতে সূর্য উঠল।

দুজনে যখন নিজেদের ঘরের কাছে এল তখনই দেখল সেনাপতি আসছে।

ফ্রান্সিস দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল। ওর ধূলোবালি মাখা পোশাক দেখলে সেনাপতির সন্দেহ হতে পারে। ফ্রান্সিসের অবস্থা দেখে মারিয়া কিছু বলতে গেল। ফ্রান্সিস মুখে আঙ্গুল দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল।

সেনাপতি প্রান্তরে নেমে চলল রাজবাড়ির পেছনের দিকে। ফ্রান্সিস দেখে নিশ্চিত হল। বলল—মারিয়া আমার পুরোনো পোশাকটা নিয়ে এসো। মারিয়া দ্রুত হেঁটে রাজবাড়িতে চলে গেল। ফিরল ফ্রান্সিসের আর একটি নতুন পোশাক নিয়ে। ফ্রান্সিস পোশাক নিয়ে স্নান করতে গেল।

মারিয়ারা ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। হ্যারি একটু অধৈর্য হয়ে বলল—শাঙ্কো ফ্রান্সিস রাজা মুস্তাকিমের ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পেরেছে?

—হ্যাঁ। শাঙ্কো হেসে বলল।

—সত্যি? মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

—রাজকুমারী—আস্তে। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস আসুক সেই সব বলবে।

স্নান সেরে ফ্রান্সিস ঘরে এল নতুন পোশাক পরে। মারিয়া অনুচ্চস্বরে বলল—তুমি নাকি—। ফ্রান্সিস হেসে ওকে হাতের চেটো দেখিয়ে থামিয়ে

বলল—সব বলছি। তার আগে সকালের খাবারটা খেয়ে নি। খাওয়ার ঘরে চলো।

সবাই খেতে চলল। ওরা খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে এল।

সবাই বিছানায় বসলে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—গুহাটা দেখার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। উত্তরের দিকে গুহার ঢাল। সেটার মুখের পরেই নিচে লম্বালম্বি অনুর্বর লম্বাটে একটা অংশ। একটা ঘাসও নেই। অথচ ও জায়গার দুপাশে বন গাছপালা। কেন এরকম হল? নিশ্চয়ই কিছু ও জায়গায় ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কী বয়ে যেতে পারে? সোজা উত্তর মৃত্যু-সায়রের বিষাক্ত জল। তাহলে সেই জল বেরোবার পথ গুহার মধ্যে আছে। অতীতের রাজা মুস্তাকিম ঐ পথ লোক লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একটা ফলকও গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। তাতে উৎকীর্ণ ছিল—একটা প্রাচীন স্পেনীয় শব্দ—এ বিয়োর্তা ইনান্দার। অর্থ মুক্তধারা। সুতরাং আমি নিশ্চিত হলাম এই ফলক আটকানো পাথরটা ভাঙলেই মৃত্যু-সায়রের জল নেমে আসবে। আমি তাই করেছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রাজা মুস্তাকিম খেয়ালি রাজা ছিলেন। একা একা বনভূমিতে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। এই তথ্য থেকে আমার সন্দেহ হয় ঐ মৃত্যু-সায়রেই উনি তার ধনরত্ন ফেলে দিতেন। সকলের অগোচরে। মৃত্যু-সায়রে নেমে ধনরত্ন চুরি করা অসম্ভব। অতএব মৃত্যু-সরোবর থেকে বিষাক্ত জল নামাতে হবে।

তারপর ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলে গেল কীভাবে ও বিষাক্ত জল নামিয়েছে। শুকনো মৃত্যু সায়রে কীরকম ধনরত্ন ওরা দেখেছে তাও বলল।

—সাবাস ফ্রান্সিস। এখন কী করবে? মারিয়া বলে উঠল।

—আজ সন্ধ্যেবেলা রাজাকে সব জানাবো। আমি স্তিফানোকে বিশ্বাস করি না। ধনরত্ন উদ্ধার হয়েছে এটা জানতে পারলে ও আসল চেহারা ধরবে। তখন রাজাকে হত্যা করতে পারে। আমাদেরও বন্দী করতে পারে। অতএব রাজাকে খুব সাবধানে ঐ ধনরত্ন উঠিয়ে আনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিস বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। ডাকল—হ্যারি। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল। তারপর রাজবাড়ির দিকে দুজনে চলল।

সদর দরজায় দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল—

—রাজামশাইকে বলো আমরা বিদেশীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। খুব বিশেষ প্রয়োজন।

একজন প্রহরী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বলল—চলুন। ফ্রান্সিসরা প্রহরীর পেছনে পেছনে রাজবাড়ির মন্ত্রণাকক্ষে এল। আসনে বসল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা এলেন। বললেন—কী ব্যাপার?

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়ে বসে পড়ল। তারপর ফ্রান্সিস বলল—মান্যবর রাজা—আমরা কাল সকালে চলে যাচ্ছি। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—ও। তাহলে আমাদের এক পূর্বপুরুষের ধন ত্নর ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে না। রাজা বললেন।

—না। আমরা সেই ধনরত্নের গোপন ভাণ্ড খুঁজে পেয়েছি।

—বলো কি? রাজা প্রোফেন প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—কোথায় সেই ধনরত্নের ভাণ্ডার?

—লুভিনা পাহাড়ের মৃত্যু-সায়রে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ সাংঘাতিক বিষাক্ত জলে নামবে কে? রাজা বললেন।

—এখন ঐ মৃত্যু-সায়রে জল নেই। কয়েকদিন পরে একফোঁটা জলও থাকবে না। তখন আপনি সেই ধনভাণ্ডার তুলে আনতে পারবেন। কিন্তু এরমধ্যে আদেশ জারি করে দিন মৃত্যু-সায়রে যেন কেউ না যায়।

—আদেশ জারির দরকার নেই। কেউ ওখানে যেতে সাহস পায় না। রাজা বললেন।

—তবু আদেশ জারি করবেন। আর একটা কথা—আপনার মন্ত্রী স্তিফানো যেন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ না পায়। সমস্ত ব্যাপারটাই আপনি গোপন রাখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই হয়তো কোনভাবে জানতে পারে। রাজা বললেন।

—আপনি সে ব্যাপারে সাবধান হবেন। আমি কারো সম্বন্ধে অন্য কাউকে কিছু বলি না। সহজে দোষারোপও করি না। কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি—স্তিফানো অত্যন্ত শঠ ও নির্দয়। ও ধনভাণ্ডারের সংবাদ পেলে আপনার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। তাকে বিশ্বাস করবেন না—এই অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন তাহলে কী করবো? রাজা বললেন।

—কয়েকদিন অপেক্ষা। আমি আগুন জ্বেলে জল অনেকটা শুকিয়ে দিয়েছি। কয়েকদিন সূর্যালোক পেলে সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। তখন নেমে ধনসম্পদ তুলে নেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তাই করবো। রাজা বললেন।

—আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্তজন কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেনাপতি। মন্ত্রী স্তিফানোর প্রতি তাঁর রাগ আছে। রাজা বললেন।

—সেটাই স্বাভাবিক। সেনাপতিকে স্তিফানো কোন পাত্তাই দেয় না। যাহোক সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে কোন গভীর রাতে মৃত্যু-সায়র থেকে ধনরত্ন তুলে নিয়ে আসুন। আপনি একা পারবেন না। কিন্তু ধনভাণ্ডারের কথা গোপন রাখবেন। বিশেষ করে স্তিফানোর কাছ থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তাই হবে। কিন্তু তোমরা ধনভাণ্ডার উদ্ধার করলে। তোমাদের তো কিছু প্রাপ্য হয়। রাজা বললেন।

—আমরা কিছুই চাই না। বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে উদ্ধার করলাম এতেই আমরা খুশি। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।

—আপনার জন্যেই আমরা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম। হ্যারি বলল।

—তা'হলে চলি। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে রাজবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

পরদিন ভোরে মারিয়া রাজবাড়ি থেকে চামড়ার থলে আর কাপড়ের বোঝা নিয়ে চলে এল ফ্রান্সিসদের ঘরে। সৈন্যাবাসে গিয়ে ঘর থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এল। প্রান্তর পার হয়ে জেলেপাড়ার ঘাটে এল। ওরা দুজন নৌকোয় উঠল। দাঁড় বাইতে লাগল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। খাঁড়ি পার হয়ে নৌকো দুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে পড়ল। দ্রুত নৌকো চালিয়ে ওরা ওদের জাহাজের কাছে এল। শাঙ্কো ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। সেই ধ্বনি শুনে জাহাজে ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজন ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। বন্ধুরা জাহাজ থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিল। ফ্রান্সিসরা মই বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুরা ছুটে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। সবাই জানতে চায় ফ্রান্সিস গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পেরেছে কিনা। ফ্রান্সিস বলল—বড় ক্লান্ত। শাঙ্কো সব বললে। সবাই শাঙ্কোর কাছে এল। শাঙ্কো হাত পা নেড়ে ফ্রান্সিসের অভিযানের কাহিনী বলতে লাগল।
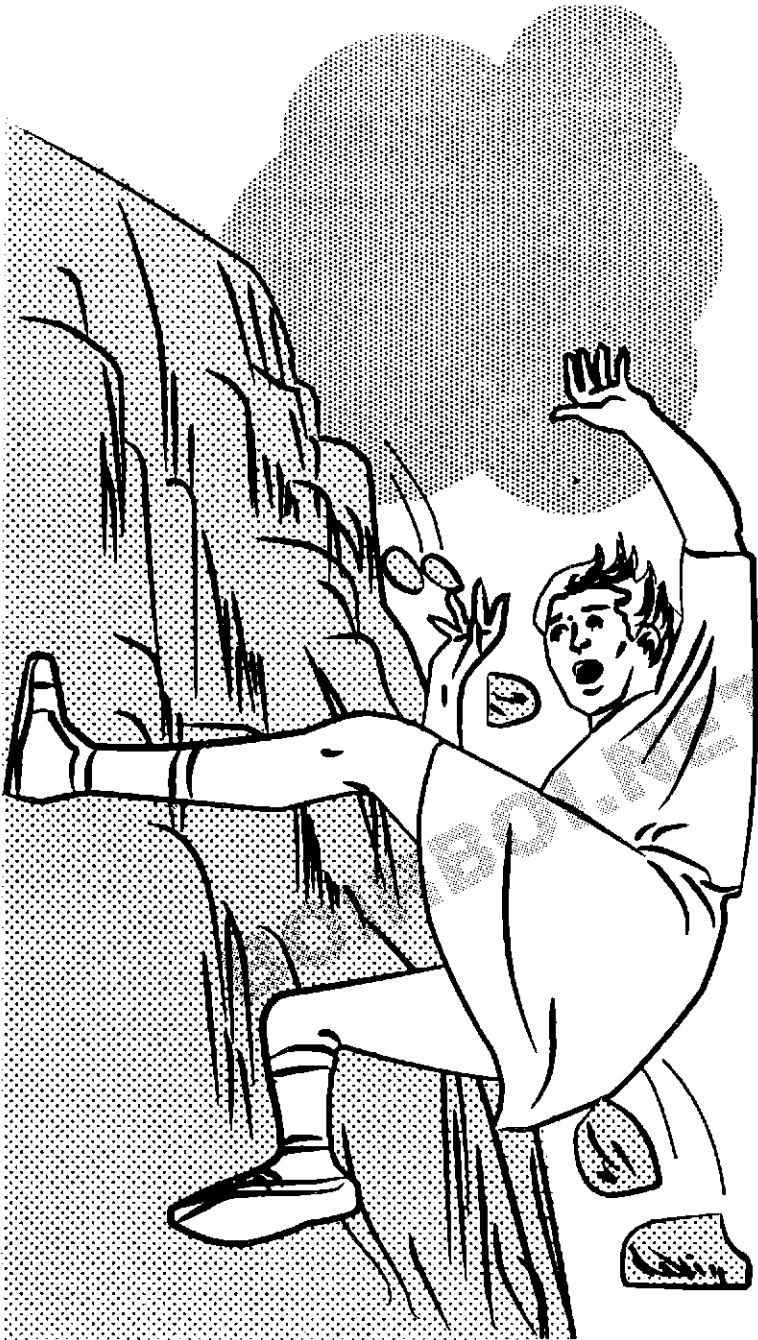
সেদিন ভোর থেকে জোর বাতাস ছুটেছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। আকাশ মেঘলা তবে বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জোর হাওয়ায় সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে জাহাজের গায়। জাহাজের জোর দুলুনির মধ্যে ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। জাহাজের কাজ সহজ নয়। ডেক ধোয়া মোছা। বাতাসের গতি বুঝে পাল ঘোরানো। রান্নার জায়গা খাবারের জায়গা পরিষ্কার রাখা। প্রায় পঁচিশ তিরিশজনের রান্না করা চার বেলা খাবার তৈরি করা। কাঠের বাসনটাসন ধোয়া। দু'চারজন অসুস্থ বন্ধু থাকেই। তাদের জন্যে পথ্যর ব্যবস্থা। চিকিৎসা। শুশ্রুষা। শুশ্রুষার কাজটা মারিয়াকেই করতে হয়। এর মধ্যেই দিক ঠিক রেখে ফ্লেজার আর শাঙ্কো দু'জন মিলে জাহাজ চালায়। জাহাজের পালের মেরামতির কাজও চালাতে হয়। এ ভাবেই দিন কাটে ভাইকিংদের। এর মধ্যেই জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ডেকএ উঠে আসে সবাই। নাচগানের আসর বসে মাঝে মাঝে। সুকণ্ঠী সিনাত্রা ওদের দেশের চাষীদের, ভেড়াপালকদের, মাঝিদের গান গায়। শাঙ্কো খালি পীপেয় থাবড়া দিয়ে দিয়ে তাল দেয়। দু'চারজন কাঠের ডেক-এ থপ্ থপ্ শব্দ তুলে নাচে। সেই নাচে ফ্রান্সিসকে মারিয়াকেও অংশ নিতে হয়। নাচগান জমে ওঠে। একসময় নাচগান শেষ হয়। ক্লান্ত ভাইকিংরা অনেকেই ডেক-এই এখানে-ওখানে শুয়ে পড়ে। বাকিরা কেবিনঘরে ফিরে আসে। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবেই দিনরাত কাটে ভাইকিংদের।

এর মধ্যে ওদের নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি হয়। ঝগড়া বাড়াবাড়ি হলে ফ্রান্সিসের শরণাপন্ন হয় ওরা। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। জাহাজে ফ্রান্সিসের কথাই শেষ কথা। ঝগড়া মিটে যায়। বন্ধুরা পরস্পর হাত ধরে ঝগড়া মিটিয়ে নেয়। ফ্রান্সিসকে ওরা বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। ফ্রান্সিসের নির্দেশ মেনে চলে। ফ্রান্সিসের কড়া নির্দেশ—যত ঝগড়া হোক মনমালিন্য হোক মারামারি করা চলবে না। ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসের নির্দেশ মেনে চলে। তাই পরস্পরে মারামারির মত কোন ঘটনা ঘটে না। সবাই শান্তিতে থাকে।

দিন যায় রাত যায়। জাহাজ চলেছে। দিন দশ পনেরো হয়ে গেল ডাঙার দেখা নেই। মাস্তুলের মাথায় বসে পেড্রো দিন রাত নজর রাখে। ওর নজর—কোন জলদস্যুদের জাহাজ আসছে কিনা আর ডাঙা দেখা যায় কিনা।

একদিন দুপুরে ফ্রান্সিসদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সবে শেষ হয়েছে। ওরা শুনল পেড্রোর চিৎকার করে বলা—ভাই সব—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি তখন ডেক-এই ছিল চেঁচিয়ে বলল—কোনদিকে? পেড্রো ডানদিকে দেখিয়ে গলা তুলে

বলল—ডানদিকে? হ্যারি ডানদিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে সমুদ্রতীর দেখল। একটা বন্দর বলেই মনে হল। দুটো জাহাজ নোঙর করা। তারপর টানা বালি-ঢাকা জমি। আরো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুও জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। বন্দর বালি-ঢাকা প্রান্তর দেখল।

হ্যারি দ্রুত পায়ে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে নেমে এল। বন্ধ দরজা খুলে ফ্রান্সিস তখনই বেরিয়ে এল। বলল পেড্রোর কথা শুনেছি। চলো—কোথায় এলাম দেখি। মারিয়াও—চলো। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে জাহাজের ডেকএ উঠে এল। ততক্ষণে জাহাজ ডাঙার অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিসরা রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। তখনই দেখল সেই বালি ঢাকা প্রান্তরের বাঁ দিক থেকে একদল যোদ্ধা খোলা তরোয়াল আর বর্শা হাতে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। তাদের তরোয়ালে দুপুরের রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। তাদের গায়ে কালো কাপড়ের পোশাক। তখনই ডানদিক দিয়ে দেখা গেল আর একদল যোদ্ধা খোলা তরোয়াল বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে। তাদের পোশাক নানা রঙের। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু'দল যোদ্ধা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল লড়াই। তরোয়ালে তরোয়ালে বর্শায় বর্শায় ঠোকাঠুকির শব্দ শুরু হল। সেই সঙ্গে চিৎকার আহতদের গোঙানি আর্তস্বর। দেখতে দেখতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমরা এক লড়াইয়ের মধ্যে এসে পড়লাম। আমরা কী করবো?

—নীরব দর্শক। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—জাহাজ ঘোরাতে বল। এখানে নামবো না আমরা। মারিয়া বলল।

—লড়াইয়ের শেষটা দেখি। এই লড়াইয়ে তো আমরা জড়াবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে আর এখানে থাকবো কেন? হ্যারি বলল।

—এটা তো জানতে হবে কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—এই লড়াইয়ের পরিবেশে? হ্যারি একটু অবাক হয়েই বলল।

—আরে বাবা-লড়াই তো একসময়ে থামবে। কোন পক্ষ তো জিতবে? তাদের কাছেই জানবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বড্ড বেশি ঝুঁকি নিচ্ছো ফ্রান্সিস। এই দুই দলের লোক কারা কেমন আমরা জানি না। যারা জিতবে তাদেরও পরিচয় আমরা জানি না। তাদের কাছে সব জানতে গেলে বিপদেও পড়তে পারি। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। বিপদ হতে পারে। তবে খোঁজ খবরটা সাবধানে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি আর কোন কথা বলল না। মারিয়া বলে উঠল—এসব মারামারি কাটাকাটি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমি চললাম। মারিয়া চলে গেল।

লড়াই ততক্ষণে শেষের দিকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রঙ-বেরঙের পোশাকপরা যোদ্ধারা হেরে যাচ্ছে। ওদের সংখ্যা কমে আসছে। তখনও অক্ষত থাকা তারা অনেকেই ছুটে পালাচ্ছে। কালো পোশাকপরা যোদ্ধারা তাদের ধাওয়া করছে। যোদ্ধাদের পায়ের চাপে ধূলোবালি উড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙবেরঙের পোশাকপরা অনেকেই মারা গেল নয়তো আহত হয়ে বালির ওপর পড়ে রইল।

লড়াই শেষ। কালো পোশাকপরা যোদ্ধারা সোৎসাহে খোলা তরোয়াল শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিজয় উল্লাসে মাতল। তারপর পশ্চিমমুখো যেতে লাগল। বোঝা গেল—ওদিকেই রঙবেরঙের পোশাকপরা যোদ্ধাদের দেশ।

—লড়াই থেমে গেছে। কিন্তু যুদ্ধে যে কালোপোশাক পরা যোদ্ধাদের জয় হল তারা তো চলে গেল। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাদের জাহাজ এখানেই থাকবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করে বলল।

বিকেল হয়ে এল। বিজয়ী যোদ্ধাদের কোলাহল আর শোনা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস হ্যারি নিজেদের কেবিনঘরে ফিরে এল। ভাইকিং বন্ধুরা যারা রেলিং ধরে লড়াই দেখছিল তারাও অনেকে নিজেদের কেবিনঘরে নেমে এল। কয়েকজন অবশ্য ডেক-এই বসে রইল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। আবার। সূর্যাস্ত দেখতে মারিয়া প্রতিদিন ডেক-এ উঠে আসে। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিমের আকাশে হালকা মেঘের গায়ে নানা রঙের খেলা চলেছে। একসময় সব রঙ মিলিয়ে গিয়ে আকাশে গভীর কমলা রঙ ছড়িয়ে পড়ল। একটা বিরাট কমলা রঙের থালার মত সূর্য দিগন্তে নেমে এল। সূর্য অস্ত গেল। বেশ কিছুক্ষণ পশ্চিম আকাশে কমলা রঙ ছড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে সেই রঙ মুছে গেল। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এল। মারিয়া কেবিনঘরে চলে এল।

ফ্রান্সিস কেবিনঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বিছানায় বসে ছিল। মারিয়া মোমবাতি জ্বালতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—অন্ধকারই থাক। আলো জ্বেলো না। মারিয়া আর আলো জ্বালল না। বিছানায় বসতে বসতে মারিয়া বলল—ডাঙায় নামবে না?

—হ্যাঁ। নামতে তো হবেই। তবে এখন নয়। কাল সকালের খাবার খেয়ে নামবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে তো দেখলাম দুই দলে লড়াই চলছে। এই পরিবেশে নামাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—উপায় নেই। খোঁজ খবর করতেই হবে।

—বিপদে পড়বে না তো।

—বিপদ তো যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। বিপদের আশঙ্কাটা বড় করে দেখলে তো হাত পা ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয়।

তাতে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। ধরো—কোনরকম খোঁজখবর করলাম না। জাহাজ যেদিকে খুশি চলল। তাহলে কি কোনদিন স্বদেশে পৌঁছতে পারবো? উল্টে আরো বড় বিপদে পড়বো। কাজেই খোঁজ খবর নিয়ে দিক ঠিক রেখে জাহাজ চালাতে হবে। বিপদের আশঙ্কায় চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। বিপদ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। বিপদের কথা ভেবে লাভ নেই। তাতে মন দুর্বল হয়ে পড়ে। মনটা শান্ত রাখতে হবে।—ফ্রান্সিস বলল।

—আমি আর কী বলবো। তুমি তোমার মতোই চল। মারিয়া বলল।

—তোমার অভিমান হল। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—না-না। অভিমান হতে যাবে কেন। মারিয়া বলল।

—যাক্ গে—এসব নিয়ে তুমি ভেবো না। তুমি খুশি থাকো।

—ঠিক আছে। মারিয়া বলল

—এবার আলো জ্বালো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বিছানা থেকে উঠে মোমবাতি জ্বালল। ঘরে আলো ছড়ালো। ফ্রান্সিস মোমবাতির আলোর দিকে তাকিয়ে একইভাবে বসে রইল।

রাত বাড়ল। সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিল। তারপর কেবিন ঘরে ডেক-এর ওপরে সবাই শুয়ে পড়ল। সারাদিন গরমের পর এখন সমুদ্রের জলেভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন গভীর রাত। শাঙ্কো ডেক-এর ওপর হালের কাছে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর ঘুম। হঠাৎ কীসের খোঁচা লেগে ঘুম ভেঙে গেলো ও ধড়মড় করে উঠে বসল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল কালো পোশাকপরা একজন যোদ্ধা ওর বুকের ওপর তরোয়াল চেপে ধরেছে। ও চারপাশে তাকাল। দেখল একদল কালো পোশাক পরা যোদ্ধা বন্ধুদের ঘিরে ধরেছে। সবার হাতে খোলা তরোয়াল। কয়েকজনের বর্শা। এই কালো পোশাকপরা যোদ্ধাদের শাঙ্কো দেখেছে লড়াই করতে আর লড়াইয়ে জিতে উল্লাস প্রকাশ করতে। তারপর পশ্চিমমুখো চলে যেতে। তাহলে ওরাই ফিরে এসে ওদের জাহাজ দখল করেছে।

ওরা জনকয়েক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। ততক্ষণে। উদ্দেশ্য কেবিনঘরের বন্ধুদের বন্দী করা। এখন তাকিয়ে, তাকিয়ে দেখা ছাড়া কোন উপায় নেই। নিরস্ত্র ওদের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু করার নেই।

কিছু পরে ফ্রান্সিসরা নিচের কেবিনঘর থেকে ডেক-এ উঠে এল। প্রত্যেকের পেছনে একজন করে কালো পোশাকপরা যোদ্ধা। মারিয়াও রেহাই পেল না। তাকেও উঠে আসতে হল।

ফ্রান্সিসদের সবাইকে ডেকএ বসানো হল। কালো পোশাকপরা যোদ্ধারা ওদের চারপাশ

থেকে ঘিরে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের মধ্যে থেকে একজন রোগা লম্বা যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। শরীরের তুলনায় ভারি গলায় বলল—তোমাদের দলনেতা কে? ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বলল—আমি। যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—

—তোমাদের পরিচয় বলো। ভাঙা ভাঙা পোতুর্গীজ ভাষায় বলল।

—আমরা ভাইকিং। বিদেশি। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে এসেছো কেন? যোদ্ধাটি জিজ্ঞেস করল।

—এমনি। এ বন্দর সে বন্দর ঘুরে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—উঁহু। তোমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। যোদ্ধারা বলল।

—আমাদের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—ধনসম্পদ লুঠ করা। তোমরা লুঠের দল। যোদ্ধাটি বলল।

—আমরা লুঠেরা হলে বেশ কিছু সম্পদ আমাদের জাহাজে থাকতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—থাকতে পারে বৈ কি। যোদ্ধাটি বলল।

—তাহলে জাহাজ তল্লাশী নিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো নেবই যোদ্ধাটি বলল।

—কিছুই পাবেন না। কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। যোদ্ধাটি বলল।

—কেন? আমরা কী এমন অপরাধ করেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—যে সব আমাদের রাজা আনোতার বুঝবেন। সকালে তোমাদের রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। রাজা আনোতারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশা কম। তোমাদের বন্দী করেই রাখা হবে। যোদ্ধাটি বলল।

—আপনার পরিচয় জানতে পারি? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়ই। আমি রাজা আনোতারের সেনাপতি। সেনাপতি বলল।

—ও। তা এখন আমাদের নিয়ে কী করবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এখন তোমাদের এখানেই রাখা হবে। তারপর তল্লাশী চলবে। সেনাপতি বলল।

—বেশ। আপনার মর্জি। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি ছ'সাতজন যোদ্ধার একটা দল করল। হুকুম দিল—জাহাজ লুঠ করো। যোদ্ধাদের দলটি সিঁড়ি দিয়ে নিচে কেবিনঘর গুলোর দিকে ছুটল। ওরা তল্লাশী শুরু করল।

পূবের আকাশে কমলা রঙ ধরল। অল্পক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠল।

তল্লাসী শেষ। তল্লাশী চালাচ্ছিল যারা তারা ফিরে এল। একজন যোদ্ধা একটা রুমালে বাঁধা কিছু সোনার চাকতি সেনাপতিকে দিল। রুমালটা মারিয়ার।

—তেমন কিছু পেলেন? ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল।

---না। সেনাপতি মাথা নাড়ল।

---তাহলেই বুঝতে পারছেন যে আমরা লুঠেরার দল নই। ফ্রান্সিস বলল।

---ঠিক আছে। আগে রাজসভায় চল। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসের পাশেই মারিয়া বসেছিল। মৃদুস্বরে বলল---আমার বড় পছন্দের রুমালটা।

---দুঃখ করো না। ওর বদলে পাঁচটা ভালো রুমাল কিনে নিও। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল---মারিয়ার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। স্বর্ণমুদ্রাগুলো ও লুকিয়ে রেখেছিস বলেই দুতিনবার আমাদের জাহাজ লুঠ হলেও ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলোর হদিস কেউ পায় নি। এবার মারিয়া একটু অভিমানের সুরে বলল---আমি আর একটা বুদ্ধিমতীর মত কথাও বলেছিলাম।

---হুঁ। তুমি এখান থেকে চলে যেতে বলেছিলে। ফ্রান্সিস বলল।

---এবার বোঝ---আমার মতটা ঠিক ছিল কিনা। মারিয়া বলল।

---হুঁ। কিন্তু লড়াইয়ে জিতে যোদ্ধার দল চলে গিয়েছিল। ওরা ফিরে এসে আমাদের জাহাজ দখল করবে অতটা ভাবি নি। ফ্রান্সিস বলল।

---সেটাই তো হল। মারিয়া বলল।

---ঠিক আছে। দেখা যাক এরা আমাদের নিয়ে কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস এবার ভাবলো একটা খোঁজখবর করতে হবে। ও সেনাপতির কাছে এগিয়ে এল। বলল---একটা খবর জানতে চাইছিলাম।

---কী খবর? সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দিকে ফিরে তাকাল।

---এটা কি একটা দেশের অংশ নাকি একটা দ্বীপ। ফ্রান্সিস বলল।

---দ্বীপ নয় এটুকু বলতে পারি। কারণ পশ্চিমমুখো আমরা যতদূর গেছি শেষ পাইনি। সেনাপতি বলল।

---এই দেশের নাম কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

---বাতোরিয়া। এখানকার রাজা ছিল পাকার্দেন। তাকে লড়াই করে হারিয়ে আমাদের রাজা আনোতার এই বাতোরিয়ার রাজা হয়েছেন। সেনাপতি বলল।

---তাহলে আপনাদের অন্য এক রাজত্ব ছিল। ফ্রানিস বলল।

---হ্যাঁ। ঐ যে দক্ষিণদিকে পাহাড় দেখছো ঐ পাহাড়ের ওপারে আছে ভিঙগার দেশ। ওটাই আমাদের দেশ। এখন ঐ ভিঙ্গার দেশ আর এই বাতোরিয়া দুই দেশেরই রাজা হলেন আনোতার।

---রাজা পাকার্দেনকে তো বন্দী করা হয়েছে। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

---নিশ্চয়ই। তার দেহরক্ষীদেরও বন্দী করা হয়েছে। সেনাপতি বলল।

---তাদের কোথায় বন্দী করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

---ঐ পাহাড়ের নিচে কয়েদঘরে। সেনাপতি বলল।

—তাহলে আমাদেরও ওখানেই বন্দী করে রাখা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আর কথা নয়। রাজধানীতে চলো। সব দেখবে জানব। এখন তোমাদের রাঁধুনিদের বলো সকালের খাবার তৈরি করতে। সকালের খাবার খেয়ে আমরা রাজবাড়িতে যাবো। সেনাপতি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর রাঁধুনি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—সকালের খাবার তৈরি কর। তিনজন রাঁধুনি বন্ধু উঠে দাঁড়াল। রসুইঘরে যাবে বলে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। খোলা তরোয়াল হাতে তিনজন যোদ্ধাও ওদের পাহারা দেবার জন্য সঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকালের খাবার তৈরি হয়ে গেল। সবাইকে খেতে দেওয়া হল। খাওয়া শেষ হল। সেনাপতির আদেশে সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে জাহাজ থেকে পাতা পাটাতন দিয়ে তীরে নামানো হল। পাহারা দিয়ে ফ্রান্সিসদের নিয়ে পশ্চিমমুখো চলা শুরু হল।

বালি ভর্তি এলাকা দিয়ে চলল সবাই। কিছুদূর যেতে বালির এলাকা শেষ। শুরু হল মাটির রাস্তা। একসময় দূর থেকে রাজধানীর বাড়িঘর দেখা গেল। বাড়িঘর সব পাথর বালি আর কাঠের। পাহাড়ের নিচে বনভূমি। সহজেই কাঠ পাওয়া গেছে। বাড়িগুলোর ছাউনি লম্বা শুকনো ঘাস আর পাতার।

অন্যবাড়িগুলোর তুলনায় একটা বেশ বড় লম্বাটে বাড়ি। বোঝা গেল রাজবাড়ি। ফ্রান্সিসরা সেই বাড়ির প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের নিয়ে রাজসভায় ঢুকল। প্রহরীরা মাথা নুইয়ে সেনপাতিকে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস দেখল কাঠের সিংহাসনের গদীতে রাজা আনোতার বসে আছে। অসম্ভব মোটা। মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ। মাথায় চৌকোনো সোনার গিল্টিকরা মুকুট। কুঁৎকুঁতে চোখ।

তখন বিচার চলছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচার শেষ হল। বিচার প্রার্থীরা চলে গেল। দোষী লোকটিকে দুজন প্রহরী হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

রাজার সিংহাসনের দুপাশে দুটো ছোট কাঠের আসন। তাতে গদী পাতা। সেনাপতি রাজার সম্মুখে গিয়ে মাথা একটু নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে পাশের আসনে গিয়ে বসা অন্য আসনে বৃদ্ধ মন্ত্রী বসেই ছিল।

ফ্রান্সিস ভালো করে রাজা আনোতারকে দেখল কুঁৎকুঁতে চোখে রাজা ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কুটিল। একে অতবড় মুখমণ্ডল তার ওপর ঐ দৃষ্টি। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা ধুরন্ধর, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী।

বিচারপর্ব শেষ। সেনাপতি আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। আঙ্গুল দিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে দেশীয় ভাষায় কী সব বলে গেল। সেনাপতির কথা শেষ হলে রাজা আনোতার একটু হেসে ভাঙা ভাঙা পোতুর্গীজ ভাষায় বলল---শুনলাম তোমরা ভাইকিং। এখানে নাকি বেড়াতে এসেছো।

—ঠিক বেড়াতে নয়। তবে কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসি নি। নানা দ্বীপ ঘুরে এখন নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এখানে এসেছো। রাজা আনোতার বলল।

—না। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে আসি নি। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—ঠিক আছে। সে সব পরে ভেবে দেখছি। এখন তোমাদের বন্দী করা হল। রাজা আনোতার বলল।

—কিন্তু আমরা তো আপনার বা আপনার দেশের কোন ক্ষতি করি নি। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্ষতি করতে পারো এটা ধরে নিয়েই তোমাদের বন্দী করা হচ্চে। রাজা বলল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল।—এটা কে? কথাটা শুনে ফ্রান্সিসের ভীষণ রাগ হল। কিন্তু সেই ভাবটা গোপন করে বলল—এটা নয় ইনি—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—রাজকুমারী তো রাজপ্রাসাদে থাকে। রাজা বলল।

—না। ইনি আমাদের সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসেন। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে যার যেমন অভিরুচি। এবার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এদের কয়েদঘরে ঢোকান। পরে ভেবে দেখছি এদের নিয়ে কী করা যায়।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা ওদের কোন কথাই শুনবে না। কিন্তু মারিয়ার কথাটা ভাবতে হয়। তাই ও বলল —আমরা না হয় কয়েদ ঘরেই রইলাম। কিন্তু একটা অনুরোধ রাজকুমারীকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাখুন।

তিনি তো আর আমাদের ফেলে রেখে পালাতে পারবেন না।

—কিন্তু তাকেও তো বন্দী হয়েই থাকতে হবে। রাজা বলল।

—অন্তঃপুরে বন্দী করেই রাখুন। কয়েদ ঘরের কষ্ট ওঁর সহ্য হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব পরে হবে। এখন তো কয়েদ ঘরে থাকুক। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। বুঝল বলে লাভ নেই।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

সবাই রাজবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের দেখতে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রায় ভিড় করে এল। বোঝা গেল ফ্রান্সিসদের দেখতেই ভিড়। সবাই বেশি অবাক হলে মারিয়াকে দেখে। মারিয়ার পোশাক দেখে।

সবার আগে সেনাপতি চলল পাহাড়ের দিকে। তার যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল যাতে কেউ পালাতে না পারে। যেতে যেতে হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস আবার সেই কয়েদঘরেই বন্দী হতে চলেছি।

—ভেবো না। ঠিক সময় সুযোগমত পালাবো। আমার শুধু একটাই চিন্তা মারিয়া এই কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন কতদিন মেনে নিতে পারবে। ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বলল।

—তুমি কালকেই রাজা আনোতারের সঙ্গে কথা বলো। যে করে হোক রাজকুমারীকে অন্য কোথাও রাখতে রাজাকে অনুরোধ কর।

—ঠিক বুঝতে পারছি না রাজা আনোতার রাজি হবে কিনা। ফ্রান্সিস বলল

—বলে তো দেখো। হ্যারি বলল।

—হুঁ। বলতে হবেই ফ্রান্সিস বলল।

পাহাড়ের নিচেই বনভূমি। খুব গভীর বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি জংলা ঝোপঝাড়। সে সবের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথ। বনের সেই পথ ধরে চলল সবাই।

কিছু পরে একটা লম্বাটে ঘরের সামনে এসে সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল এই ঘরটাই কয়েদঘর। ঘরের ছাউনি শুকনো ঘাস পাতার। ঘরের দরজার সামনে বর্শা হাতে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। সেনাপতিকে দেখে দুজনে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। একজন প্রহরী কোমরের কাপড়ের ফেট্টিতে ঝোলানো চাবি বের করে লোহার দরজা শব্দ করে খুলে দিল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা একে একে ঘরটায় ঢুকল।

ঘরের মেঝেয় শুকনো ঘাস লতাপাতা বিছানো দেখা গেল আগে থেকেই বেশ কিছু বন্দী শুয়ে আছে। ঘরের দেয়াল এবড়ো খেবড়ো পাথরের। ঘরটার ওপর দিকে একটা ফোকর মত। ওটাই জানালা। বাইরের যেটুকু আলো হাওয়া ঐ পথ দিয়েই আসছে ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ বসল, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসল। রাজকুমারী ফ্রান্সিসদের পাশে এসে বসল। ফ্রান্সিস ভাবছিল রাত পাহারার জন্যে পেড্রো কে বলা উচিত ছিল। পেড্রো নজর রাখলে। এভাবে বিনা লড়াইয়ে বন্দী হতে হত না।

একটু চুপ করে থেকে মারিয়া বলল—আমাকে তাহলে এখানেই থাকতে হবে।

—না-না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—তোমাকে অন্য কোথাও রাখার জন্য রাজাকে অনুরোধ করবো।

—কোন দরকার নেই। আমি এখানেই তোমাদের সঙ্গে থাকবো। মারিয়া বলল।

—তা হয় না। এই বন্ধ ঘরে এভাবে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাতে আমাদের বিপদই বাড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

— তোমরা এত কষ্ট সহ্য করে থাকবে আর আমি থাকতে পারবো না? মারিয়া বলল।

—না পারবে না। কাল সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

---রাজাকে দেখে আমার ভালো লাগে নি। লোকটা দাম্ভিক। মারিয়া বলল।

---শুধু দাম্ভিক নয় তার চেয়েও বেশি কিছু। কিন্তু উপায় নেই। ওর মন রেখে কথা বলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সিনাত্রা ফ্রান্সিসের কাছে সরে এল। বেশ ভীতস্বরে বলল---রাজা আমাদের মেরে ফেলবে না তো?

—অত ভয় পেও না। আমাদের মেরে ফেলে রাজার কী লাভ। লাভের জন্য তো আমাদের জাহাজ তল্লাশীই করেছে। কয়েকটা সোনার চাকতি ছাড়া কিছুই পায় নি। কাজেই রাজা মিছিমিছি আমাদের মেরে ফেলবে না। তবে আমাদের বন্দী করে রাখবে। তারপর কিছু দিন যাক। দেখা যাক আমাদের নিয়ে কী করে। সিনাত্রা আর কিছু বলল না। তবে ওর মন থেকে ভয় গেল না।

দুপুর হল। দুজন প্রহরী লম্বাটে শুকনো পাতা নিয়ে ঢুকল। সবার সামনে পাতা পেলে দিল। দুজনে মিলে তাতে খাবার দিল। আধপোড়া রুটি আর পাখির মাংস। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেটেপুটে খেল। কেউ কেউ বাড়তি খাবারও নিল। খাওয়া শেষ হলে ঘরের কোনায় মাটির পাত্রে রাখা জল খেল। প্রহরীরা এঁটো পাতা নিয়ে চলে গেল। পাখির মাংস সুস্বাদু। ওরা খেয়ে তৃপ্ত হল। এবার শুয়ে বসে রইল ওরা।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়েছিল। মৃদুস্বরে ডাকল হ্যারি। হ্যারি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—আগে থেকে যে বন্দীরা ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলো তো। ওরা কারা। কেনই বা ওদের বন্দী করা হয়েছে---খবর নাও।

আগে থেকে যারা বন্দী ছিল হ্যারি তাদের কাছে গেল। ও কিছু বলার আগে ঐ বন্দীদের একজন যুবক দেশীয় ভাষায় হ্যারিকে কিছু বলল। হ্যারি বুঝল না। তাই ও মাথা নাড়ল। যুবকটি এবার ভাঙা ভাঙা পোর্তুগীজ ভাষায় বলল---আমার নাম বিস্তানো। তোমার নাম কী? হ্যারি বলল—হ্যারি।

---তোমরা বিদেশি। বিস্তানো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা তোমাদের বন্দী করেছে কেন?

---শত্রুতা---শত্রুতা। এটাই আমাদের দেশ বাতোরিয়া রাজা আনোতারের দেশ হচ্ছে ঐ পাহাড়ের ওপাশে। রাজা আনোতার ধূর্ত ফন্দীবাজ নিষ্ঠুরও। হঠাৎ আমাদের দেশ আক্রমণ করে জয় করেছে। এখন দুই দেশেরই রাজা হয়ে বসেছে। বিস্তানো বলল।

---তোমাদের দেশের রাজা? তিনি কোথায়? হ্যারি প্রশ্ন করল।

বিস্তানো চোখের ইঙ্গিতে দেখালে ঠেস-দিয়ে বসা একজন দাড়ি গোঁফওয়ালা রোগাটে চেহারার লোককে দেখাল। হ্যারি দেখল লোকটির পরনে দামি কাপড়ের পোশাক। লোকটি চুপ করে বসে আছে।

---উনিই তোমাদের রাজা?

—হ্যাঁ রাজা পাকার্দো আমরা কয়েকজন তাঁর দেহরক্ষী। বিস্তানো বলল।

—তোমাদের সেনাপতি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লড়াইয়ে মারা গেছেন। এখন আমরা অবাক হবো না যদি রাজা আনোতার আমাদের রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেক্ষেত্রে আমরাও যে কজন আছি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচবো না। আমরাও। বিস্তানো বলল।

—রাজাসহ তোমাদেরও মৃত্যুদণ্ড দেবে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আনোতার সব পারে। লড়াইয়ে হেরে গেছি কাজেই আমাদের জীবনের কোন দাম নেই। বিস্তানো বলল।

—তোমাদের রাজা পাকার্দো কেমন মানুষ? ফ্রান্সিস বলল।

—দেবতা—দেবতা। প্রজারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করে আবার বন্ধুর মত ভালোবাসে। আজকে উনি এই জঘন্য কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছেন এটা জেনে আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। বিস্তানো বলল।

—লড়াইয়ে হারজিৎ আছেই। ওসব ভেবে কী হবে। হ্যারি বলল।

—তোমরাও রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। বিস্তানো বলল।

—আমরা তার আগেই পালাবো। হ্যারি বলল।

—পারবে? বিস্তানো একটু অবিশ্বাসের সুরে বলল।

—পারতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই চেষ্টাই করতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে আমরা কেউ বাঁচবো না। এবার বিস্তানো মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী। হ্যারি বলল।

—রাজা আনোতার কেমন মানুষ বোঝ। উনি মহিলা। রাজকুমারী। তাঁকেও এই কয়েদঘরে বন্দী করে রেখেছে। বিস্তানো বলল।

—তোমাদের রানিকে কী করেছে? হ্যারি জানতে চাইল।

—অন্দরমহলে বন্দী করে রেখেছে। বিস্তানো বলল।

—রাজকুমারীকে নিয়েই আমাদের সমস্যা। উনি সুস্থ থাকতে থাকতে। তাকে নিয়ে পালাতে হবে। হ্যারি বলল।

—পারবে পালাতে? এত প্রহরী সৈন্যসামন্ত। সবার চোখে ধূলো দিয়ে পালানো সম্ভব? বিস্তানো বলল।

—আমাদের দলনেতার নাম ফ্রান্সিস। ও অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। কত গুপ্ত ধনভাণ্ডার ও খুঁজে বের করেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে। তা ছাড়া এরকম পাহারার মধ্যেও আমরা অনেকবার পালিয়েছি। দেখো—ঠিক পালাবো। হ্যারি বলল।

—তাহলে তো ভালোই একসঙ্গে আমরাও পালাতে পারবো। বিস্তানো বলল।

—সেই উপায়টাই এখন ভাবতে হবে। হ্যারি বলল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে এল। বিন্তানোর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে বললল। ফ্রান্সিস রাজা পাকোর্দোর দিকে তাকাল। রাজার মাথার চুল উস্কোখুস্কো। রোগাটে মুখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট চিহ্ন। চোখের কোল বসে গেছে। পরনে দামি পোশাক ময়লা। দু'চোখ বুঁজে চুপচাপ বসে আছেন। রাজা ফ্রান্সিসের পরিচিত কেউ নন। তবু রাজার এই দুরবস্থা দেখে ফ্রান্সিস তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি বোধ করল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে—দুজন প্রহরী কয়েদঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—রাজা পাকোর্দো বেরিয়ে আসুন। আমাদের মাননীয় রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। প্রহরী দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গিয়ে বলল—আমরা দু'জন রাজা আনোতারের সঙ্গে দেখা করবো।

—কেন বলো তো? প্রহরী জানতে চাইল।

— বিশেষ দরকার। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—বেশ। চলো প্রহরী বলল।

রাজা পাকোর্দোর সঙ্গে ফ্রান্সিস আর হ্যারি বেরিয়ে এল। তিনজনে প্রহরীদের সঙ্গে রাজ বাড়ির দিকে চলল।

রাজ সভায় খুব ভিড় ছিল না। রাজা আনোতার রাজা পাকোর্দোর জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাজা পাকোর্দোকে দেখে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল—এই যে—রাজা পাকোর্দো। আসুন— আসুন। রাজা পাকোর্দো কোন কথা বললেন না।

—তা কয়েদঘরে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? সেই একইভাবে হেসে বলল।

—না আমি ভালো আছি। রাজা পাকোর্দো বললেন।

—এটা মিথ্যে বললেন। কয়েদঘরের ঐ পরিবেশে কেউ ভালো থাকে না। রাজা আনোতার বলল।

—না আমি ভালো আছি। আমার থাকা খাওয়ার ভালোমন্দ বোধটা একটু কম? রাজা পাকোর্দো বললেন।

—তার মানে আপনি সবরকম অবস্থাতেই খুশি। রাজা আনোতার বলল।

—হ্যাঁ। কোনকিছুর বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই। রাজা পাকোর্দোর বললেন।

—আপনি রাজা না হয়ে সাধু সন্ন্যাসি হলে ভালো করতেন। রাজা আনোতার বলল।

—রাজা হয়েও সাধু সন্ন্যাসীর মত থাকা যায়। তার জন্যে বনে জঙ্গলে যেতে হয়। রাজা পাকোর্দো বললেন।

—এইজন্যেই আপনি লড়াইয়ে হেরে গেলেন। রাজা আনোতার বলল।

—তা'তে আমার দুঃখ নেই। শুধু একটাই দুঃখ আমার সুখী প্রজারা আপনার মত একটা পাষণ্ডের হাতে পড়ল। রাজা পাকোর্দো বললেন।

রাজা আনোতার এক লাফে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলে উঠল—আপনার এত সাহস আমাকে পাষণ্ড বললেন।

—আপনি আমার বন্দী সৈন্যদেরও হত্যা করেছেন। এ ধরণের কাজ একমাত্র পাষণ্ডরাই করে রাজা পাকোর্দো বললেন। রাজা আনোতার সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—সেনাপতি এটাকে চাবুক মারুন। সেনাপতি একজন প্রহরীকে ইঙ্গিত করল। প্রহরী চাবুক হাতে এগিয়ে এল। তারপর রাজা পাকোর্দোর পিঠে চাবুক মারল। রাজা পাকোর্দোর শরীরটা কেঁপে উঠল। পর পর কয়েকটা চাবুকের মার খেয়ে রাজা পাকোর্দো বসে পড়লেন। মাথা নিচু করে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলেন। রাজা আনোতার হাত তুলে প্রহরীকে থামতে ইঙ্গিত করল। প্রহরী চাবুক গুটিয়ে সরে দাঁড়াল।

এবার রাজা আনোতার বলল—যাক গে ভবিষ্যতে সাবধানে কথা বলবেন। এখন যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি সেটা বলছি। শুনেছি আপনার যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে।

—সেই ধন সম্পদ আমার পৈতৃক ধনসম্পদ। রাজা পাকোর্দো বললেন।

—সেই ধনসম্পদের জন্যে আপনার রাজকোষাগার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি। এখন বলুন কোথায় রেখেছেন সেসব। রাজা আনোতা বলল।

—আমি জানি না রাজা পাকোর্দো মাথা নাড়লেন।

—নিশ্চয়ই জানেন। আমার আক্রমণের খবর পেয়ে সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। রাজা আনোতার বলল।

—বললাম তো আমি কিছুই জানিনা। রাজা পাকার্দো বলল।

—আপনি সে সব ধনভাণ্ডারের কোন খোঁজই রাখতেন না। রাজা আনোতার বলল।

—না। রাজা পাকার্দো বললেন।

—কেন? রাজা আনোতার বলল।

—সে সব আমার পিতার ধনভাণ্ডার। আমার নয়। ঐ ধনভাণ্ডারের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভও ছিল না। রাজা পাকার্দো বললেন।

—তাহলে সে সবের খোঁজ রাখতো কে? রানি? রাজা আনোতার ॰॰ করল।

—ন। মন্ত্রী মশাই। তিনিই যেসব দেখাশুনো করতেন। মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারেন। রাজা পাকার্দো বললেন।

—কিন্তু এখানেই হয়েছে সমস্যা। আপনি জানেন না যে আপনার মন্ত্রী মশাই গতরাতে ফুয়েন্ত সরোবরে জলে ডুবে মারা গেছেন। রাজা আনোতার বলল।

রাজা পাকার্দো চমকে উঠলেন। তারপর বললেন—যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি বোধহয় তিনি সহ্য করতে পারেন নি। রাজা পাকার্দো বললেন

—যে কারণেই হোক। আর কেউ কি সেই ধনভাণ্ডারের খোঁজ রাখে?

—জানি না। রাজা পাকার্দো বললেন।

—মিথ্যে কথা। রাজা আনোতার চিৎকার করে বলল। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—চাবুকের মার পড়লে বলতে বাধ্য হবেন।

—চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রাজা পাকার্দো বললেন।

—ঠিক আছে। আমি নিজে কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখি। রাখা আনোতার বলল

—দেখুন চেষ্টা করে। রাজা পাকার্দো বললেন।

রাজা আনোতার এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল—তোমরা এসেছো কেন?

—একটা অনুরোধ জানাতে। ফ্রান্সিস বল।

—বলো। রাজা বলল।

আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশের রাজকুমারী রয়েছে। কয়েদঘরের ঐ পরিবেশ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁকে অন্য কোথাও বন্দী করে রাখুন। রাজ অন্তঃপুরে হলে ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা পরে ভেবে দেখছি। এখন আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধারে ব্যস্ত থাকবো। রাজা আনোতার বলল।

—বেশ পরেই দেখবেন। রাজা আনোতার প্রহরীদের ইঙ্গিত করল। প্রহরীরা এগিয়ে এল। বলল—চলো সব।

রাজা পাকার্দোর সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢুকে রাজা পাকার্দো বসলেন। তারপর আস্তে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। পিঠে চাবুকের ক্ষত। চিৎ হয়ে শুতে পারলেন না। পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়েও বসতে পারলেন না।

ফ্রান্সিস ভেন-এর কাছে এল। বলল ভেন-রাজা মশাইয়ের পিঠে চাবুক মারা হয়েছে। কী করা যায়?

—কী করবো বলো। সঙ্গে তো ওষুধ নেই। কোমরের ফেট্টি থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে রাজকুমারীকে দাও। জলে ভিজিয়ে সেই কাপড়ের টুকরো যেন রাজার পিঠে বুলিয়েদেন। কষ্ট কমবে।

মারিয়া ফ্রান্সিসের পাশেই বসেছিল। সব শুনে বলল—আমি—সব করছি। মারিয়া নিজের ঝুল পোশাক থেকে কাপড় ছিঁড়ে নিল। তারপর জলে ভিজিয়ে নিয়ে রাজার কাছে এসে বলল—মান্যবর রাজা—আপনার পিঠে জল ঝুলিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বৈদ্যি বলছে এতে আপনার যন্ত্রণা একটু কমবে।

—বেশ। রাজা উঠে বসলেন। মারিয়া রাজার পোশাকটা পেছন দিকে তুলল।

চাবুকের স্পষ্ট দাগ। রাজা নিঃশব্দের কী কষ্ট সহ্য করছেন সেটা মারিয়া বুঝতে পারল। ও রাজার জন্যে গভীর সহানুভূতি বোধ করল। আস্তে আস্তে ভেজা কাপড়ের টুকরোটা পিঠে বুলিয়ে দিতে লাগল। রাজার মুখ থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। সেই শব্দ শুনে ফ্রান্সিস স্থির থাকতে পারল না। কয়েদঘরের দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী কাছে এলে বলল—রাজা পাকার্দো খুব অসুস্থ। একজন বৈদ্যকে আসতে বলো।

—আমাদের রাজার হুকুম না হলে বৈদ্যকে ডাকা চলবে না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই তাকে ডাকো।

—তিনি কি আসবেন? প্রহরী বলল।

—একবার বলে তো দেখো। বলবে যে একজন বিদেশি ডাকছে।

—হুঁ। প্রহরীটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। দরজায় মুখ রেখে বলল—কে ডাকছিলে?

—আমি। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বলল—চাবুকের মারে রাজা আতোয়ার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসা প্রয়োজন।

—দেখি রাজাকে বলে। তবে রাজা চিকিৎসার অনুমতি দেবেন বলে মনে হয় না। সেনাপতি চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু সেনাপতি ফিরে এল না। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করবে না। ফ্রান্সিস ভেন-এর কাছে এল। বলল—ভেন রাজার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না?

—দাঁড়াও। এখানে তো গাছগাছালি আছে। আমি দেখছি। ভেন লোহার দরজায় মুখ চেয়ে বাইরের জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস ওর পাশে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ কী দেখে ভেন বলে উঠল—পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল—কী পেয়েছো?

—ওষুধ। ভেন বলল। তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—

—ঐ যে চেস্টনাট গাছটা দেখছ তার পেছনে দেখ একটা ছোট গাছ। হাত চারপাঁচ লম্বা। ঐ গাছের শেকড়টা চাই। দেখ প্রহরীদের দিয়ে গাছটা আনতে পারো কিনা।

ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকল। বলল—একটা উপকার করবে ভাই?

—সেনাপতিকে ডাকতে যেতে পারবো না। প্রহরী বলল।

—না-না। অন্য ব্যাপার বলছি। ফ্রান্সিস এবার আঙ্গুল তুলে সেই ছোট গাছটা দেখালো। বলল ঐ গাছটার শেকড় সুদ্ধ তুলে এনে দাও।

প্রহরী অবাক। বলল—ঐ গাছটা দিয়ে কী করবে?

—দাঁত মাজবো। নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। পারবো না। প্রহরী মাথা নেড়ে বলল।

হয়েছিল সেদিন। রাজা আনোতার মারিয়াকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। মারিয়া অবশ্য যেতে চাইছিল না। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনে মিলে অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে ওকে যেতে বাধ্য করেছিল। আসলে ফ্রান্সিসরা এত কষ্ট করে এই কয়েদঘরে পড়ে থাকবে আর ও রাজ-অন্তঃপুরের সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থাকবে এটা ও মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু ফ্রান্সিসদের পেড়াপেড়িতে শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হল। ফ্রান্সিসরা নিশ্চিন্ত হল।

দিন যায় রাত যায়। ফ্রান্সিস রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারে না। একমাত্র চিন্তা—কী করে এই কয়েদঘর থেকে পালানো যায়। এই নিয়ে হ্যারির কথা হয়।

ওদিকে রাজা আনোতার রাজা পাকার্দোর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ধনভাণ্ডারের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের বনজঙ্গল পাহাড়। ফুটন্ত সরোবরের আশেপাশে অন্বেষণকারী দল পাঠাচ্ছে। নিজের অন্তঃপুর অস্ত্রাগার সৈন্যাবাস সর্বত্র খোঁজ করে বেড়াচ্ছে তার বাছাই করা আট দশ জন সৈন্য। কিন্তু গুপ্তধনভাণ্ডার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝেই রাজা পাকার্দোকে রাজসভায় ডেকে পাঠায়। তর্জন গর্জন করে। চাবুকের মারের ভয় দেখায়। রাজা পাকার্দো নির্বিকার। এক কথাই বিরক্তির সঙ্গে বারবার বলেন—আমি কিছুই জানি না। যিনি জানতেন তিনি মৃত।

রাজঅন্তঃপুরে রাজার শয়নকক্ষে মন্ত্রী মশাইয়ের আঁকা তিনটে ছবি আছে। তিনটে ছবিতেই শুধু গাছপালা পাহাড় আকাশের ছবি। সন্দেহ নেই ছবিগুলো সুন্দর। রাজা আতোয়ার সময় পেলে ছবিগুলো দেখে। ছবি দেখে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। সে রেগে গিয়ে ছবি তিনটে নামিয়ে বস্তাবন্দী করে মালখানা ঘরে রেখে দিয়েছে।

মন্ত্রীর বাড়িতেও তাঁর আঁকা কয়েকটা ছবি ছিল। সেগুলোকেও রাজা আতোয়ার আনাল। দেখল ছবিগুলি সেই পাহাড় ঝর্ণা নীল আকাশে আকাশে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে পাখি উড়ছে। ক্রুদ্ধ রাজা সেই ছবিগুলোও মালখানাঘরে পাঠিয়ে দিল।

মন্ত্রীমশাইয়ের ছবি আঁকার ব্যাখ্যাটা ফ্রান্সিসকে খুব কৌতূহলী করল। রাজকার্যে সাহায্যের ফাঁকে ফাঁকে একজন ব্যস্ত মন্ত্রী ছবি আঁকে এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। এই সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শাঙ্কোকে বলল—বিস্তানোকে আমার কাছে আসতে বলো।

—কেন বলো তো? হ্যারির জানতে চাইল।

—দরকার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো গলা চড়িয়ে ডাকল। বিস্তানো একবার এখানে এসতো। বিস্তানো ওদের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল বিস্তানো—একটা ব্যাপারে তোমার কাছে কিছু জানতে চাইছি।

—বেশ বলো। বিস্তানো বলল।

—বংশানুক্রমে রাজা পাকার্দো যে ধনসম্পদ পেয়েছিল যে সম্পর্কে তুমি কিছু জানো। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কী যে বলো। সেই ধনসম্পদ সম্বন্ধে রাজা পোতার্দোর নিজেরই কোন আগ্রহ ছিল না আর আমি কী জানবো। বিত্তানো বলল।

—আমার কেমন মনে হচ্ছে মন্ত্রীমশাই যেভাবেই হোক কোন সূত্র নিশ্চই রেখে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হয়তো। তবে তার হদিশ করবোকে? সেই ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী সেই রাজা আনোতারেরই তো কোন হুঁশ নেই। তুমি আমি ভেবে কী করবো। বিত্তানো বলল।

—আচ্ছা মন্ত্রীমশাই কীসে ছবি আঁকতেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সাদা চামড়ার ওপর বিত্তানো বলল।

—রং দেবেন কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—গাছের ফল, ছাল, গাছের শেকড়টেকড় গুঁড়ো করে। বেশ কিছু রং আমিই তৈরি করে দিয়েছিলাম। আসলে মন্ত্রীমশাইকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। উনি আমাকেও খুব ভালোবাসতেন। ছবি আঁকার সময় বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গী হয়েছি আমি। পাখি, প্রাণি বা মানুষ এসব আঁকতেন না। শুধু চোখ মেলে দেখা প্রকৃতি—পাহাড় সরোবর বনজঙ্গল আকাশ।

—হ্যাঁ শিল্পীর মেজাজ বোঝা দায়। আচ্ছা আঁকা ছবি গুলো তিনি কী করতেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—রাজা পাকার্দোকে তিনটি ছবি দিয়েছিলেন। রাজা যত্ন করে তাঁর শয়নকক্ষে টাঙিয়ে রেখেছেন। কয়েকটা ছবি তাঁর বাড়িতে টাঙিয়ে ছিলেন। খুব বেশি ছবি আঁকেন নি। একটা ছবিই অনেকদিন ধরে আঁকতেন। বিত্তানো বলল।

—মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা ছবিগুলো দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বোধ হয় দেখতে পাবেন না। বিত্তানো বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আনোতার সব ছবি মালখানাঘরে বস্তাবন্দী করে রেখে দিয়েছে। বিত্তানো বলল।

—তার উপযুক্ত কাজই করেছে। ছবির কদর বোঝার মত মানুষ সে নয়। কথায় কথায় চাবুক চালায়—এ কেমন রাজা? ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো বটেই। বিত্তানো বলল।

—যাক গে—রাত হল। শুয়ে পড়ো। ফ্রান্সিস বলল।

বিত্তানো চলে গেল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস তুমি মন্ত্রীমশাই তাঁর আঁকা ছবি এসব নিয়ে ভাবছো কেন?

—মনটা কখনও শূন্য রাখতে নেই। কিছু না কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। হ্যারি

পাশেই শুয়ে ছিল। হেসে বলল—ফ্রান্সিস গুপ্তধনের সংবাদ পেয়েছ। ওর এত আগ্রহের কারণ ওটাই এখন ঐ নিয়ে ভাববে।

—না-না হ্যারি। আমি এখন পালানোর উপায় ভাবছি। মন্ত্রীমশাই ছবি গুপ্ত ধনভাণ্ডার এসব পরে ভাববো। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা কাজ তো করতে পারো ফ্রান্সিস—শাঙ্কো বলল—রাজা আতোয়ারকে বলো তুমি গুপ্তধন খুঁজে উদ্ধার করে দেবে এবং একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেবে না। তুমি বললেই রাজা আতোয়ার রাজি হবে। আমরাও মুক্তি পাবো।

—অসম্ভব। রাজা আতোয়ার অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। একজন মানুষ গুপ্তধন উদ্ধার করে দেবে কিন্তু বদলে কিছুই নেবে না—এমন মানুষও আছে রাজা আতোয়ার সেটা বিশ্বাসই করবে না।

তুমি বিশ্বাস করাতেই পারবে না। ভাববে অন্য বদমতলব আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ঠিকই অনুমান করেছো। হ্যারি বলল।

—নাও শুয়ে পড়ো সব। রাত জাগা চলবে না। ফ্রান্সিস কথাটা বলে শুয়ে পড়ল।

—বলছো বটে কিন্তু তুমি অনেক রাত অব্দি জেগে জেগে থাকো। হ্যারি বলল।

—তুমি টের পাও? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমাকে আমি ভালো করেই চিনি। মাথায় চিন্তা নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো না। হ্যারি বলল।

—তা যা বলেছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসদের বন্দীজীবন কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস মাঝে মাঝেই কয়েদঘরটা ঘুরে দেখে যদি কোনভাবে পালানো যায়। কিন্তু পাথর চাপিয়ে চাপিয়ে তৈরি ঘর বেশ মজবুজ। পাথরের দেয়াল ভাঙার বা সরাবার কোন উপায় নেই। ওপরের ছাউনিও পাথর চাপা দিয়ে মজবুত করা।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—পালাবার উপায় বের করেছি। ফ্রান্সিস বলল—কী উপায়?

—ঐ যে জানালার মত ফোকরটা ঐ পর্যন্ত ওঠার ব্যবস্থা করেছি। ওটাতে পা রেখে ছাউনি সরিয়ে ঘরের ওপরে উঠতে পারবো। তারপর বুদ্ধি করে পালানো। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—আমার ছক ভাবা হয়ে গেছে। তোমাকে ছাউনি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রহরীদের কোমর থেকে চাবি বের করে নিয়ে দরজা খুলবে। আমরা পালাবো। তবে তুমি একা এতসব পারবে না। বিনেলোকে সঙ্গে নেবে। মোটকথা নিঃশব্দে সব কাজ সারতে হবে। আজ রাতেই লেগে পড়ো। তার আগে দেখে এসো ক'জন প্রহরী রয়েছে। শাঙ্কো উঠে গেল। দরজার কাছে গিয়ে দেখে এসে বলল—মাত্র দু'জন।

—হাতে কী? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—বর্শা। শাঙ্কো বলল।

—এতে তোমাদের সুবিধেই হবে। দু'জনকে কবজা করা সহজ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। রাত বাড়লে কাজে লাগা। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো বিনেলোর কাছে গেল। কী করতে হবে ফিস্ ফিস্ করে বলল। দু'জন শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম চাই।

রাত বাড়ল। শাঙ্কো উঠে পড়ল। বিনেলোও সজাগ ছিল। উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো দরজার কাছে গেল। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল—একজন প্রহরী একটা কাঠের পাটাতনের ওপর বসে আছে। বোঝাই যাচ্ছে ঝিমোচ্ছে। অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো সরে এলো। জানালার মত ফোকরটার একেবারে নিচে দাঁড়াল। তারপর পাথরের অল্প খাঁজে পা রাখল। তারপর উঁচু দিকে ছোট হাতলটায় একটা পা রেখেই এক ঝটকায় ফোকরটা ধরে ফেলল। নিচের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—বিনেলো—এইভাবে ওপরে উঠে আসবে। এবার শাঙ্কো শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জানালামত ফোকরটায় উঠে বসল। হাতের কাছেই ঘরের ছাউনি। ও ছাউনি ঠেলল। বেশ ভারি। বোঝা গেল ওখানে পাথরের চাপা দেওয়া। তিনচারবার জোরে ঠেলে ঠেলে পাথর চাপা সরাল। মাথা ঢুকিয়ে দিল ঘাসপাতার ছাউনি দিয়ে। ছাউনি থেকে ওর মাথা বেরিয়ে এল। গাছের কাটা ডালের বুনানীতে হাত রাখল। পরে ওটা ধ'রে ছাউনির ওপর উঠে এল।

ওদিকে বিনোলো শাঙ্কোর দেখাদেখি নিজেও ছাউনির ওপর উঠে এল। সাবধানে কোন শব্দ না করে দু'জনে ছাউনির ওপরে উঠে এল। শাঙ্কো ফিস্‌ফিস্ করে বলল—দাঁড়ানাটাকে আমি ধরব। বসে ঝিমোচ্ছে ওটাকে তুমি ধরবে। নিজের কোমরের ফেট্টি খুলতে খুলতে বলল—কোমরের ফেট্টি খুলে ওটা দিয়ে মুখ চেপে দরজার গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে। মুখে যেন কোনরকম শব্দ না করতেপারে।

ফেট্টি খুলে হাতে নিয়ে দু'জনে নিচে তাকাল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় সবই দেখা যাচ্ছিল। শাঙ্কো চাপাস্বরে বলল—ঝাঁপাও। দু'জনেই দু'জন প্রহরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন প্রহরীর হাত থেকেই বর্শা ছিটকে গেল। দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো এক প্রহরীর মুখে ফেট্টির কাপড় চেপে ধরল। দেখাদেখি বিনোলাও তাই করল। ওরা চেঁচিয়ে উঠতে পারল না। শাঙ্কো ঐ প্রহরীকে ধরে এক হ্যাচকা টানে ঘরের দরজার কাছে নিয়ে এল। তার মুখ চেপে ফেট্টির কাপড়টা দরজার লোহার গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। প্রহরীটির গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। শাঙ্কোর দেখাদেখি বিনোলাও অন্য প্রহরীটিকে একইভাবে বাঁধল। প্রহরীটির মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরুতে লাগল। শাঙ্কো তার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় কষাল। গোঙানি বন্ধ হল।

শাঙ্কো দ্রুত প্রহরীটির কোমরে ঝোলানো চাবির গোছাটা খুলে নিল। চাপাস্বরে বলল—চাবিটা দেখাও। প্রহরীটি চাবিটি দেখিয়ে দিল। মুখে উঁ-উঁ শব্দ করল। শাঙ্কো চাপাস্বরে ধমক দিল—চোপ। শব্দ বন্ধ হলেও বুঝল শব্দ বন্ধ না করলে আবার চড় খেতে হবে।

শাঙ্কো ছুটে গিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলল। চাপা স্বরে বলল—বেরিয়ে এসো সবাই। বন্ধুরা ছুটে এসে খোলা দরজার বাইরে চলে এল। রাজা পাকার্দো শুয়ে ছিল। ফ্রান্সিস তাঁর কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—উঠে আসুন। দরজা খোলা। রাজা উঠে বসলেন। তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। ততক্ষণে সবাই বাইরে চলে এসেছে। এখন রাজা আর ফ্রান্সিস বেরিয়ে এলেই হয়।

ফ্রান্সিস রাজাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল।

সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলে উঠল—পাহাড়ের দিকে সবাই ছোটো—জলদি।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারদিকে দেখা যাচ্ছে। সবাই ছুটল। রাজা পাকার্দোও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই বনভূমির কাছে চলে এল। বনভূমিতে ঢুকে পড়ল। পাহাড়ের ওপারেই রাজা আনোতারের ভিঙ্গার রাজত্ব। এখন রাজা আনোতার তো এখানকার রাজত্ব দখল করে এখানেই সৈন্যদের নিয়ে আছে। এখন তার রাজত্বে বোধহয় অল্প যোদ্ধাই আছে। কাজেই বিপদের সম্ভাবনা কম। ফ্রান্সিস বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এসব ভাবছিল। আরো ভাবছিল ওরা পালিয়েছে এটা রাজা আতোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারবে। ওরা এই বনের দিকেই পালিয়েছে। তাও জানতে পারবে। নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসদের খুঁজে বের করতে বনের মধ্যে তার যোদ্ধাদের পাঠাবে। ফ্রান্সিসদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ওরা নিরস্ত্র। ঐ যোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়া চলবে না। নিরস্ত্র অবস্থায় সবাইকে মরতে হবে। একমাত্র উপায়—আত্মগোপন করে থাকা। কিন্তু ও জানেনা পাহাড়ের ওপারে বনাঞ্চল আছে কিনা।

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সবাই হাঁপাচ্ছে তখন। কেউ বেশি হাঁপাচ্ছে কেউ কম। ছুটতে ছুটতে ফ্রান্সিস বিস্তানোকে জিজ্ঞেস করল—পাহাড়ের ওপারে তো রাজা আনোতারের রাজত্ব।

—হ্যাঁ। বিস্তানো ছুটতে ছুটতে বলল।

—ওপারে পাহাড়ের নিচে বনাঞ্চল আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। বিস্তানো বলল।

—পাহাড় পার হয়ে ওখানেই আমরা গা ঢাকা দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—পাহাড় পেরিয়ে ওপারে যাবো। ছোটো সবাই।

পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠতে লাগল সবাই। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—যতটা সম্ভব গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে ওঠো সবাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের ওপর উঠল সবাই। ফ্রান্সিস পেছন ফিরে তাকাল। দেখল দূরে হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে রাজা আনোতারের সৈন্যরা এই পাহাড়ের দিকেই আসছে।

এবার পাহাড় থেকে নামা শুরু হল। যতটা সম্ভব দ্রুত সবাই নামতে লাগল। রাজা পাকার্দো বয়স্ক মানুষ। আহত তিনি বেশ হাঁপাতে লাগলেন। ফ্রান্সিস তাঁকে মাঝে মাঝেই ধরছিল। সাহায্য করছিল তাঁকে নামতে।

পাহাড় থেকে নামল সবাই। কম বেশি সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

নিচে গভীর বনভূমি ফ্রান্সিস সবাইকে ডানদিকে গভীর বনের দিকে নিয়ে গেল। একটা বিরাট উঁচু গাছের নিচে সবাইকে দাঁড় করাল। বলল—এখানেই আশ্রয় নেব আমরা। এটাই হবে আমাদের গোপন আস্তানা। একটু ফাঁকা জায়গাটা। একটু ঘাসে ঢাকা জমি। কেউ কেউ ঘাসের ওপর বসে হাঁপাতে লাগল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। রাজা পাকার্দো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লেন। খুব পরিশ্রান্ত। ফ্রান্সিস বলল—সবাই বিশ্রাম নাও। কেউ কোন শব্দ করো না। রাজা আনোতারের সৈন্যরা আমাদের খুঁজবে। তবে খুঁজে পাবে না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে যা করবার করবো।

সবাই চুপ করে শুয়ে বসে। চারদিক নিস্তব্ধ শুধু গাছের ডালে পাতায় বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ।

হঠাৎ কিছু দূরে রাজা আনোতারের সৈন্যদের হাঁক ডাক শোনা গেল। তারপরই চারদিকে স্তব্ধতা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের হাঁক ডাক আরো দূরে শোনা গেল। বোঝা গেল হতাশ সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে। ভোর হল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে আছো। তখনও বনতলের অন্ধকার কাটে নি।

কিছুক্ষণ পরে আবছা আলো ছড়াল বনতলে।

তখন কম বেশি সবাই ক্ষুধার্ত। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস খাবারের ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু এখন নয়। দুপুরের খাবার জোগাড় করে যেতে হবে। এখন এই বনেই ফলমূল খুঁজতে হবে। সবাইকে বলো সেটা। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল ভাইসব কাছাকাছি ফলমূল খুঁজে পাও কিনা দেখো। তবে বেশিদূর যাবে না। গাছের ডাল ঝোপের গাছ ভেঙে ভেঙে যাবে, যাতে এখানে পথ চিনে ফিরে আসতে পারো। ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ফলমূল নিয়ে ফিরে এল। সবাইকে ফলমূল ভাগ করে দেওয়া হল। ফলমূল খেয়েই খিদে মেটাতে হল।

—ফ্রান্সিস দুপুরের খাবারের কী হবে? শাঙ্কো বলল।

—বনের ওপারেই তো রাজা আনোতারের ছেড়ে আসা রাজত্ব ভিঙ্গার। ওখানকার রাজবাড়িতে ঢুঁ দিতে হবে। বেশির ভাগ সৈন্যই এখন রাজা পাকার্তোর রাজত্বে। এখানে রাজবাড়িতে প্রহরীর সংখ্যাও বেশি থাকবে না। বিনা রক্তপাতে রাজবাড়ি থেকে খাবার চুরি করে আনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে? প্রহরীদের নজর এড়িয়ে? শাঙ্কো বলল।

—পারতে হবে। বুদ্ধি করে। খাবার জোগাড় করতেই হবে যে ভাবে হোক। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। হ্যারি বলল।

দুপুর হল। ফ্রান্সিস ঘাসের ওপর শুয়ে খাবার চুরির উপায় ভাবছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। ডাকল—শাঙ্কো বিনেলো এসো। শাঙ্কো বিনোলা উঠে এল।

—চলো রাজবাড়ি থেকে খাবার চুরি করতে হবে। এছাড়া খাবার জোগাড় করার অন্য কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বিনোলোক নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। গাছগাছালির নিচে দিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে ভেঙে বনের মধ্যে দিয়ে তিনজনে চলল।

একসময় বনভূমি শেষ হল। বনের গাছের আড়াল থেকে দেখল বনভূমির খুব কাছেই বড়বাড়িটা। বোঝা গেল ওটা রাজাবাড়ি। রাজবাড়ি ছাড়িয়ে পাথরের বাড়িঘরদোর। রাজা আনোতারের প্রজাদের বসতি এলাকা। সামনে একটা ঘাসে ঢাকা মাঠমত। তারপরেই সৈন্যাবাস। লম্বাটানা বাড়ি। এদিকটা সৈন্যবাসের পেছন দিক। পেছনের জানালাগুলো খোলা। সব দেখে ফ্রান্সিস বলল—একটা লম্বা গাছের ডাল ভেঙে আনো। বিনেলো বাঁ পাশে তাকাতেই একটা লম্বা গাছ পেল। ছোট ছোট ডালওয়ালা। ও ছুটে গিয়ে গাছটা টানতে লাগল। কিন্তু গাছটা টেনে তুলতে পারল না। আস্তে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। দুজনে মিলে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিতেই গাছটা উঠে এল। গাছটা ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস গাছের শেকড় থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলল। মাথার কাছে ছোট ডালটা ভাঙল। একটা আঁকশির মত হল। শাঙ্কো বলল—

—এই আঁকশি দিয়ে কি করবে?

—সৈন্যবাসের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখছি তো ফ্রান্সিস বলল।

—দেয়ালে আনোতারের সৈন্যদের পোশাক ঝুলছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কালোরঙের পোশাক বুকে হলুদ রঙ।

—আঁকশে দিয়ে তিনটে পোশাক টেনে আনবো। সেসব পোশাক পরে রাজবাড়ির রসুইঘরে থাকো। তারপর—। শাঙ্কো সোৎসাহে বলে উঠল—সাবাস ফ্রান্সিস।

—খুব সহজে কাঠের ডেকচিতে বড় থালায় খাবার নিয়ে চম্পট। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—লক্ষ্য কর—সৈন্যাবাসের জানালার কাছে পৌঁছতে হলে একটা ছোট মাঠমত পার হতে হবে। এই মাঠটা আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হবে। নইলে জানালা দিয়েই সৈন্যরা আমাদের দেখতে পাবে।

ফ্রান্সিস মাঠের লম্বা লম্বা ঘাসের ওপর হামা দিয়ে বসল। তারপর দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে একটা জানালার দিকে লক্ষ্য রেখে চলল ঐ জানালা দিয়েই দেয়ালে ঝোলানো পোশাক দেখা যাচ্ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস জানালাটার কাছে পৌঁছল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ঘরটায় কারো সাড়া শব্দ নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে আঁকশিটা ঢুকিয়ে দিল। সন্তর্পণে একটা ঝোলানো পোশাক টান দিয়ে নামল। সাবধানে পোশাকটা টেনে বাইরে নিয়ে এল। একইভাবে তিনটে পোশাক সাবধানে নিয়ে এল। পোশাক ফস্‌কে নিচে মেঝেয় পড়ে গেলে শব্দ হবে তাই খুব সাবধানে পোশাক তিনটে নিয়ে এল। তারপর পোশাকগুলো পিঠে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল। মাঠের ঘাসগুলো লম্বা হওয়ায় ফ্রান্সিসের শরীরের অনেকটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এতে ফ্রান্সিসের সুবিধেই হল।

তিনজনে পোশাকগুলো নিয়ে বনের আড়ালে চলে গেল। তিনজনেই নিজেদের পোশাকের ওপর কালো পোশাক পরে নিল।

ওরা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়ির সদর দেউড়ির কাছে এসে দেখল মাত্র একজন পাহারাদার বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। রাজা আনোতার এখানে নেই। কাজেই পাহারার কড়াকড়ি নেই। ফ্রান্সিসরা প্রহরীর সামনে দিয়েই রাজ বাড়ির আর এক পাশে চলে এল। ফ্রান্সিস দূরত্বটা হিসেব করে দেখল রাজবাড়ি থেকে বনভূমির দূরত্ব খুবই কম। এই দূরত্ব দ্রুত ছুটে পার হতে বেশি সময় লাগবে না।

একপাক রাজবাড়িটা ঘুরে এল। কিন্তু রসুই ঘরটা কোথায় বুঝে উঠতে পারল না। এবার বড় দেউড়ির সামনে এল। দেউড়ি দিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। প্রহরীটি ওদের একবার দেখল শুধু। কিছু বলল না।

রাজবাড়িতে ঢুকেই ডানদিকে মন্ত্রণাকক্ষ। বাঁ হাতি একটা গলিমত। ফ্রান্সিস বুঝল সোজা গেলে রাজসভা ঘর পড়বে। ও বাঁ দিকের গলিপথটা দিয়ে ঢুকে চলল। কিছুদূর গিয়ে গলিপথটা ডানদিকে চলে গেছে। সেই গলিপথে ঢুকতেই নাকে ঘিসলার গন্ধ লাগল।

ফ্রান্সিস হেসে মৃদুস্বরে বলল—রান্নাঘর সামনেই।

ডানহাতি একটা দরজা। তিনজনই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। বিরাট উনুন জ্বলছে। তিনজন রাঁধুনি রান্না করছে। একজন রাঁধুনি ওদের দেখে বলল—যাও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশনকারী খাবার নিয়ে যাবে।

—আমাদের খুব তাড়া। রাজার হুকুম এক্ষুণি পেয়েই আমাদের পাহাড়ের ওপারের বাতারিয়ায় যেতে হবে।

—তাহলে পেছনের রসুইঘরে বসে খেয়ে নাও। আমরাই খেতে দেব। রাঁধুনি বলল।

—তাহলে তো ভালোই হয় ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা পাশের রসুইঘরে ঢুকল। দেখল দুটো বিরাট থালাভর্তি রুটির স্তূপ। একটা বড় কাঠের ডেকচিও রয়েছে। একজন রাঁধুনি এল। দেয়ালে আটকানো একটা লম্বা কাঠের পাটাতনে রান্না করা খাবার রাখা। রাঁধুনি একটা হাতা নিয়ে এসেছিল। পাটাতনের একপাশে রাখা লম্বা শুকনো পাতা নিয়ে পেতে দিল। রাঁধুনি দ্রুতহাতে চারটে করে রুটি পাতার ওপর রাখল। ফ্রান্সিস চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে পেছন দিকে একটা হুড়কো লাগানো দরজা দেখল। বলল—একটু হাত ধোবো যে। রাঁধুনি জলের বিরাট জালাটা দেখিয়ে বলল—গ্লাসে করে জল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিসরা কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। রাঁধুনি ততক্ষণে পেছনের দরজাটার হুড়কো খুলে দিয়েছে। বলল—এই দরজার বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে এসো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজার বাইরে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল—হাত কুড়ি দূরে বন শুরু হয়েছে। হাতমুখ ধুতে ধুতে ও মৃদুস্বরে বলল—এই দরজা দিয়েই আমরা পালাবো। হাত বাড়ানো দুরত্বে বনের আড়াল পাবো।

রসুই ঘরে ফিরে এসে খেতে বসল। রাঁধুনি ততক্ষণে মাংসের ঝোলও পাতায় ঢেলে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে খেতে লাগল।

রাঁধুনি চলে গিয়েছিল। ফিরে এল। ফ্রান্সিস বলল—আর একদফা রুটি মাংস দাও। আমাদের ওতেই হবে। তোমাকে আর আসতে হবে না। রাঁধুনি আর একদফা খাবার দিয়ে চলে গেল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—আর দেরি নয়। দু'জনে দুটো রুটির থালা নাও। আমি মাংসের ডেকচিটা নিচ্ছি।

তিনজনে দ্রুত সব খাবার নিয়ে পেছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঁকি দিয়ে দেখল রাজবাড়ির সামনের মাঠ ফাঁকা। মাঠে কোন সৈন্য নেই। চাপাস্বরে বলল—ছোটো—জঙ্গলের দিকে। তিনজন ছুটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

তিনজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল তিনজন। একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে সেই বিরাট গাছটা দেখতে পেল। গাছের নিচে এল। খাবার নিয়ে তিনজনকে আসতে দেখে বন্ধুরা মৃদুস্বরে আনন্দধ্বনি তুলল—ও—হোহো।

সবাই ক্ষুধার্ত খাবারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা পাকার্দোও গেলেন। হেসে ফ্রান্সিস বললেন—তোমরা যে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে পেরেছো এতেই আমি খুশি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ। সন্ধ্যা হয়ে এল।

ফ্রান্সিস ঘাসের ওপর শুয়ে ছিল। হ্যারি ওর কাছে এল। বলল ফ্রান্সিস—কী

করবে এখন? এখানে আত্মগোপন করে কতদিন থাকবে? প্রত্যেকদিন দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে পারবে না।

—উঁহু। এভাবে থাকা চলবে না। আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই। ভুলে গেলে চলবে না। মারিয়া বন্দিনীজীবন কাটাচ্ছে। তাকেও মুক্ত করতে হবে।

—সেই জন্যেই বলছিলাম যা করার তাড়াতাড়ি কর। হ্যারি বলল।

—শোন—রাজা আনোতারের এই রাজত্বে এখন বেশ কিছু সৈন্য আছে। রাজা পাকার্দোর রাজত্ব থেকে ওরা এখানে ফিরে এসেছে। লড়াই করে এই সৈন্যদের হারিয়ে এই ভিঙ্গার রাজত্ব দখল করতে হবে।

—কিন্তু আমাদের তো একটা তরোয়ালও নেই। হ্যারি বলল।

—যারা ফিরে এসেছে তারা তো তরোয়াল নিয়েই ফিরেছে। তরোয়ালি বর্শায় এখানকার অস্ত্রাগারে জমা রেখেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তা রেখেছে। হ্যারি বলল।

—আমরা সেই অস্ত্রাগার লুঠ করবো। অস্ত্র নিয়ে ওদের আক্রমণ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—অস্ত্রাগার লুঠ করতে পারবো? হ্যারি সংশয় প্রকাশ করলে।

—পারতেই হবে। আমার ছক ভাবা হয়ে গেছে। আজ রাতেই কাজে নামবো। নিরস্ত্র অবস্থায় এভাবে আত্মগোপন করে উপবাস করে পড়ে থাকা চলবে না। এই বনভূমি তো বিরাট এলাকা নিয়ে নয়। আজ হোক কাল হোক ওরা আমাদের ঠিক এই বনে খুঁজে বের করতে পারবে। তখন নিরস্ত্র অসহায় আমরা কেউ ওদের হাত থেকে বাঁচবো না। কাজেই আমাদেরই অস্ত্র জোগাড় করে আগে আক্রমণ করতে হবে ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আজ রাতেই কাজে নামাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—রাতে খাওয়া জুটবে না। এটা জেনে নিজেদের তৈরি রাখো। রাতে কেউ ঘুমিয়ে পড়বে না। মান্যবর রাজা আপনিও ঘুমুবেন না। বেশ রাত হলে আমরা এখানে রাজা আনোতারের সৈন্যদের সৈন্যবাস আক্রমণ করবো।

—কিন্তু ফ্রান্সিস আমরা তো নিরস্ত্র। বিনেলা বলল।

লুঠ করবো। তারপর অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করবো। তখন ওরা ঘুমে অচেতন থাকবে। আমরা লাথি দিয়ে বন্ধ দরজা ভেঙে ঢুকবো। ওদের তৈরি হতে সময় দেব না। ঠিক এভাবেই আমরা ওদের বন্দী করবো। আমরা সব ছকের কথা বললাম। এটাকে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব তোমাদের। আমার কথা শেষ। এবার তোমরা বিশ্রাম কর। ফ্রান্সিস বসে পড়ল। তারপর হ্যারিকে ডেকে বলল, হ্যারি রাজা পাকার্দোর দুজন দেহরক্ষীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হ্যারি চলে গেল। একটু পরেই দুজন দেহরক্ষীকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ওদের জিজ্ঞেস

করল—রাজা জানি না। তবে রাজবাড়ির সঙ্গেই অস্ত্রাগার এটা জানি। আর একজন বলল—বোধহয় দক্ষিণ দিকের ঘরটাই অস্ত্রঘর। ঘরটা দখল করা যাবে। প্রহরী কেমন থাকে?

—অস্ত্রাগার বলে কথা। দু'চারজন প্রহরী তো থাকবেই একজন বলল।

—হ্যাঁ তা থাকবে—ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। তোমরা তরোয়াল পাবে। লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থেকো।

—বেশ। দেহরক্ষী দুজন চলে গেল।

রাতে তো পেট ভরে খাবার জুটবে না। দুপুরের যেটুকু খাবার বেঁচে ছিল তাই সবাই ভাগ করে খেল। তারপর শুয়ে পড়ল।

রাত একটু গভীর হতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল—সবাই তৈরি হও। চলো।

সবাই উঠে দাঁড়াল। লড়াই করতে যাচ্ছে এতেই ভাইকিংদের আনন্দ। শুয়ে বসে সময় কাটানো ওদের ধাঁতে সয় না।

বনের মধ্যে দিয়ে সবাই রাজবাড়ির দিকে চলল। বন শেষ হয়ে আসতে ছাড়া ছাড়া ছাড়া গাছের বন শুরু হল।

এখানে ওখানে ডালপালার ফাঁক দিয়ে ভাঙা চাঁদের আলো পড়েছে। আস্তে আস্তে সবাই বনের ধারে চলে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—থামো। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস বন থেকে বেরিয়ে এল। চাঁদের আলোয় দেখল রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা ঘরের সামনে কালো হলুদ পোশাক পরা দুজন প্রহরী প্রহরারত। ফ্রান্সিস ভাবল—যাক দু'জন প্রহরী। পরাভব জানানো সহজ হবে। ও ফিরে এসে শাঙ্কো আর বিনেলোকে বলল—শাঙ্কো—ছোরা ছুঁড়ব। বিনেলো অন্য কাকে কবজা করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারতে হবে। কোনরকম শব্দ যেন না হয়।

তিনজনে বন থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে প্রহরীদের কাছাকাছি চলে এল। শাঙ্কো হঠাৎ দাঁড়িয়ে জামার তলা থেকে ছোরা বের করে ছুঁড়ে মারল। ছোরাটা একজন প্রহরীর ডান কাঁধে বিঁধে গেল। সে তরোয়াল ফেলে দিয়ে কাঁধ চেপে বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এক লাফ এগিয়ে গিয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল। অন্য প্রহরীটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বিনেলো ততক্ষণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সে এই অতর্কিত আক্রমণে টাল সামলাতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়াল হাতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল তরোয়াল ফেলে দাও। কোন শব্দ করবে না। প্রহরীটি বোকার মত তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস তাড়া দিল জলদি। প্রহরীটি উঠে বসে তরোয়ালটা ফেলে দিল। বিনেলা সঙ্গে সঙ্গে তরোয়ালটা তুলে নিল। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে বলল তোমরা শব্দ করলেই মরবে। আমরা অস্ত্রাগার লুঠ করবো। কেউ বাধা দিতে এলে মরবে। তারপর শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো বন্ধুদের

ডাকো। বলবে সবাই যেন নিঃশব্দে আসে। রাজাকে অপেক্ষা করতে বলবে। উনি যেন না আসেন।

শাঙ্কো বনের দিকে চলে গেল। একটু পরেই বন্ধুরা আর রাজার দেহরক্ষীরা যতটা দ্রুত সম্ভব ছুটে এল। আহত প্রহরীটির কোমরে অস্ত্রাগারের দরজার তালার চাবি ঝুলছিল। ও কাঁধ থেকে ছোরাটা খুলে মাটিতে ফেলে দিল। শাঙ্কো দ্রুত ছোরাটা তুলে নিল। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ওর কোমর থেকে চাবিটা নিয়ে নিল। তারপর অস্ত্রাগারের তালা খুলতে গেল। ফ্রান্সিস আর বিনেলো খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরী দু'জনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

শাঙ্কো তালা খুলে ফেলল। বন্ধুরা দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। স্তূপ করে রাখা তরোয়াল বর্শার থেকে তরোয়াল-বর্শা তুলে নিল। তারপর বাইরে চলে এল।

ফ্রান্সিস প্রহরী দুজনকে বলল—অস্ত্রঘরে ঢোকো। প্রহরী দুজনকে অস্ত্রঘরে ঢোকানো হল। শাঙ্কো তালা লাগিয়ে দিল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—সৈন্যবাসে চলো। লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঢোকো। সৈন্যদের হাতে অস্ত্র নেই। সবকটাকে বন্দী কর। কেউ যেন পালাতে না পারে।

সবাই দ্রুত সৈন্যবাসের দিকে ছুটল। বারান্দা পার হয়ে ঘরগুলোর দরজায় লাথি মারতে লাগল। দরজা ভেঙে যেতে লাগল। ঘুমন্ত সৈন্যরা উঠে দেখল উদ্যত তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে সব সৈন্যকে সামনের মাঠে নিয়ে আসা হল। মাঠে বসিয়ে দেওয়া হল।

শাঙ্কো ততক্ষণে সৈন্যবাস থেকে লম্বা দড়ি নিয়ে এল। ছোরা দিয়ে দড়ি টুকরো টুকরো কাটল। সৈন্যদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হল।

তখন ভোর হয়ে গেছে। সকালের রোদ পড়েছে বনভূমিতে, রাজবাড়িতে মাঠে।

রাজা পাকার্দো ফ্রান্সিসের কাছে এলেন। বললেন—এদের বন্দী করলে। কিন্তু আমাদের বিপদ এখনও কাটে নি।

—তা ঠিক। ওরা আমাদের আক্রমণ করবেই। তবে সংখ্যায় ওরা বেশি হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলা হল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে বলল—রাজবাড়িতে যাও? রাঁধুনিদের বলো সবাইকে সকালের খাবার দিতে। গতরাতে তো আমরা আধ পেটাও খাইনি।

শাঙ্কো রাজবাড়ির দিকে চলে গেল। রাঁধুনীকে বলে এল।

কিছুক্ষণ পরে রাঁধুনিরা আর দু'তিনজনকে নিয়ে এল। সবার হাতে কাঠের হাঁড়ি কাঠের থালায় রুটি। বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সিসরাও খেতে বসে পড়ল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে খেতে লাগল। রাজা পাকার্দো অবশ্য ফ্রান্সিসদের সঙ্গে খেলেন না। উনি রাজবাড়িতে চলে গেলেন।

সকালের সবজির ঝোল রুটি খাওয়া শেষ হল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমাদের কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না।

—সেটা ভেবেছি। রাজা আনোতারের সঙ্গেও কিছু সৈন্য রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এখানে আসবে। তাদের সঙ্গে শেষ লড়াইটা তো লড়তে হবে। এখন অপেক্ষা—কখন ওরা আক্রমণ করে।

ফ্রান্সিস এবার গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—শেষ লড়াইটা এখনও বাকি। রাজা আনোতারের বাকি সৈন্যরা আমাদের নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। সবাই তৈরি থেকো। কেউ তরোয়াল বর্শা হাত ছাড়া করবে না। আক্রান্ত হলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পারো।

সবাই বুঝল বিপদ এখনও কাটেনি। লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

বন্ধুরা কয়েকজন বন্দীদের পাহারায় রইল। বাকিরা সৈন্যাবাসের খালি ঘরগুলোয় গিয়ে বসে রইল। সবাই বিশ্রাম করতে লাগল। বন্দীরা আশায় রইল ওদের রাজা আনোতার নিশ্চয়ই ওদের সাহায্য করতে সৈন্য নিয়ে আসবে। সময় বয়ে যেতে লাগল।

তখন সবে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। বনের দিকে হৈহল্লা শোনা গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—তৈরি হও। রাজা আনোতার সৈন্যদের নিয়ে আসছে।

একটু পরেই বনের আড়াল থেকে রাজা আনোতার বেরিয়ে এল। হাতে খোলা তরোয়াল। পেছনে কুড়ি পঁচিশ জন যোদ্ধা। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। রাজা মাঠের দিকে তাকিয়ে তার বন্দী যোদ্ধাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। রাজা ধরে নিয়েছিল এখানকার যোদ্ধাদের সাহায্য পাবে। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল। রাজা আনোতার ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। সে তার সৈন্যদের থামতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিস রাজা আনোতারের দিকে এগিয়ে গেল। গলা চড়িয়ে বলল—দেখতেই পাচ্ছেন আমরা বন্দী নই। হাতে অস্ত্রও আছে। লড়াই হলে আপনারা পরাজিত হবেন। ভেবে দেখুন—কী করবেন। বন্দীদশা মেনে নেবেন না লড়াই করবেন?

—লড়াই করে তোমাদের এদেশ থেকে তাড়াবো। রাজা আনোতার যেন গর্জে উঠল।

—ঠিক আছে। লড়াইটা হোক। ফ্রান্সিস তরোয়াল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল—ভাইসব আক্রমণ করো। ভাইকিং বন্ধুরা আর দেহরক্ষীরা তরোয়াল বর্শা হাতে ছুটে গিয়ে রাজা আনোতারের সৈনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাঠের ধারে শুরু হল লড়াই। তরোয়াল বর্শার ঠোকাঠুকির শব্দ আর্তস্বর চিৎকার গোঙানির শব্দ উঠল।

ফ্রান্সিস বিপক্ষের কয়েকজন যোদ্ধাকে আহত করে রাজা আনোতারের সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা আনোতার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক সরে গিয়ে রাজাকে ক্লান্ত করতে লাগল। রাজা ফ্রান্সিসের ফন্দী ঠিক বুঝতে পারল না। ঘুরে ঘুরে তরোয়াল চালাতে লাগল। একসময়ে তারোয়াল মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁফাতে লাগল। ফ্রান্সিস তেমন ক্লান্ত হয়নি। ও এই সুযোগ ছাড়ল না। দ্রুত পাক খেয়ে রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে পিছু হটতে লাগল। রাজা আনোতার মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস দু-তিন বার দ্রুত তরোয়াল চালিয়ে রাজার বুকের ওপর দিয়ে তরোয়াল সজোরে টেনে নিলে। রাজার বুকের কাছে পোশাক দু ফালি হয়ে গেল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে তখন। রাজা ফ্রান্সিসের নিপুণ হাতে তরোয়াল চালানো দেখে বুঝল এবার এর হাত থেকে রক্ষা নেই। ফ্রান্সিস হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আপনার সৈন্যদের লড়াই থামাতে বলুন। অযথা প্রাণহানি আমরা চাই না। এর পরেও লড়াই চালালে আপনারা কেউ বেঁচে থাকবেন না।

রাজাকে এভাবে আহত হতে দেখে তার সৈন্যরা লড়াইয়ের উদ্যম হারিয়ে ফেলল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ভাইকিংদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তাদের অনেকেই মারা গেছে নয়তো মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল--ভাইসব আর হত্যা নয়। লড়াই বন্ধ কর। ভাইকিংরা লড়াই থামিয়ে একটু দূরে সরে গেল। কিন্তু তরোয়াল নামাল না কেউ। দেখতে লাগল রাজা আনোতার কী করে।

রাজা আনোতার হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। তার পোশাক রক্তে ভিজে উঠেছে। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে উঠছে। ডান হাত তুলে কাতরস্বরে বলে উঠল—লড়াই নয়। রাজার সৈন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। আপত্তি করলে মরতে হবে।

রাজা আনোতারের সৈন্যরা তরোয়াল মাটিতে ফেলে দিল। শাঙ্কো আর সিনাত্রা এগিয়ে গিয়ে তরোয়ালগুলো তুলে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস উচ্চস্বরে বলল—সবার হাত বেঁধে দাও। বিনেলা ছুটে গিয়ে দড়ি নিয়ে এল। দড়ি টুকরো করে রাজা আনোতারের সব সৈন্যের হাত বেঁধে দেওয়া হল। তারপর আগের বন্দীদের সঙ্গে বসিয়ে রাখা হল। রাজা আনোতারের হাত বাঁধতে গেলে ফ্রান্সিস হাত নেড়ে মানা করল।

তখনই দেখা গেল রাজা পার্কার্দো এইদিকে আসছেন। উনি ফ্রান্সিসের কাছে এলেন। বললেন—তোমার জন্যেই আমি মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

—রাজা আনোতার তার সৈন্যসহ পরাজয় স্বীকার করেছে। আমরাও ওদের বন্দী করে রেখেছি। এবার আপনি এদের নিয়ে যা করবার করুন। আমি বলি---

রাজা আনোতারসহ সব সৈন্যকে এদেশ থেকে তাড়ান। এই দেশেরও রাজা হোন আপনি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তা হয় না। এই দেশ রাজা আনোতারেরই থাক। সবাইকে মুক্ত করে দাও। আমি আমার দেশে চলে যাবো। রাজা পাতার্দো বললেন।

—বেশ। আপনি যা চান। আমি রাজা আনোতারের সঙ্গে কথা বলছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস রাজা আনেতারের কাছে এল। বলল—

—রাজা পাকার্কো চান আপনার রাজত্ব আপনারই থাকুক। উনি নিজের রাজ্যে চলে যাবেন। আমরাও আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো। কিন্তু আপনাদের মুক্তি দেবার একটা শর্ত আপনাকে মানতে হবে।

—কী শর্ত? রাজা আনোতার বলল।

—আপনি ভবিষ্যতে কক্ষণো রাজা পাকার্দোর রাজত্ব আর আক্রমণ করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—ভবিষ্যতের কথা—কী করে বলি। রাজা আনোতার বলল।

—তাহলে আপনাদের সবাইকে কয়েক ঘরে বন্দী করে আমরা কয়েদঘরের দরজা পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে চলে যাবো। অনাহারে তৃষ্ণায় কয়েকদিনের মধ্যেই আপনারা সবাই মারা যাবেন। ভেবে দেখুন—শর্ত মানবেন না অবধারিত মৃত্যু মেনে নেবেন? ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আনোতার একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—ঠিক আছে। তোমার শর্তই মেনে নিলাম।

—এবার বৈদ্যকে ডেকে চিকিৎসা করান। ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল। রাজা একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। শাঙ্কো কাছে এলে বলল—সবাইকে মুক্ত করে দাও। রাজা আনোয়ারের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

শাঙ্কো আর বিনেলা গিয়ে বন্দীদের হাতে বাঁধা দড়ি কেটে দিতে লাগল। বন্দীরা মুক্ত হয়ে সৈন্যাবাসে চলে গেল।

ফ্রান্সিস রাজা পাকার্দোর কাছে এল। বলল—এখন কী করবেন?

—আমি আমার রাজত্বে ফিরে যাবো। এখানে এক মুহূর্তও থাকবো না। রাজা বললেন।

—বেশ। আমরাও আপনার সঙ্গে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কেউ অস্ত্র ত্যাগ করবে না। অস্ত্র হাতেই ফিরবো আমরা। সবাই তৈরি হও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই রাজা পাকার্দোর কাছে এসে দাঁড়াল। রাজা পাকার্দো বনভূমির দিকে চললেন। পেছনে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসরা।

বনে ঢুকল সবাই। বিকেল হয়ে এসেছে। বনতল বেশ অন্ধকার। গাছগাছালির নিচে দিয়ে বোনঝাড় পার হয়ে সবাই পাহাড়টার দিকে চলল।

পাহাড়ের নিচে এল সবাই। তারপর চড়াই বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে এল। পাহাড় থেকে একে একে নেমে আবার বনভূমিতে ঢুকল। বনভূমি পার হয়ে যখন রাজার পাকার্দোর রাজবাড়ির সামনে এল তখন বেশ রাত। রাজা পাকার্দো রাজবাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর দেহরক্ষীরাও তাঁর সঙ্গে গেল।

রাতের খাবার খাওয়া হয়নি। সবাই ক্ষুধার্ত।

শাঙ্কো রাজবাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরে গেল। রাঁধুনিরা তখনও মেঝেয় বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। শাঙ্কো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙাল। বলল—রাজার সঙ্গে আমরা ফিরে এসেছি। এখনও রাতের খাওয়া জোটেনি। শিগগির যা পারো রেঁধে দাও। অগত্যা ঘুম ভেঙে রাঁধুনিদের উঠতে হল। ওরা রান্না চাপাল।

ফ্রান্সিসরা সৈন্যাবাসের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবাই বেশ ক্লান্ত। শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। বাকিরা বসে। কখন রান্না হয়।

তখনই মারিয়া ছুটতে ছুটতে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এল। ফ্রান্সিসকে বলল—তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—না-না। শুধু দুজন বন্ধু আহত হয়েছে। আজ তো রাত হয়ে গেছে। কালকে বৈদ্য ডেকে চিকিৎসা করাব।

—তাহলে কাল খাওয়া দাওয়া সেরে চলো জাহাজে ফিরে যাই। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—অত তাড়া কীসের? দু' একটা দিন থাকি না।

—তার মানে কোন গুপ্তধনের খোঁজ করবে। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। ঠিক ধরেছো। একটু ধৈর্য ধরো। আর কটা দিন। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—গুপ্তধনের ভূত যখন তোমার মাথায় ঢুকেছে তখন তোমাকে আটকাবে কে। মারিয়া বলল।

—রাজবাড়িতে তো আরামেই আছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—তা আছি। তবু দেশে ফিরে যাওয়া—মারিয়া আর কিছু বলল না।

—ঠিক আছে। মাত্র তো কয়েকটা দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও তোমার সঙ্গে গুপ্তধন খুঁজতে যাবো। মারিয়া বলল।

—বেশ। যেও। রাতের খাবার খেয়েছো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—তাহলে এখন ঘুমুতে যাও। কাল সকালে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর রাজবাড়িতে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাঁধুনিরা খাবর টাক[illegible] নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসরা পাতা পেতে খেতে বসল। গরম গরম মাংসের ঝো[illegible] রুটি। ক্ষুধার্ত সবাই খেতে লাগল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তাহলে দিন কয়েক এখানে থাকবে?

—হ্যাঁ। শুনেছো তো—এখানকার মন্ত্রীমশাই কিছু ধনসম্পদ গোপনে কোথাও রেখে গেছেন। সেসব উদ্ধার করবো।

—কিছু সূত্র পেলে? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—এখনও তেমন দরকারি সূত্র কিছু পাইনি। কালকে সকাল থেকে লাগতে হবে। এখন বিস্তানোকে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ তো চিস্তানো আমাদের সঙ্গেই খাচ্ছে। হ্যারি বিস্তানোকে দেখিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বিস্তানোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিস্তানো খাওয়া সেরে একবার আমার কাছে এসো। খেতে খেতে বিস্তানো মাথা কাত করল।

খাওয়া শেষ করে বিস্তানো ফ্রান্সিসের কাছে এল।

—কী ব্যাপার বলো তো? ও জানতে চাইল।

—তোমাদের মন্ত্রীমশাই এক ধনভাণ্ডার এই রাজ্যেই কোথাও গোপনে রেখে গেছেন যার খোঁজ রাজা পাকার্দো বা রানি কেউ রাখেন না। হ্যারি বললো।

—হ্যাঁ। তবে রাজা পাকার্দো সেই ধনভাণ্ডার খোঁজার কোন চেষ্টাই করেননি। এই রাজা পাকার্দো এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। বিস্তানো বলল।

—যাক গে। আমি সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আনোতারও অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোন হদিশই করতে পারেনি। বিস্তানো বলল।

—রাজা আনোর্তোর মাথা মোটা লোক। ওর বুদ্ধিতে কুলোয় নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পারবে? বিস্তানো বলল।

—চেষ্টা তো করি। যাকগে তুমি রাজা পাকার্দোর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো—আমরা রাজবাড়ির সব জায়গা খুঁজবো।

—বেশ। আমি রাজার অনুমতি নিতে যাচ্ছি। বিস্তানো বলল।

বিস্তানো চলে গেল। তখনই।

পরদিন সকালে মারিয়া এল। বলল—সকালে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজতে বেরুবে বলেছিলে।

—হ্যাঁ যাবো। আমরা রাজবাড়ীর অন্দরমহলে যাবো। বিস্তানো রাজার অনুমতি নিয়ে এসেছে।

মারিয়া আর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস চলল। যেতে যেতে মারিয়াকে বলল—রানি আর অন্দরমহলের স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে জানবে অন্দরমহলের কোথাও গুপ্ত গর্ভঘর আছে কিনা। অথবা অব্যবহার্য কোন ঘরটর আছে কি না।

—আচ্ছা। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

—ফ্রান্সিস! ডাক শুনে ফ্রান্সিস পিছু ফিরে তাকাল। দেখল বিস্তানো আসছে। বিস্তানো এগিয়ে এসে বলল—আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে সব দেখাতে টেখাতে তোমাদের সুবিধে হবে।

—বেশ। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

রাজবাড়িতে ঢুকল সবাই। অন্দরমহলের দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীকে হ্যারি বলল—রানিমাকে খবর দাও—আমরা বিদেশিরা এসেছি। প্রহরী চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল—আপনারা আসুন।

ফ্রান্সিসরা অন্দরমহলে ঢুকল। খুব দামি আসবাবে অন্দরমহল সজ্জিত নয়। তবে যা কিছু আছে সেসব খুব সাজানো গোছানো। সুন্দর রুচির পরিচায়ক। শয়ন কক্ষগুলো দাসীদের ঘর ছক্কাপাঞ্জা খেলার ঘর—সব দেখল ফ্রান্সিসরা। ফ্রান্সিস বিশেষ করে পাথরের পাটা দিয়ে তৈরি দেয়ালগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। তখনই দেখল রাজার শয়নকক্ষের দেয়ালের একটা জায়গায় পরপর তিনটে পেরেক পোঁতা। পেরেকগুলোর নিচে আব্‌ছা চৌকোনো দাগ। ফ্রান্সিস বুঝল এখানে কিছু টাঙানো ছিল। এখন নেই।

জায়গাটা ভালো করে দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস বলল—

—বিস্তানো—এখানে এই তিনটে জায়গায় নিশ্চয়ই কিছু ছিল।

—ঠিকই ধরেছো। এখানে তিনটে ছবি টাঙানো ছিল। বিস্তানো বলল।

—কী ছবি? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা তিনটে ছবি। বিস্তানো বলল।

—কী আঁকা ছিল সেই ছবিগুলোয়? ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই যেমন আঁকতেন। বন-জঙ্গল, পাহাড় ঝর্ণা—এসব। বিস্তানো বলল।

—সেই ছবিগুলো এখন কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—সব ছবি মালখানা ঘরে। আগের রাজা আনোতার সব ছবি বস্তাবন্দী করে মালখানা ঘরে রেখে দিয়েছে। বিস্তানো বলল।

—সেই মালখানা ঘর কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—ডানদিকে। শেষ ঘরটা। বিস্তানো বলল।

—চলো। ঐ ঘরটা দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মশাল লাগবে। ঘুপ্‌চি ঘর। আমি প্রহরীদের কাছ থেকে মশাল জ্বালিয়ে আনছি। বিস্তানো বলল।

—তাই আনো। ফ্রান্সিস বলল। বিস্তানো মশাল আনতে চলে গেল। একটু পরেই দুটো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে একটা মশাল দিল।

সবাই ডানদিকে চলল। বেশ কিছুটা যেতে দেখা গেল ডানদিকে একটা ঘর। বেশ বড় ঘর। পাথরের দরজা ভেজানো। ফ্রান্সিস ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলল। ভেতরে ঢুকল সবাই। বাইরে থেকে ঘরটা যতটা বড় মনে হয়েছিল ভেতরে ঢুকে দেখা গেল ঘরটা তার চেয়েও বড়। মশালের আলোয় দেখা গেল ভাঙা আসবাবপত্র ভাঙা তরোয়াল বর্শা মাকড়শার জাল। একটা নাক চাপা গন্ধ।

একপাশে দেখা গেল কাপড়ের বস্তা রাখা। বিস্তানো বলল—এই বস্তাগুলোয় বোধহয় ছবিগুলো রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস হাতেধরা মশালটা হ্যারির হাতে দিয়ে বলল—বস্তার কাছে মশালটা ধরো। ফ্রান্সিস বস্তাগুলোর কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল বস্তুগুলোর মুখ বাঁধা নেই। ফ্রান্সিস টেনে টেনে ছবিগুলো বের করতে লাগল। গুণে দেখল ছটা ছবি আছে। ফ্রান্সিস বলল—বিস্তানো মন্ত্রীমশাইর সব ছবিই কি এখানে আছে?

—হ্যাঁ। এই রাজবাড়িতে ছিল তিনটে ছবি। বাকি তিনটে ছিল মন্ত্রীমশাইর বাড়িতে। একটা ছবিই তিনি বেশিদিন ধরে আঁকতেন। তাই ছবির সংখ্যা বেশি নয়। বিস্তানো বলল।

এবার ফ্রান্সিস একটা ছবি বের করল। চামড়া মেশানো কাগজের ওপর ছবিগুলো আঁকা। চারপাশ কাঠের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। ফ্রান্সিস ছবিটা ভালোভাবে দেখল। সত্যিই—গাছ লতাপাতা ফুল আর পাহাড় আঁকা। ফ্রান্সিস সব ছবিগুলোই একে একে দেখল। একটা ছবিতে ঝর্ণা আঁকা আছে। দুটো ছবিতে বনের মাথায় পাখি উড়ছে এরকম আছে। ফ্রান্সিস ছবিগুলো আবার দেখল। নিসর্গ চিত্র। এর মধ্যে কোন সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মনের আনন্দে আঁকা এক শিল্পীর ছবি।

সবাই ছবিগুলো দেখল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—মারিয়া তুমি তো ছবি বোঝ। তোমার কাছে কেমন লাগছে ছবিগুলো।

—বেশ উঁচু মানের ছবি। মন্ত্রীমশাই নিঃসন্দেহে একজন যথার্থ শিল্পী ছিলেন। ছবিগুলোতে খুব বেশি রঙ ব্যবহার করা হয়নি। শুধু সবুজ নীল আর লাল। পাহাড়ের মাথায় সূর্যাস্তর লাল সূর্য আর মেঘ আঁকা হয়েছে। অন্য কোন ছবিতে লাল রঙ ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু আমি বলছি এই রঙগুলো উনি পেলেন কোথায়?

বিস্তানো বলল—গাছ-গাছালির রস সবুজ পাথর ফলের রস এসব থেকেই উনি রঙ তৈরি করে নিতেন। এই কাজে কখনো সখনো মন্ত্রী মশাইকে আমিও সাহায্য করেছি।

—হুঁ—ফ্রান্সিস বলল—ছবিগুলো নিয়ে চলো। পরে ভালোভাবে দেখতে হবে।

সবাই মালখানা ঘর থেকে ছবিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল। মশাল নিভিয়ে ফেলা হল।

বেরিয়ে আসার আগে ফ্রান্সিস রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল রাজা একটা চামড়া মেশানো লম্বা কাগজ পড়ছেন। ফ্রান্সিস বলল—ভেতরে আসবো? রাজা কাগজ রেখে উঠে বসলেন। বললেন—এসো এসো। ফ্রান্সিস রাজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—আপনার এই ঘরের দেয়ালে তিনটে চতুষ্কোণ ছাপ দেখলাম। কী ছিল ঐ তিনটে জায়গায়?

—মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা তিনটে ছবি পেরেকে ঝোলানো ছিল। অনেকদিন ছিল। তাই পাথরের দেয়ালে ছাপমত পড়ে গেছে। রাজা বললেন।

—আমরা মালখানা ঘর থেকে বস্তাবন্দী করে রাখা ছবিগুলো নিয়ে এসেছি। অনুরোধ—কোন তিনটে ছবি টাঙানো ছিল যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন। কথাটা বলে ফ্রান্সিস ছবিগুলো তুলে তুলে রাজাকে দেখাতে লাগল। রাজা তিনটে ছবি দেখালেন।

—ঠিক এই তিনটে ছবিই? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তিনরাত তো ছবিগুলো দেখতাম। ভুল হবে কী করে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বিস্তানোকে বলল—ছবি তিনটে যেখানে ঝোলানো ছিল সেভাবে ঝুলিয়ে দাও। বিস্তানো ছবি তিনটে নিয়ে পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস দেখল—একটা ছবিতে শুধু গাছপালা ফুল। অন্যটায় একটা ঝর্ণা আঁকা চারপাশে গাছপালা ফুল। অন্যটায় পাহাড়ের পেছনে লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গাছাপালা ফুল।

—তাহলে বাকি ছবিগুলো মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে ছিল। তাই না বিস্তানো?

—হ্যাঁ। মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে ঐ তিনটে ছবি আমি দেখেছি অনেকদিন। ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। ছবিগুলোর রঙ খুব উজ্জ্বল নয়। কিন্তু রঙগুলো বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। রঙগুলো অনুজ্জ্বল হওয়ায় কেমন যেন স্বপ্নে দেখা গাছ লতাপাতা ফুল পাহাড় মনে হচ্ছে।

—ম্যান্যবর রাজা—আমরা তাহলে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—এসো। রাজা বললেন। তারপর কাগজটা পড়তে লাগলেন।

ফ্রান্সিরা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সৈন্যাবাসের দিকে আসতে আসতে হ্যারি বলল—এবার কী করবে?

—দুপুরে খেয়েদেয়ে বনভূমি পাহাড়ের দিকে যাবো। মন্ত্রীমশাই কোন কোন জায়গার ছবি এঁকেছিলেন সেটা মেলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে বনপাহাড় এলাকায় যাবে? বিস্তানো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ছবির সঙ্গে ঐ এলাকা মেলাবো। তুমি সঙ্গে থাকলে সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। বিস্তানো আর মারিয়া এল। ফ্রান্সিসরা চলল বনভূমি আর পাহাড়ের দিকে।

বনের মধ্যে ঢুকল সবাই। বনতলে অন্ধকার। গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল সবাই।

একটা অল্প ফাঁকা জায়গায় এল সবাই। সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্তানো বলল—এখানে বসে মন্ত্রীমশাই ছবি এঁকেছিলেন। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে

দেখল সমানে—গাছগাছালি লতাপাতা। গাছে গাছে জড়ানো লতাগাছগুলোয় সুন্দর ঘন নীল রঙের ফুল ফুটে আছে। ফ্রান্সিস চিন্তা করে দেখল এমনি গাছলতার ফুল মন্ত্রীমশাই এঁকেছেন। বিত্তানো এগিয়ে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। একটা খাদের কাছে এল। খাদের ধারে এসে বিত্তানো বলল—এখানে বসেও মন্ত্রীমশাই ছবি এঁকেছেন। ফ্রান্সিস সামনের দিকে বেশ মনোযোগের সঙ্গে তাকাল। দেখল গাছগাছালির পেছনে পাহাড়ের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। গাছগুলো হলুদ ফুলে ফুলে ছাওয়া। ফ্রান্সিস চিন্তা করল মন্ত্রীমশাইয়ের একটা ছবির কথা। বুঝল এমনি দৃশ্যই দেখেছে একটা ছবিতে।

আবার চলল সবাই। তখনই জলে ছড়িয়ে পড়ার মৃদু শব্দ শুনল। বেশ কিছুটা এগোতেই দেখল একটা ঝর্ণা। কালচে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঝর্ণার জল গড়িয়ে নামছে। এখন জলের শব্দ স্পষ্ট। ঝর্ণার দু'ধারে ফার্ন গাছের ঝোপ। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ঝর্ণা আঁকা ছবিটা। এখানেও বড়বড় গাছ রয়েছে। তবে ফুল নেই কোথাও। দূরে পাহাড়ের মাথাটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। পাহাড়ের মাথার দিকে সূর্য। সূর্য অস্তগামী। এই ছবিটাও ফ্রান্সিসের মনে পড়ল।

বন শেষ। তারপরেই কালচে পাথরের পাহাড় শুরু। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—এদিকে আর গাছগাছালি নেই।

—ঠিকই ধরেছো—বিত্তানো হেসে বলল—শুধু পাহাড় মন্ত্রীমশাই কখনও আঁকেন নি। শুধু গাছপালা ঝর্না ফুল এসব এঁকেছেন। তবে পাহাড়ের দিকে বসে এদিকে তাকিয়ে বনের ছবিও এঁকেছিলেন।

—চলো। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা বিত্তানোর পেছনে পেছনে চলল। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বিত্তানো চলল। এক জায়গায় এসে ওপরের দিকে উঠতে লাগল কিছুটা উঠতেই দেখা গেল পাথরের একটা বড় চাঁই। অঙ্ক আঙ্গুল দিয়ে চাঁইটা দেখিয়ে বিত্তানো বলল—ঐ চাঁইটার ওপর উঠতে হবে।

—হ্যারি—তোমরা থাকো। আমি উঠছি। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইয়ের খাঁজ ধরে ধরে উঠতে লাগল। বিত্তানো কিন্তু উঠল না। এটা দেখে মারিয়া বলল—তুমি উঠলে না?

—আগে তো উঠেছি। তাই আর উঠলাম না। বিত্তানো বলল। কিন্তু মারিয়া অত সহজভাবে ব্যাপারটা নিল না। ও দুশ্চিন্তায় পড়ল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মারিয়া চিৎকার করে ফ্রান্সিসকে সাবধান করতে গেল। তখনই পাথরের চাঁইটা জোরে নড়ে গেল। ফ্রান্সিস টাল সামলাতে পারল না। পা হড়কে চাঁইটার পেছনে পড়ে গেল। সেইসঙ্গে কিছু পাথরের টুকরো ধুলো ঝুরঝুর করে পড়ল। ফ্রান্সিসের আর্ত চিৎকার শুনে ঘটনার আকস্মিকতায় হ্যারি মারিয়া দু'জনেই থ হয়ে গেল। দু'জনেই হতবাক। একটু

পরেই মারিয়া চিৎকার করে ডাকল ফ্রান্সিস। তারপর ঐ চাঁইটার পেছন দিকে ছুটল। কিন্তু দ্রুত যাবে কী করে? ছোট ছোট পাথরের চাঁই ছড়ানো। তার মধ্যে দিয়েই মারিয়া টাল সামলে নিল। হ্যারি সম্বিত ফিরে পেল। সেও চলল ওদিকে। শুধু বিন্তানো দাঁড়িয়ে রইল। পাথরের ছোট ছোট চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে টাল সামলাতে সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ পরে দুজনে ওপারে পৌঁছল। দেখল একটা বুনো জংলা গাছের ঝোপের ওপর ফ্রান্সিস কাত হয়ে পড়ে আছে। কাছে এসে দেখল ফ্রান্সিসের কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। ফ্রান্সিস চোখ বুজে পুড়ে আছে।

মারিয়া কেঁদে ফেলল। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসে পড়ল। ভীতস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস—হ্যারিও ততক্ষণে এসে পড়েছে। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল।

—খুব লেগেছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—মাথাটা—ঘুরছে। ম্লান হেসে ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে ওর পোশাকের নিচে লম্বালম্বি ছিঁড়ে ফেলল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের মাথায় বাঁধতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখমুখ কুঁচকে বলল—লাগছে। এবার মারিয়া সাবধানে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হল। ফ্রান্সিসের বোধহয় একটু কষ্ট কমল। ও আস্তে আস্তে উঠতে গেল।

—এখন উঠো না। একটু শুয়ে থাকো হ্যারি বলল।

—ঝোপটা থাকায়—চোটটা—নইলে হাত পা ভাঙতো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

—ঠিক আছে। একটু বিশ্রাম নাও। হ্যারি বলল।

—না-না—গায়ে তেমন লাগেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু—একটু পরে ওঠো। মারিয়া বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস শুয়ে রইল। একটু পরে বলল—বিন্তানো কোথায়?

—ও আসেনি। হ্যারি বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস শুয়ে রইল। মারিয়া হ্যারি বসে রইল।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তখনও ওর শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। বলা যায় একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলোও। একেবারে মৃত্যু না হলেও হাত পা ভেঙে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যেত।

মারিয়া তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—আমি সুস্থ। কেঁদো না। মারিয়া হাতের উল্টো পিঠে দু'চোখ মুছে বলল—হাঁটতে পারবে?

—মনে হয়—পারবো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস একবার টাল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হ্যারি ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে চলল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ও কি পারে ফ্রান্সিসের শরীরের ভার সামলাতে? তবু টান নিতে নিতে চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনজনে পাথরের চাঁইটার পেছন থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য! বিস্তানো নেই। হ্যারি আশা করেছিল বিস্তানো এসে ফ্রান্সিসকে ধরলে ফ্যান্সিসকে বাকি পথটা সাবধানে নিয়ে যাওয়া যাবে। হ্যারি এদিক ওদিক তাকিয়ে বার বার ডাকতে লাগল—বিস্তানো—বিস্তানো। নাঃ। বিস্তানো এই তল্লাটেই নেই। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—

—এই সন্দেহ আমি আগেই করেছিলাম।

—কী সন্দেহ? তার মানে—মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। বিস্তানো জানতো ঐ পাথরের ওপর দাঁড়ানো বিপজ্জনক। ফ্রান্সিস বলল।

—বিস্তানো সব জেনেশুনে—হ্যারি কথাটা শেষ করতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল—

—হ্যাঁ। বিস্তানো মন্ত্রীমশাইয়ের ছবি সম্বন্ধে এমন কিছু জানে যা ও আর কাউকে জানাতে চায় না। আমার খোঁজখবরের নমুনা দেখেও বুঝতে পেরেছে আমি ঠিক পথে এগোচ্ছি। তাই ও আমাকে মেরে ফেলতে বা আহত করতে চেয়েছিল যাতে আমি খোঁজাখুঁজি করতে না পারি।

—আশ্চর্য! আমরা এতটুকু বুঝতে পারি না। হ্যারি বলল—এরমধ্যে ওকে শাস্তি পেতে হবে।

—ঠিক আছে। যা করার ঠিক করবো। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা বনে ঢুকল। গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে ফ্রান্সিস বনের মধ্যে দিয়ে চলল। হ্যারি বেশ কষ্ট করে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে নিয়ে চলল।

বনের বাইরে মাঠে এসে ওরা যখন পৌঁছলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

ওরা সৈন্যাবাসের ঘরে ঢুকতে বন্ধুরা প্রায় ছুটে এল। সবাই জানতে চায় ফ্রান্সিস কিভাবে আহত হল। হ্যারি আস্তে আস্তে সব বলতে লাগল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে ঘাসপাতার বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

মারিয়া ভেনএর কাছে ছুটে এল। বলল—ফ্রান্সিস আহত। কপাল কেটে গেছে। একটা কিছু করুন।

—কী করবো রাজকুমারী। আমার ওষুধ টষুধ সবই তো জাহাজে। আপাতত একটা কাজ করুন। শুনলাম তো পড়ে গিয়ে লেগেছে। এক কাজ করুন। গায়ে হাতে পায়ে জলে ভেজা ন্যাকড়া বুলিয়ে দিন। কষ্ট অনেকটা কমবে।

—বেশ। তাই করছি। মারিয়া বলল।

—বলছিলাম—রাজা পাকার্দোর সঙ্গে তো ফ্রান্সিসের সম্পর্ক খুব ভালো। রাজাকে বললে তাঁর বৈদ্য এসে ওষুধ দিয়ে যেতে পারবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। এটা করা যায়। আমি নিজে রাজাকে বলতে যাবো। মারিয়া বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। নিজের পোশাকের ঝুল থেকে আরো কাপড়

ছিঁড়ল। একটা কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। তারপর ন্যাকড়া ভিজিয়ে ফ্রান্সিসের সারা গায়ে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

এবার মারিয়া হ্যারিকে ডাকল। বলল—হ্যারি—ফ্রান্সিসের গায়ে হাতে পায়ে জলে ভেজা ন্যাকড়াটা বুলিয়ে দাও। আমি বৈদ্য ডাকার ব্যবস্থা করছি।

—বেশ। আপনি যান। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাজবৈদ্য এল। ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা টরীক্ষা করে কপালে ওষুধ লাগাল। শরীরেও মাখবার ওষুধ দিয়ে গেল। ওষুধ পড়ায় ফ্রান্সিস একটু সুস্থবোধ করল। চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—বিস্তানোকে দেখেছো?

—না। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল।

—একটু রাজবাড়িতে যাও। ওকে খুঁজে বের কর। তারপর ধরে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—ও যদি আসতে না চায়? হ্যারি বলল।

—জোর করে নিয়ে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব জোরাজুরি—আমি পারবো না। বরং শাঙ্কো আর বিনেলো যাক।

—ঠিক আছে। তুমি ওদের দু'জনকে ডাকো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি দু'জনকে ডেকে নিয়ে এল। ওরা আসতে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি বিস্তানোকে ধরে আনতে যাচ্ছে। যদি বিস্তানো আসতে না চায় শাঙ্কো তুমি ছোরা দেখিয়ে ওকে নিয়ে আসবে।

শাঙ্কো আর বিনেলোকে নিয়ে হ্যারি চলল রাজবাড়ির দিকে।

ওরা রাজবাড়ির রাজসভাঘর এঘর ওঘর খুঁজলো। কোথাও বিস্তানোকে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের পাশের রসুইঘরে গেল। দেখল কাঠের লম্বা পাটাতনে বসে বিস্তানো খাবার খাচ্ছে। হ্যারি ওর সামনে এসে দাঁড়াল। খেতে খেতে বিস্তানো মুখ তুলে বলল—কী ব্যাপার?

—তোমাকেই খুঁজছিলাম। ফ্রান্সিস তোমাকে ডেকেছে। আমাদের সঙ্গে চলো। হ্যারি বলল।

—আমি কী করে যাবো? আমার অনেক কাজ। রাজা খবর পেয়েছিল। তাঁর বেশ কিছু সৈন্য বনে পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছে। তাদের আনতে যেতে হবে। রাজার হুমুক। বিস্তানো খেতে খেতে বলল।

—তার আগে ফ্রান্সিসের কাছে চলো। হ্যারি বলল।

—না না। রাজার হুকুম। বিস্তানো বলল।

হ্যারি ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। ছোরাটা বিস্তানোর পিঠে চেপে ধরে শাঙ্কো বলল—তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বিস্তানো এতটা ভাবেনি। ও বোকাটে মুখে

শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো তাড়া লাগাল—জলদি খেয়ে নাও। বিত্তানো বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। ওকে মেরেই না ফেলে। ও হাপুস্ হুপুস্ করে খেয়ে নিল। হাতমুখ ধুয়ে বলল—বেশ চলো।

বিত্তানোকে নিয়ে ফিরে এসে ওরা দেখল ফ্রান্সিস শুয়ে আছে। ওদের দেখে ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—বিত্তানো—দুর্ঘটনার পরে আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি—এসব না দেখেই পালিয়ে এলে কেন?

—ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বিত্তানো বলল।

—যদি বলি তুমি ভালো করেই জানতে ঐ পাথরের চাঁইটা নড়বড়ে। যে কেউ ওটায় উঠলে টাল সামলাতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি জানতাম না। বিত্তানো জোরে মাথা নেড়ে বলল।

—না বিত্তানো—তুমি জানতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মন্ত্রীমশাই নিশ্চয়ই তাঁর গুপ্ত ভাণ্ডারের কিছু হদিশ তোমাকে দিয়ে গেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি কিছু জানি না। মন্ত্রীমশাই এই ব্যাপারে আমায় কিছু বলে যান নি। বিত্তানো একইভাবে বলল।

—উঁহু। তুমি জানো ফ্রান্সিস বলল।

—বললাম তো—ফ্রান্সিস ওকে কথাটা শেষ করতে দিল না। বলে উঠল—

—কথা বাড়িও না। ঐ ছবিগুলো সম্বন্ধে মন্ত্রীমশাই নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু বলে গেছেন।

—বলেছিলেন—তবে তেমন কিছু না।

—তেমন কিছু কিনা সেটা আমি বুঝবো। তুমি বলো—মন্ত্রীমশাই কী বলেছিলেন?

—কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—আমার আঁকা ছবিগুলো সাংকেতিক।

—'সাংকেতিক'—এই শব্দটাই বলেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কোন বিশেষ একটা ছবি না সব ছবি?

—তা' তো বলতে পারবো না।

—কাজেই বোঝা যাচ্ছে—ছবিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমি আগেই ভেবেছিলাম। এবার নিশ্চিত হলাম। যাক গে—বিত্তানো—জেনে রাখো—তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। একটা কথা—এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমি উদ্ধার করবোই। রাজাকে বলে তোমাকে তার কিছু অংশ দিতাম। সেটা আর তোমার ভাগ্যে জুটল না। তুমি যাও। আর কক্ষণো আমাদের কাছে এসো না। বিত্তানো আর কোন কথা বলতে পারলো না। আস্তে আস্তে চলে গেল।

—ছবিগুলো আবার ভালো করে দেখতে হবে। মেলাতে হবে বাস্তব বনের দৃশ্যগুলোর সঙ্গে। সব রহস্যের সমাধান আছে ঐ ছবিগুলোরই মধ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—এতগুলো ছবির মধ্যে থেকে সূত্র পাবে কী করে? হ্যারি জানতে চাইল।

—সেটা ছবিগুলো বাছাই করে হিসেব করতে হবে। সেইজন্যেই ছবিগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—চলো। রাজবাড়িতে যাবো। ছবিগুলো ওখানেই রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজসভায় যখন পৌঁছল তখন রাজসভায় বিচার চলছে।

—একটু অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

বিচারের কাজ চলল। একসময় বিচার শেষ হল। রাজা পাকার্দো ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—মান্যবর রাজা—আমরা মন্ত্রীমশাইয়ের আঁকা ছবিগুলো আমাদের ঘরে নিয়ে যাবো। ছবিগুলো ভালো করে দেখতে চাই।

—বেশ তো। রাজা বললেন। তারপর একজন প্রহরীকে ইশারায় ডাকলেন। ফ্রান্সিসকে বললেন—প্রহরী যাচ্ছে। ওই ছবিগুলো তোমাদের ঘরে পৌঁছে দেবে।

ফ্রান্সিস হ্যারি রাজবাড়ির বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে প্রহরী ছবিগুলো নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা ওকে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসদের ঘরে ছবিগুলো রেখে প্রহরী চলে গেল। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি তিনখানা ছবি নাও। হ্যারিকে বলল—তুমি একটা নাও। বাকি দুটো আমি নিচ্ছি। এবার চলো—বন পাহাড়ের দিকে।

ছবি নিয়ে বনভূমিতে ঢুকল তিনজনে।

আগের দিন দেখা জায়গাটায় এল। ফ্রান্সিস দৃশ্যটার সঙ্গে ছবিগুলো মেলাতে মেলাতে একটা ছবি মেলাল। হিসেব করে দেখল ছবিটা মন্ত্রীমশাইর বাড়িতে ছিল।

আবার চলল তিনজনে। গতকালের জায়গায় এল। ছবি মেলাল। মন্ত্রীর বাড়িতে রাখা ছবিটা মিলল।

এমনি করে ঝর্নার কাছে এল। ছবি মিলিয়ে দেখল দু'টো ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এই দুটো ছবি রাজার শয়ন কক্ষের দেয়ালে টাঙানো ছিল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে—এই তিন নম্বর ছবিটা মিলল না। এটাও রাজার শয়নকক্ষে টাঙানো ছিল। ফ্রান্সিস ছবিটা নিয়ে আরো বাঁদিকে সরে এল। আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য প্রায় মাথার ওপর। যদি সূর্যটাকে পাহাড়ের গায়ে নামিয়ে ভাবা যায় অর্থাৎ অস্ত যাচ্ছে এরকম ভাবা যায় তাহলে মিলে যাচ্ছে। তখনই ভালোভাবে মেলাতে গিয়ে দেখল পাহাড়ের নিচে একটা গুহামত। কিছু গাছ ডালপাতার আড়াল দেখা যাচ্ছে। খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু ছবিতে সেটা আঁকা নেই। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্যই হল। মন্ত্রীমশাই এত নিখুঁত গাছডালপালা পাহাড়ের অংশ নীল আকাশ পাখি এঁকেছেন অথচ ঐ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুহামুখটা সেটাই আঁকেন নি। কী করে এই ভুলটা হল? তাহলে কি উনি গুহামুখটা দেখতে

পাননি? অথবা ইচ্ছে করেই ওটা বাদ দিয়েছেন। বাদ দিয়ে থাকলে কেন বাদ দিয়েছেন? ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর। ভালো করে দেখ—গাছ ডালপালার আড়ালে একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা অস্পষ্ট গুহামুখ। হ্যারি ভালো করে তাকাল। সত্যিই তো! একটা গুহামুখ। তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল—হ্যাঁ। তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

—অথচ ছবিতে ঐ গুহামুখটা নেই। প্রশ্ন হ'ল—কেন নেই? ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই তো বৃদ্ধই ছিলেন। নজরে পড়েনি হয়তো। হ্যারি বলল;

—উঁহু। ব্যাপারটা অত সহজ সরল নয়। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই ওটা আঁকেন নি। সামান্য ফুল পাখি বাদ যায় নি আর ঐ গুহামুখটা বাদ যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—এই ব্যাপারটা তো রাজা পাকার্দোর নজর পড়ার কথা। হ্যারি বলল।

—নজরে পড়ে নি। কারণ উনি ছবিটা আমার মত মিলিয়ে দেখেন নি। ভুলে যেও না মন্ত্রীমশাই তাঁর ছবিগুলো সম্পর্কে বলেছিলেন—তাঁর ছবিগুলো সাংকেতিক। কোন সংকেত না দেওয়াও এক ধরনের সংকেত। চলো ঐ গুহামুখটা দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে গাছপালা বুনো ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলল। একটু পরেই গুহামুখে এসে দাঁড়াল। গুহামুখ খুব বড় নয়। মাথা নিচু করে একজন মানুষ ঢুকতে পারে এমন।

ফ্রান্সিস গুহামুখের দিকে চলল। হ্যারি বলে উঠল—সাবধান ফ্রান্সিস—অচেনা অজানা গুহা। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে বলল—কিন্তু দেখতে তো হবে—গুহাটা কত লম্বা। ভেতরেও কী আছে।

ফ্রান্সিস পায়ে পায়ে মাথা নিচু করে গুহার মধ্যে ঢুকল। বাইরের উজ্জ্বল রোদ থেকে গুহায় একটু ঢুকে দেখল শুধু অন্ধকার। এবড়ো খেবড়ো গুহার গায়ের আভাস। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে অস্পষ্ট দেখল গুহাটা খুব বড় নয়। আর একপা ফেলতেই পায়ের নিচে কী কিলবিল করে উঠল। সাপ! ফ্রান্সিস লাফ দিয়ে সরে এল। ভাগ্য ভালো। কামড়ায় নি।

ফ্রান্সিস গুহা থেকে বেরিয়ে এল। হ্যারিদের কাছে এল। বলল—গুহাটা বেশি বড় নয়। ভেতরে সাপের গায়ে পা দিয়েছিলাম। যাক গে মশাল ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না।

তখনই হঠাৎ পেছনে ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে কার আর্তস্বর। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে পেছনে লাফ দিয়ে এক বুনো ঝোপের ওপর পড়ল। তারপর যে গাছের ডাল ভেঙে ঝুলছিল আর এক লাফে সেখানে গিয়ে পড়ল। আলো অন্ধকারে দেখল বিস্তানো চিৎ হয়ে পড়ে আছে। শাঙ্কো ওকে টেনে তুলল। বিস্তানো চোখমুখ কুঁচকে বলল—কোমরে বড্ড লেগেছে।

—আমরা কী করি তাই দেখতে গাছে উঠেছিলে—তাই না? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। খুব আক্কেল হয়েছে। বিস্তানো বলল।

—ফ্রান্সিসের কাছে চলো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বিস্তানোকে ধরে ধরে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—এই যে বিস্তানো। আমাদের ওপর নজরদারি চালাতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়েছে।

—বিস্তানো কী শাস্তি চাও? ফ্রান্সিস বলল।

—যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে আমার। কোমরটা বোধহয় ভেঙেই গেছে।

—ঠিক আছে ঐ ভাঙা কোমর নিয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দু'টো মশাল নিয়ে এসো।

—বেশ। যাচ্ছি। কিন্তু মশাল নিয়ে কী করবে? বিস্তানো জানতে চাইল।

—এই গুহায় ঢুকবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সর্বনাশ। এই গুহায় সাপের আড্ডা। এই গুহার ত্রিসীমানায় কেউ আসে না। বিস্তানো বলল।

—ঠিক আছে। তুমি মশাল চকমকি পাথর নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। যাচ্ছি। তবে কোমরের যা অবস্থা। বিস্তানো বিরসমুখে বলল।

—ওটাই তোমার শাস্তি। যাও। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্তানো বিড়বিড় করে আপনমনে বকতে বকতে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা এখানে ওখানে পাথরের ওপর বসে রইল।

বিস্তানো যখন মশাল নিয়ে ফিরে এল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। বিস্তানো দু'টো মশাল ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে হাঁফাতে লাগল। মুখ কুঁচকে কোমরের ব্যথা সহ্য করতে লাগল।

শাঙ্কো চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালল। ফ্রান্সিসকে একটা মশাল দিল। অন্যটা নিজে নিল।

এবার দুজনে মশাল হাতে গুহার মধ্যে ঢুকল। একটা কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া গুহার মধ্যে থেকে ছুটে এল। ফ্রান্সিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল।

বেশ কিছুটা যেতেই চোখের সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ফ্রান্সিস থম্‌কে দাঁড়াল। পেছনে শাঙ্কোকে হাত দিয়ে থামাল। সামনেই একটা অমসৃন পাথরের বেদী মত। কত বিচিত্র রঙের সাপ ছোটবড় সাপ এদিক ওদিক কিলবিল করছে। নড়ছে জড়াজড়ি করছে ফণা তুলছে। মশালের আলো পড়ে সাপগুলোর গায়ের আঁশ চক্‌চক্‌ করছে। আরও আশ্চর্য—ছোট চত্বরটা জুড়ে ছড়ানো হীরে মুক্তো। মণিমানিক্য গয়না গাটি। ওগুলোর মধ্যে দিয়েই সাপগুলো যেন খেলে বেড়াচ্ছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—

—শাঙ্কো—মন্ত্রীমশাই এখানেই এই ধনসম্পদ গোপনে রেখেছিলেন।

—তাহ'লে এটাই সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার? শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল।

—হ্যাঁ। ছবিতে কোন সংকেত না দিয়েই এই সংকেত দিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করবে এখন? শাঙ্কো প্রশ্ন করল।

—সাপ তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। হ্যারি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল—কিছু হদিশ পেলে?

—হ্যাঁ। এই গুহাতেই আছে গুপ্তধন। কিন্তু তা উদ্ধার করতে এখনও কিছু কাজ বাকি। চলো—বেশ কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করতে হবে।

একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিস্তানো এগিয়ে এল। বলল—গুপ্তধন এখানেই আছে?

—হ্যাঁ। তবে এখনো হাতের নাগালের বাইরে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা মশাল পাথরের খাঁজে রেখে বনের মধ্যে ঢুকল। গাছের শুকনো ডালপাতা জোগাড় করে নিয়ে এল। গুহার মুখে জড়ো করল। মশালের আগুনে ডালপাতায় আগুন জ্বালল। তারপর সেসব গুহার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। আগুনে ধোঁয়ারও সৃষ্টি হল। গুহা ধোঁয়ায় ভরে গেল। সেইসঙ্গে আগুনও ছড়াল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—গুহামুখ থেকে সরে এসো।

দুজনেই একটু দূরে সরে এল। ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপগুলো কিলবিল করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল। হ্যারি আর বিস্তানো অবাক। এত সাপ? সাপগুলো এদিক ওদিক পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক সাপ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বলল—হ্যারি তোমার কোমরের ফেট্টিটা খোল। হ্যারি খুলে দিল। ফেট্টিটা নিয়ে বলল শাঙ্কো এবার গুহার মধ্যে চলো। বোধ হয় সব সাপ পালিয়েছে।

তিনজনে গুহার মধ্যে ঢুকল। বিস্তানোও খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের পেছনে পেছনে চলল।

গুহায় ঢুকে ফ্রান্সিস মশালের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে ভালো করে দেখল। না। কোন সাপ নেই। হ্যারি আর বিস্তানো অত সোনা পান্না হীরে চুনি দেখে হতবাক।

ফ্রান্সিস বেদীটার কাছে গেল মশালটা হ্যারির হাতে দিল তারপর ফেট্টির কাপড়টা পাতলা। সোনার চাকতি হীরে মুক্তো চুনি পান্না সব কাপড়টায় ভরল। কাপড়ের মুখটা বাঁধল। একটা বোচ্‌কামত হল। শাঙ্কো বাঁ হাতে মশালটা নিয়ে বোঁচকাটা ডানহাতে ঝুলিয়ে নিল।

সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বনের মধ্যে ঢুকল। চলল প্রায় অন্ধকার পথ বনতল দিয়ে। সঙ্গে বিস্তানো।

বন থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দুপুরে খাওয়া হয় নি। সবাই ক্ষুধার্ত।

শাঙ্কো বলল—এখন কী করবে?

—আগে খেয়ে নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। তারপর রাজার কাছে যাবো। বিস্তানোকে বলল—তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নাও।

ঘরে ঢুকতে বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। তাদের প্রশ্ন ছিল—না খেয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলে তোমরা। রাজকুমারী সেই তোমরা বেরিয়ে যাবার পর এসেছেন। এখনও কিছুই মুখে দেননি।

—মারিয়া তুমি খেয়ে নিলে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

—উপবাসী তোমরা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছো আর আমি পেট ভরে খাবো?

—ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে খাবে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কোন হদিশ পেলে? মারিয়া জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো বোঁচ্‌কা খোল।

শাঙ্কো হাতের বোঁচকাটা ঘাসপাতার বিছানায় রাখল। গিঁট খুলে কাপড়টা খুলে দিল। একসঙ্গে সেই সোনার চাকতি হীরে মুক্তো দেখে সবাই হতবাক। কিছুক্ষণ সবাই চুপ। সিনাত্রা একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলল—

—ও-হো-হো। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিজেদের ঘরে এল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর উঠে বসল। বলল—হ্যারি চলো—রাজা পাকার্দোকে তার প্রাপ্য দিয়ে আসি। কাল সকালেই আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।

ফ্রান্সিস হ্যারি চলল রাজবাড়ির দিকে। সঙ্গে ধনভাণ্ডারের বোঁচকা নিয়ে শাঙ্কোও চলল।

সদর দেউড়িতে পাহারারত প্রহরীকে হ্যারি বলল—যাও। রাজাকে গিয়ে বলো—বিদেশিরা এসেছে। দেখা করতে চায়। বিশেষ প্রয়োজন।

প্রহরী চলে গেল। কিছু পরে ফিরে এসে বলল—মন্ত্রণাঘর খুলে দিয়েছি। আপনারা বসুন। মান্যবর রাজা আসছেন।

ফ্রান্সিসরা রাজবাড়িতে ঢুকে মন্ত্রণাকক্ষে এল। একটা পাথরের টেবিল ঘিরে আসনপাতা। একজন প্রহরী একটা মশাল জ্বেলে রেখে গেল। ফ্রান্সিসরা আসনে বসল। শাঙ্কো বোঁচকাটা টেবিলের ওপর রাখল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ঢুকলেন। বললেন—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো?

—হ্যাঁ। কালকে সকালে আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।

—বেশ। তোমরা আমার জন্যে যা করেছো তা আমি কোনদিন ভুলবো না।

—মান্যবর রাজা—মন্ত্রীমশাই যে ধনরত্ন গোপনে রেখেছিলেন তা আমরা উদ্ধার করেছি।

—বলো কি। এ তো সত্যিই সুসংবাদ। রাজা একটু আশ্চর্য হয়েই বললেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো গিঁট খুলে কাপড়টা টেবিলে পেতে দিল। সোনা হীরে মনিমুক্তো গয়নাগাটি ছড়ানো কাপড়ের ওপর। রাজা পাকার্দো কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এত দামি জিনিস। আমি কল্পনাও করি নি। যা হোক—তোমরা কষ্ট করে উদ্ধার করেছো—তোমাদেরও তো কিছু দিতে হয়।

—আমাদের দশটা সোনার চাকতি দিন তাহলেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। এত সামান্য—রাজা বললেন।

—না। এর বেশি কিছু চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমরা যেমন চাও। রাজা কুড়িটা সোনার চাকতি দিলেন। ফ্রান্সিস আর আপত্তি করল না।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—তাহ'লে আমরা যাচ্ছি।

ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। নিজেদের ঘরে এল।

রাত হচ্ছে। মারিয়া আর রাজবাড়িতে গেল না। ফ্রান্সিসদের সঙ্গে থেকে গেল।

ভোর হল। সবাই উঠে পড়ল। সবাই তৈরি হতে লাগল।

সকাল হল। সকালের খাবার এল। খেয়ে দেয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাঠ পার হয়ে বনভূমিতে ঢুকল। চলল সমুদ্রের দিকে।

একটু বেলায় জাহাজঘাটে পৌঁছল। ফ্রান্সিস রাঁধুনি বন্ধুদের ডেকে বলল—রান্না শুরু কর। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে জাহাজ ছাড়বো। রাঁধুনি বন্ধুরা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। কয়েকজন পালের দড়িফড়ী বাঁধতে লাগল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতে জাহাজের নোঙর তোলা হল। জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হল। জাহাজ চলল সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

দুপুর থেকেই আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছিল। ঝড়ের পূর্বাভাস। ভাইকিংরা জাহাজেই ঘুরে বেড়ায়। আকাশের মতিগতি ওরা ভালো বোঝে। মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। প্রায় অন্ধকার হয়ে এল চারদিক।

শুরু হল মেঘগর্জন। সেইসঙ্গে কালো আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি।

ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপর উঠে এল।

গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব। সামাল। ঝড় আসছে। ততক্ষণে ভাইকিংরা জাহাজের পাল নামিয়ে ফেলেছে। ফ্রেজার দৃঢ় হাতে জাহাজের হুইল চেপে ধরেছে। মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো নেমে এসেছে। নীচের দাঁড়ঘর থেকে দাঁড়ীরা ডেক-এ উঠে এসেছে। মাস্তুল আর হালে বাঁধা দড়িদড়া টেনে ধরে সবাই প্রস্তুত হতে হতেই প্রচণ্ড বেগে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। শুরু হল ভাইকিংদের সঙ্গে ঝড়ের লড়াই। তখনই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ফুঁসে উঠতে লাগল সমুদ্রের ঢেউ।

আজ আর মারিয়ার সূর্যাস্ত দেখা হল না।

ঝড় চলল। উঁচু উঁচু ঢেউ এসে জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়তে লাগল। প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যেও ভাইকিংরা দড়িদড়া টেনে ধরে জাহাজ ভাসিয়ে রাখল।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঝড়ের ঝাপটা চলল। তারপরই আকাশের কালো মেঘ উড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্তাচলগামী সূর্য দেখা গেল। ঝড়ের ঝাপটার বেগ কমল। ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ভাইকিংরা যেন স্নান করে উঠেছে। কেউ কেউ এখানে-ওখানে বসে রইল। কেউ কেবিনে গেল ভেজা পোশাক পাল্টাতে।

ফ্রান্সিস ফ্লেজারের কাছে এল। বলল, দিক ঠিক রাখতে পেরেছ?

অসম্ভব। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোনদিকে চলেছে বুঝতে পারছি না।

তাহলে যে কোনো ডাঙায় জাহাজ ভেড়াও। সেখানে খোঁজ নিতে হবে কোথায় এলাম। মোটামুটি উত্তরদিকটা ঠিক রাখার চেষ্টা করো।

দেখি, ফ্লেজার বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলছে। মাস্তুলের ওপরে পেড্রো নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডাঙার দেখা নেই।

আট-দশদিন কেটে গেল। কিন্তু কোথায় ডাঙা? ফ্রান্সিসরা চিন্তায় পড়ল। কোথায় চলেছে জাহাজ? বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কাছে আসে। আশঙ্কা প্রকাশ করে। বলে, লোকবসতি থেকে আমরা অনেক দূরে কাথাও চলে এসেছি।

না-না। এখনও সেটা বল যায় না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলে। ফ্রান্সিসের কথার প্রতিবাদ করে না ওরা। কিন্তু মন থেকে বিপদের আশঙ্কা যায় না।

ডাঙার দেখা নেই। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলল।

সেদিন বিকেলে নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ডাঙা, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। শাঙ্কো ডেকএই বসেছিল। ছুটে রেলিঙের কাছে গেল। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখল সত্যিই ডাঙা, তবে গাছপালায় ভরা। খুব সম্ভব জঙ্গল। তা হোক, শক্ত মাটি তো বটে। বন্ধুরা এসে ভিড় জমাল। সবাই খুশি। ডাঙার দেখা পাওয়া গেছে।

শাঙ্কো ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। ফ্রান্সিসেরও দুশ্চিন্তা কম ছিল না। একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়া আর হ্যারি। জঙ্গল এলাকা পার হয়ে জাহাজ তখন একটা ছোট বন্দরের কাছে এসেছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, যাক ডাঙার দেখা মিলল। ফ্রান্সিস ফ্লেজারের কাছে এল। বলল, এই ছোট বন্দরেই জাহাজ ভেড়াও। দেখা যাক কোথায় এলাম?

দেখা গেল বাড়ি-ঘরদোর জাহাজঘাট থেকে বেশ দূরে।

কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

রাতে আর যাব না। রাতের অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়েছি। ভোর হোক। তখন যাব খোঁজ করতে। ফ্রান্সিস বলল।

আবার একদিন দেরি হবে। মারিয়া বলল।

জোরে জাহাজ চালিয়ে একদিন পুষিয়ে নেব। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

জাহাজঘাটে নোঙর ফেলা হল। রাতের খাওয়া সেরে সবাই শুতে গেল। শাঙ্কো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডেক-এই শুয়ে পড়ল। আকাশের চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। চারধার মোটামুটি আবছা দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের জোর হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। সারাদিনের রোদে পোড়া শরীর আরাম পেল। শাঙ্কো আর বন্ধুরা ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন শেষ রাত। হঠাৎ বর্শামুখের খোঁচা খেয়ে শাঙ্কোর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল উদ্যত বর্শা হাতে দু'তিনজন কালো মানুষ। তাদের সারা শরীর ভেজা। বোঝা গেল সাঁতরে এসে জাহাজে উঠেছে। অন্য বন্ধুদেরও বর্শা দিয়ে খোঁজা দিতে লাগল তারা। সকলের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে বসল। কালো বর্শাধারীরা সংখ্যায় দশ-বারো জন। বর্শাধারীদের মধ্যে থেকে একজন মোটা মতো লোক এগিয়ে এল। দাঁত বার করে হেসে বলল, আমরা তোমাদের জাহাজ লুঠ করতে এসেছি। তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি এখানে দামি কিছু পাব না। তবু সোনার মুদ্রা-টুদ্রা যা পাব তাতেই আমাদের লাভ। তাছাড়া পোশাক-টোশাক তো আছেই।

পোশাক-আসাকও লুঠ করবে? শাঙ্কো অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

যা পাওয়া যায়। লোকটি বলল। বোঝা গেল লুঠেরার দলের সর্দার এই লোকটিই।

নাও, যার কাছে যা আছে বের করো শিগগিরি। সর্দার তাগাদা লাগাল।

ভাইকিংরা বাধা দিতে পারল না। নিরস্ত্র অবস্থায় এখন লড়াইও করা যাবে না। যে যার ফেট্টি থেকে খুচরো মুদ্রা ডেক-এর ওপর ঠক ঠক করে ফেলতে লাগল। সর্দারের সঙ্গীরা তা কুড়িয়ে নিল। শাঙ্কো ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি ফেলল। ঠক করে চাকতির শব্দ হল। সর্দার সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাঙ্কোর কোমরের ফেট্টি খামচে ধরতেই আর একজন শাঙ্কোকে পেছন থেকে চেপে ধরল। সর্দার এক টানে শাঙ্কোর কোমরের ফেট্টি খুলে ফেলল। ঠক ঠক শব্দে আরও কয়েকটা সোনার চাকতি পড়ল। সর্দার নিজেই সেগুলো কুড়িয়ে নিল। হেসে বলল, এই তো, কে বলল যে তোমরা গরিব?

ওপরের ডেক-এ যখন লুঠ চলছে তখন ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও বুঝল ওপরে কিছু একটা ঘটছে। বিছানার নীচ থেকে একটানে তরোয়াল বের করে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল ফ্রান্সিস। দেখল বর্শা হাতে একদল লোক। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল, জাহাজ লুঠ করতে এসেছে। একজন বর্শার ফলাটা

শাঙ্কোর পিঠে চেপে ধরল। শাঙ্কো আর কিছু বলল না। অন্য এক লুঠেরা ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে নেমে এল। বর্শাটা সিঁড়ির ওপর গেঁথে গেল।

ফ্রান্সিস একা লড়াই করতে ভরসা পেল না। সর্দার গলা তুলে বলল, কেউ কথা বললেই মরবে। দুজন বর্শাধারী দুজন ভাইকিং-এর বুকে বর্শার ফলা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস বুঝল এদের কথা মতো চলতে হবে। নইলে বন্ধুরা মরবে। ও ডেক-এ উঠে এল। হাতের তরোয়াল ডেক-এর ওপর ফেলে দিল। বলল, আমরা লড়াই করব না, তোমরা লুঠপাট করে চলে যাও।

সর্দার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, নীচে চল্।

ওরা পাঁচজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। কেবিন ঘরগুলোয় ঢুকতে লাগল। শোরগোলে ভাইকিংদের ঘুম ততক্ষণে ভেঙ্গে গেছে। সর্দার তাদের সতর্ক করে বলল, চুপচাপ সব বসে থাকো। ভাইকিংরা চুপ করে বিছানায় বসে রইল। চলল পোশাক লুঠ। ভাইকিংরা বিছানায় বসে অবাক চোখে দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস বেরোবার সময় কেবিন ঘরের দরজা খুলে রেখে বেরিয়েছিল। সর্দার খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে পড়ল। তখন মারিয়া ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে আছে। মারিয়াকে দেখে সর্দার বুঝল এখানে কিছু গয়নাগাটি পাওয়া যাবে। ও বর্শাটা মারিয়ার দিকে তাক করে বলল, সব গয়নাগাটি দিয়ে দাও।

আমি তো বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে আসিনি যে গয়নাগাটি পরে আসব। মারিয়া বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

সর্দার বিশ্বাস করল না। কড়া গলায় শাসাল, কথা বাড়িও না। যা আছে দাও নইলে মরতে হবে।

মারিয়া এবার ভয় পেল। যেভাবে বর্শা তাক করে আছে, একটু এদিক ওদিক দেখলে ছুঁড়ে মারতে পারে।

ফ্রান্সিস কোথায়? মারিয়া জিগ্যেস করল। সর্দার বুঝল তরোয়াল হাতে লোকটাই ফ্রান্সিস। বলল, ওপরের ডেক এ। আমার চারজন সঙ্গী ওকে ঘিরে আছে। আর কথা না। গয়নাগাটি দাও।

মারিয়া আর কিছু বলল না। বিছানার ধারে রাখা চামড়ার ঝোলাটা বের করল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গয়নার কাঠের বাক্সটা বের করে আনল। বাক্সটা এগিয়ে ধরে বলল, এই নাও। কাউকে হত্যা করতে পারবে না। সর্দার খুশির হাসি হেসে বলল, না না। আমাদের দামি জিনিস পেলেই হল। মানুষ মারব কেন? তারপর জিগ্যেস করল আর কিছু নেই?

না। আমার কাছে আর কিছু নেই।

সর্দার কথা বাড়াল না। গয়নার বাক্সটা বগলে চেপে বেরিয়ে গেল।

পোশাক লুঠ শেষ করে সঙ্গীরা ডেক-এ উঠে এল। সর্দারও এল। দুজন গিয়ে

পাটাতন ফেলল। সর্দারের কাছে মারিয়ার গয়নার বাক্স দেখে ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়া সব গয়নাই দিয়ে দিয়েছে।

পাতা পাটাতন দিয়ে লুঠেরার দল দ্রুত নেমে গেল। তারপর পাটাতনটা জলে ফেলে দিল। তখনই সূর্য উঠল। ভোরের আলোয় দেখা গেল ওরা ডানপাশের জঙ্গলের দিকে চলেছে।

ততক্ষণে ভাইকিংরা খোলা তরোয়াল হাতে ডেক-এ উঠে এসেছে। পাটাতন নেই, পাঁচ-সাতজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়াল দাঁতে চেপে ধরা। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বাধা দিতে গেল, বিপদ বাড়িও না। চলে এসো। ওরা শুনল না। তীরভূমিতে উঠে লুঠেরার দলের দিকে ছুটল। কিন্তু ধরবার আগেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ল দলটা। ভাইকিংরা জঙ্গলের কাছে গিয়ে থমকে গেল। এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় খুঁজবে লুঠেরাদের? ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। দলের মধ্যে বিস্কো ছিল। সে বলল, আমরা সংখ্যায় কম। এখন জঙ্গলে ঢোকা নিরাপদ নয়। ফিরে চলো। তবু কয়েকজন জঙ্গলে ঢুকতে চাইল। বিস্কো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের সামলাল।

বিস্কোরা ফিরে এসে দেখল শাঙ্কোরা পাটাতন জল থেকে এনে পেতে দিয়েছে। তারা জাহাজের ডেক-এ উঠে আসতেই ফ্রান্সিস বলল, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। আবার একদল লুঠেরা এসে হাজির হবে। তখন সমস্যা বাড়বে। পাল তুলে দাও। নোঙর তোলো। দাঁড়ঘরে যাও। ফ্রেজার জাহাজ ছাড়ো।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ আবার ভাসল। সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত। ফ্রান্সিস ফ্রেজারকে বলল, উত্তরদিক ঠিক রেখে চালাও।

ঢেউ ভেঙে জাহাজ এগিয়ে চলল। দু'দিন পরে একটা বন্দরের কাছে এল। জাহাজটা। তখন বেলা হয়েছে।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, একটা বন্দর দেখা যাচ্ছে। কী করবে?

জাহাজ বন্দরে ভেড়াতে বলো। দেখি খোঁজখবর করে।

ফ্রেজার জাহাজঘাটে জাহাজ ভেড়াল। শাঙ্কো নোঙর ফেলল। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। দেখল জাহাজঘাটে আরও কয়েকটা জাহাজ নোঙর করা। বড় বন্দর। বাড়ি-ঘরদোর, লোকজন আছে। বাজার এলাকায় লোকজনের ভিড়। সকলেই কালো। বোঝা গেল এখানে কালো মানুষদেরই বসতি।

হ্যারি জিগ্যেস করল, নামবে?

হ্যাঁ, উত্তর দিল ফ্রান্সিস, দুপুরের খাওয়া সেরে যাব। রাতে খোঁজখবর করতে গেলে বিপদ হতে পারে।

আমি যাব?

না। শাঙ্কোকে নিয়ে আমি নামব।

বন্ধুরা নেমে একটু ঘুরে বেড়াতে চাইছিল, হ্যারি বলল।

না, আবার কোনো বিপদে পড়বে। তখন ওদের বাঁচাতে আমাদের কয়েকজনকে ছুটতে হবে। আমি আর শাঙ্কো গেলেই হবে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কোমরে তরোয়াল গুঁজে জাহাজ থেকে নামল।

বেশ কিছু গাছের নীচে বাজার বসেছে। ফ্রান্সিস লক্ষ করল, প্রথম গাছটার নীচে কোমরে তরোয়াল গোঁজা কয়েকজন কালো যোদ্ধা। যোদ্ধারা ওদের দুজনকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। কিন্তু এখনই ফিরে যেতে গেলে বিপদ বাড়বে।

ফ্রান্সিস বাজারের কাছে এল। একজন বৃদ্ধ কেনাকাটা সেরে ফিরছিল। বৃদ্ধটি ফ্রান্সিসদের দেখে হাসল। ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল। বৃদ্ধটি হাসল কেন? ও বৃদ্ধের কাছে গেল। জিগ্যেস করল, আমাদের দুজনকে দেখে হাসলেন কেন?

তোমরা বিদেশি, তাই দেখে। বৃদ্ধ আবার হাসল।

হাঁ, আমরা বিদেশি। এই বন্দরের নাম কী? শাঙ্কো বলল।

ত্রিম্বা।

এখানকার রাজা কে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

রাজা নেই। তবে শ' দেড়েক বছর আগে এক সুলতান ছিল। সুলতান হানিফ।

মুসলিম রাজা? ফ্রান্সিস অবাক।

হ্যাঁ। কিছুদূরে সুলতানের বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ।

খুব বড়লোক ছিল বুঝি? কৌতূহল বাড়তে থাকে ফ্রান্সিসের।

হ্যাঁ। তার স্বর্ণভাণ্ডারের কথা লোকে এখনও বলে।

এখান থেকে পোর্তুগাল কত দূরে?

তা বলতে পারব না। গরিব মানুষ। দেশ বিদেশে ঘুরব সাধ্য নেই। বৃদ্ধ উত্তর দিল।

তবু কিছু তো ধারণা আপনার আছে?

হবে উত্তরমুখো কোথাও।

ঠিক আছে। এটুকু জানলেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই গাছের নীচে দাড়ানো যোদ্ধার দল ওদের কাছে এল। একজন রোগাটে চেহারার যোদ্ধা জিগ্যেস করল, কী কথা হচ্ছিল তোমাদের?

এখান থেকে পোর্তুগাল কতদূর সেটাই জানতে চেয়েছিলাম। শাঙ্কো বলল।

তোমরা বিদেশি? যোদ্ধাটি জানতে চাইল।

হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

লুঠেরার জাত। যোদ্ধা যুবকটি হেসে বলল।

লোকে বলে বটে। কিন্তু আমরা লুঠেরা নই। বরং আগের বন্দরে একদল
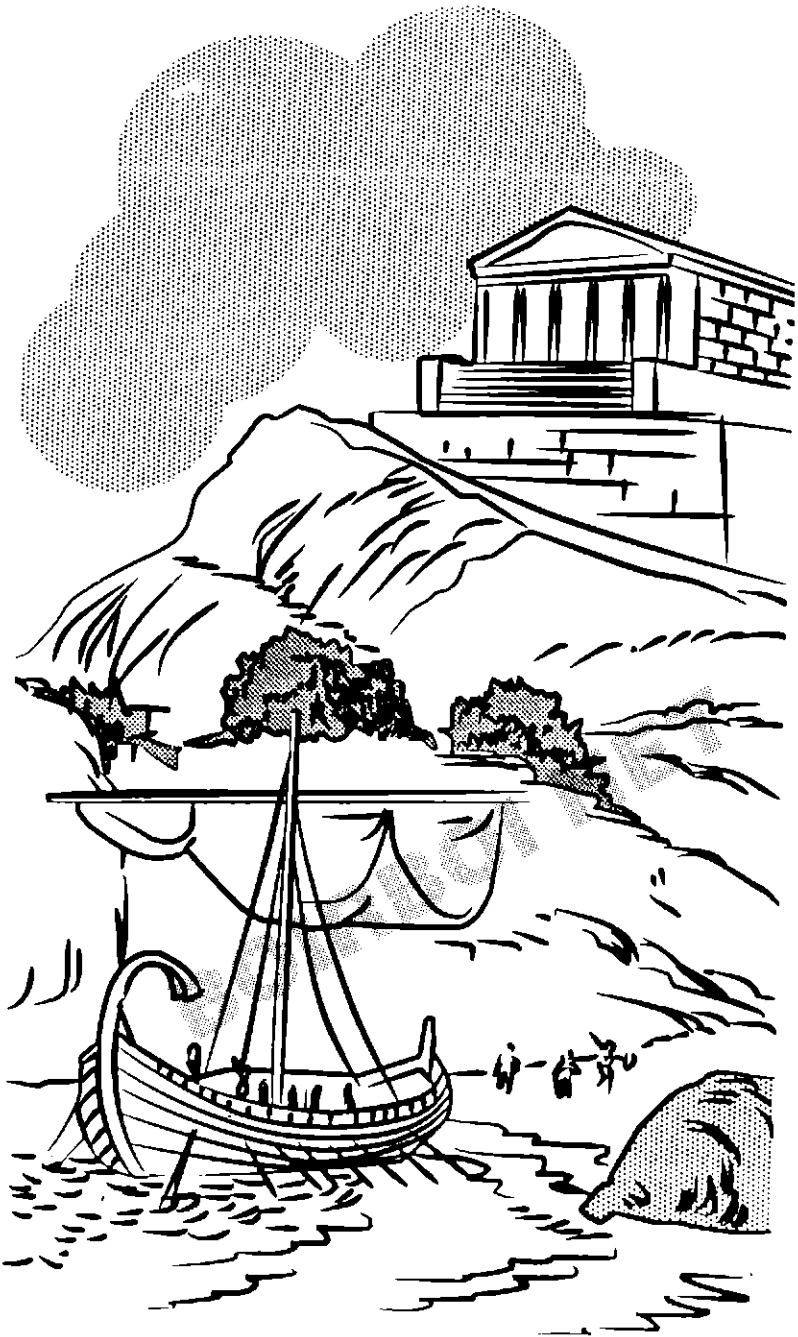
লুঠেরা আমাদের জাহাজ লুঠ করেছে। ফ্রান্সিস ওদের কথোপকথনে যোগ দিল।

তোমরা এখানে এসেছ কেন? যোদ্ধা যুবকটি বলল।

আমাদের দেশ মানে ইউরোপ কতদূর সেটা জানতে। ফ্রান্সিস বলল।

তরোয়াল এনেছ কেন?

যদি হঠাৎ আক্রান্ত হই তাহলে লড়াই করব বলে, ফ্রান্সিস বলল।

আমাদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পারবে?

তোমাদের সঙ্গে লড়াই করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তরোয়াল ফেলে দাও। যোদ্ধাটি বলল।

বেশ, আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস জানাল।

না। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে বলল, আমাদের সঙ্গে লড়াই করো। যদি তারপরেও বেঁচে থাকো তবে জাহাজে ফিরে যাবে।

আমরা দুজনমাত্র। লড়াই করব না। ফ্রান্সিস বলল।

কাপুরুষ! তাচ্ছিল্যে মুখ বাঁকাল যোদ্ধাটি।

বিনা কারণে রক্তপাত আমরা চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

তোমাদের বন্দী করা হল। চলো আমাদের সঙ্গে।

কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আমাদের দলপতির কাছে। দলপতি কী হুকুম করে দেখো। যোদ্ধাটি ওদের বলল।

কিন্তু আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি। এবার শাঙ্কো উত্তর দিল।

সেসব দলপতি বুঝবে। এখন চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, ওদের বাধা দিতে যাওয়া বোকামি হবে।

কথাটা ও নিজেদের ভাষায় বলল। ফলে যোদ্ধারা কিছু বুঝল না। যে ওদের সঙ্গে কথা বলছিল সেই যোদ্ধাটি বেশ চড়াগলায় হুকুম করল, তরোয়াল ফেলে দাও।

ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, তরোয়াল ফেলে দাও। শাঙ্কো তবু ইতস্তত করছিল, যোদ্ধাটি শাঙ্কোর মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। এবার শাঙ্কো তরোয়াল ফেলে দিল।

একজন যোদ্ধা তরোয়াল দুটো তুলে নিল।

যোদ্ধাদের পেছনে পেছনে যেতে যেতে ফ্রান্সিস শাঙ্কো দেশীয় ভাষায় বলল, অতজনের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। দেখা যাক ওদের দলপতি কী বলে?

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে লালচে ধুলোর পথ। মাঝে মাঝে সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া আসছে। লালচে ধুলো উড়ছে। চোখ-মুখ ঢেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট পাহাড়।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরে ফ্রান্সিসরা দেখল সামনে একটা বড় বাড়ি। বাড়িটা তৈরি পাথর আর কাঠ দিয়ে। তার পাশেই একটা ছোট সম্পূর্ণ ঘর।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল, পাশেরটা নিশ্চয়ই কয়েদঘর।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। কিছু বলল না।

বড় ঘরটার দরজা খোলা। সেই রোগা যোদ্ধাটি বলল, ভেতরে ঢোকো। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঘরটায় ঢুকল। বাইরের চড়া রোদ থেকে এসে প্রথমে কিছুই দেখতে পারছিল না। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে দেখল, একজন বয়স্ক লোক একটা কাঠের আসনে বসে আছে। আশ্চর্য! এই কালো লোকদের দেশে বয়স্ক লোকটি শ্বেতকায়। বোঝাই যাচ্ছে এ দলপতি। দলপতি ফ্রান্সিসদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর মোটা গলায় বলল, তোমরা বিদেশি?

আপনিও তো বিদেশি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পোর্তুগীজ। আমার নাম এস্তানো। তোমরা? দলপতির প্রশ্ন।

আমরা ভাইকিং। আমার নাম ফ্রান্সিস।

তোমাদের বদনাম আছে। এস্তানো বলল।

জানি। আমরা তার পরোয়া করি না। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

তুমি দেখছি বেশ তেজি। ভালো।

ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

কিন্তু তোমাদের তো বিশ্বাস নেই।

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

অবিশ্বাসের কোনো কাজ তো আমরা করিনি। এবার বলল শাঙ্কো।

তাছাড়া আমরা এখানে থাকতে আসিনি। ফ্রান্সিস যোগ করল।

আসার সময় তো একটা ছোট পাহাড় দেখেছ?

হ্যাঁ দেখেছি। পেছন দিকে। ফ্রান্সিস বলল।

ঐ পাহাড় থেকে কত যে চুনিপান্না মূল্যবান পাথর পেয়েছি। দেখবে?

না। ওসব দেখে কী হবে? ফ্রান্সিস বলল।

ঐ চুনিপান্না সব বিক্রি করে দেব। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে রাজার হালে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।

এসব আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা শুনে কী করব? ফ্রান্সিস বলল।

এইজন্য শুনবে যে তোমরা সেই দামি পাথর চুরি করতে এখানে এসেছ।

ফ্রান্সিস অবাক। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো বলে উঠল—আপনার দামি পাথরের কথা আমরা এই প্রথম শুনলাম।

উঁহু। এস্তানো হাসল, তোমরা সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছ।

এ আপনার অন্যায় দোষারোপ। ফ্রান্সিস প্রতিবাদ করে উঠল।

তোমরা জাহাজে চড়ে এসেছ? এস্তানো জানতে চাইল।

হ্যাঁ, ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

বাজারে একজন বুড়োর কাছে এসব খবর পেয়েছে। এন্তানো আবার হাসল।

আমরা খোঁজ নিচ্ছিলাম—শাঙ্কো বলতে গেল। এন্তানো ডান হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। বলল, এই ত্রিম্বার সর্বত্র আমার চর আছে। আমি এখানে বসে থাকি, কিন্তু এই তল্লাটের সব খবর রাখি।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারল না। কী বলবে তবে এটা বুঝল যা-ই বলুক না কেন এন্তানো ওদের চোর অপবাদ দেবেই। তার ওপর জলদস্যু বলে ওদের বদনাম তো আছেই। তাই ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। এন্তানো রোগা যোদ্ধাটির দিকে তাকাল। বলল, ওদের কয়েদঘরে নিয়ে যাও। শাঙ্কো মৃদুস্বরে দেশীয় ভাষায় বলল, আবার কয়েদঘর। ফ্রান্সিসও সেই ভাষায় বলল, উপায় নেই। ও যা বলে সে ভাবেই চলতে হবে।

পালাব না? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সব দেখে বুঝে তবে। এখন চলো, বলে এগোল ফ্রান্সিস।

রোগা যোদ্ধাটির পেছনে পেছনে ওরা চলল। ওদের অনুমান ঠিক। সেই পাথরের ঘরের শক্ত কাঠের দরজার সামনে আনা হল ওদের। তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। তারা ঘরের তালা খুলে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল।

ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার বাড়ল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে অন্ধকার চোখে সয়ে এল। ওরা দেখল মেঝেয় শুকনো ঘাস বিছানো। আর তিন-চারজন কালো মানুষ বন্দী সেখানে। তারা ফ্রান্সিসদের একবার শুধু দেখল। বুঝল না দলপতি নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে সেই সাদা মানুষদেরই বন্দী করল কেন?

ফ্রান্সিস বিছানো ঘাসে শুয়ে পড়ল। আবার কয়েদঘরের একঘেয়ে অসহ্য জীবন। কিন্তু কিছুই করার নেই। দরজার দিকে তাকাল। পালাবার ছক কষতে হলে ঘরের সব কিছু ভালোভাবে দেখতে হয়। ঘরটায় কোনো জানালা নেই। দরজায় কিছু ফাঁকফোঁকর করা। ওখান দিয়েই যা আলো-বাতাস আসছে।

একজন বন্দী ফ্রান্সিসকে জিগ্যেস করল, তোমরা তো দলপতি বিন্তোনোর মতো সাদা মানুষ। তোমাদের বন্দী করল কেন?

আমরা নাকি এন্তানোর দামি পাথর চুরি করতে এসেছি।

আমাদেরও চোর বলেছে। বন্দী করেছে। পালাতে হবে। কালো যুবকটি বলল।

দেখো চেষ্টা করে পারো কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে ওদের সামান্য খাবার দিল। সবজির ঝোল আর একটা করে পোড়া রুটি। শাঙ্কো প্রতিবাদ করল, এত কম খাবার দিলে হবে? এই খেয়ে কি খিদে মেটে?

সেটা দলপতিকে বলো। তার হুকুমেই দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশনকারী বলে চলে গেল।

একটু বেলায় কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। এক প্রহরী ঢুকে জিগ্যেস করল, ভাইকিং কারা?

আমরা দুজন। শাঙ্কো বলল।

চলো, দলপতি ডেকেছে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল প্রহরীদের প্রহরায় এস্তানোর ঘরের দিকে।

আধো-অন্ধকার ঘরে ঢুকল দুজনে। এস্তানো সেই একইভাবে কাঠের আসনে বসে আছে। ওদের দেখে হেসে বলল, কেমন আছ তোমরা?

ভালো নেই। আধপেটা খেতে হচ্ছে শাঙ্কো জানাল।

ঠিক আছে। খাবারের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এস্তানো বলল। তারপর যোগ করল, তোমাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আছে।

আপনার চরেরা বলেছে বোধহয়? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। তাছাড়া যে বুড়োটার সঙ্গে তোমরা কথা বলেছিলে তাকেও নিয়ে আসা হয়েছিল। সে বলেছে, তোমরা নাকি সুলতান হানিফের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডারের কথা জানতে চেয়েছিলে?

মিথ্যে কথা। আমরা জানতে চেয়েছিলাম পোর্তুগাল কতদূর। ফ্রান্সিস বলল।

উঁহু, এস্তানো মাথা নাড়ল। তোমরা সুলতান হানিফের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডারের কথা জানতে চেয়েছিল।

আমরা এই প্রথম সুলতান হানিফের নাম জানলাম। বৃদ্ধ এটুকু বলেছিল যে, দেড়শো দু'শো বছর আগে এখানে একজন সুলতান রাজত্ব করে গেছেন। সুলতানের স্বর্ণভাণ্ডার নিয়ে আমরা কিছুই জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

বিশ্বাস হচ্ছে না। এস্তানো মাথা নাড়ল।

ঠিক আছে সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করে দেব। ফ্রান্সিস বলল।

এস্তানো বেশ চমকে উঠল, দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আমি সেই স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারিনি। আর তুমি কালকে এসে বলছ পারবে!

হ্যাঁ, পারব, ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে জানাল। শাঙ্কো একবার ফ্রান্সিসের প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস এখনই এতটা নিশ্চিত হচ্ছে কেন? মৃদুস্বরে সে বলল, এতটা নিশ্চিত হয়ো না।

উপায় নেই। মুক্তি পেতে হবে। ফ্রান্সিসও তেমনি মৃদুস্বরে বলল।

বিস্ময়ের বদলে এস্তানোর মনে এবার উঁকি দিল সন্দেহ। সে বলল, তোমরা স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করে সব সোনা নিয়ে পালিয়ে যাবে!

একটা সোনার টুকরোও [illegible] না। ফ্রান্সিস [illegible]।

এবার শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, এই বন্ধু অনেক গুপ্ত ধনভাণ্ডার বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে উদ্ধার করেছে। আপনি ওকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বেশ! দেখো চেষ্টা করে। এন্তানো অবিশ্বাসের সুরে বলল।।

আমি সুলতান হানিফের কথা, স্বর্ণভাণ্ডারের কথা বিস্তৃতভাবে জানতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

তাতে লাভ?

এইসব ইতিহাসের মধ্যেই থাকে গুপ্তধনের সূত্র। আপনি বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

এন্তানো বলতে শুরু করল, সুলতান হানিফের জন্ম পারস্যে। ভাগ্যান্বেষণে মিশরে আসে। সেখান থেকে জাহাজে করে এখানে। পথে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়ে। জাহাজ লুঠ হয়। হানিফ সেই জলদস্যুদের দলে ঢুকে পড়েছিল। সেই দস্যুরা বেশ কিছু জাহাজ লুঠ করেছিল। লুণ্ঠিত বেশ কিছু জাহাজ লুঠ করেছিল। লুণ্ঠিত সোনা-হীরে-মণি-মুক্তো লুকিয়ে রাখার জন্য দ্বীপ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হানিফ চোরের ওপর বাটপাড়ি করল।

কী রকম! ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

একদিন গভীর রাতে জাহাজে রাখা ধনসম্পত্তি সব চুরি করে একটা নৌকায় চড়ে পালিয়ে গিয়েছিল হানিফ। সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ে একসময় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বেশ অর্থ ব্যয় করে ঐ পাহাড়ের নীচে বিরাট বাড়ি তৈরি করেছিল, এখন সেটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আর নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে দিল। এখানকার কালো অধিবাসীরা ওকে স্বীকারও করে নিয়েছিল।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

সুলতান হানিফের ইচ্ছে হল, সে আরো ধনী হবে। সোনার ভাণ্ডার গড়ে তুলবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে এখানকার কিছু বলশালী যুবকদের নিয়ে সে একটা লুঠেরার দল গড়ে তুলল। শক্তপোক্ত একটা জাহাজও কিনল।

তারপর এই সুমদ্রে যাতায়াতকারী জলদস্যুদের জাহাজ আক্রমণ করতে লাগল। জলদস্যুদের হারিয়ে দিয়ে সে তাদের ধনসম্পদ লুঠ করতে লাগল। যাত্রীবাহী জাহাজও বাদ গেল না। দিনে দিনে তার সংগ্রহ করা সোনা বেড়েই চলল।

এন্তানো থামল। তারপর আবার বলতে লাগল—এ কাহিনীর সঙ্গে আমার এক পূর্বপুরুষ জড়িয়ে আছে। তিনিও এন্তানো নামে পরিচিত ছিলেন। আসলে আমরা পূর্বপুরুষদের নাম বহন করি কিনা, তাই।

বলেন কি? আপনার এক পূর্বপুরুষ জলদস্যু ছিল? ফ্রান্সিস একটু অবাক হয়েই বলল।

হ্যাঁ। সেই এন্তানো জলদস্যুদের দলে ঢুকেছিলেন। পরে ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন।

অনেকে কিন্তু বংশের সঙ্গে জলদস্যুদের সম্পর্ক স্বীকার করে না। ফ্রান্সিস বলল।

আমি স্বীকার করি। যা সত্য তা জানাতে লজ্জা বা ভয় করি না।

ঠিক আছে। বলুন ফ্রান্সিস বলল।

সুলতান হানিফ একদিন ক্যাপ্টেন এন্তানোর জাহাজ আক্রমণ করে বসল। আর সেটাই হল মস্ত ভুল। ক্যাপ্টেন এন্তানোর জলদস্যুরা ছিল অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সংখ্যাতেও বেশি। হানিফ হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু তাকে বন্দী করা গেল না। বন্দিত্বের অপমান এড়াতে সে তরোয়াল বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করল। তার স্বর্ণভাণ্ডার গুপ্তই রয়ে গেল। এন্তানো থামল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, সুলতান হানিফ কি কোনো সূত্র রেখে যাননি?

সূত্র বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নয়। এসব কাহিনি আমাদের পরিবারে অনেকদিন যাবৎ চলে আসছে।

তা থেকে কিছু জানা আছে আপনার? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার জানি। কিন্তু সেটা কোনো সূত্র কিনা বলতে পারব না।

তবু আপনি বলুন। ফ্রান্সিস আগ্রহী হল।

সুলতান হানিফ আত্মহত্যা করলে তার পোশাক তল্লাশি করেছিলেন আমার পূর্বপুরুষ এক ক্যাপ্টেন এন্তানো পেয়েছিলেন একটা সাদা চামড়ার টুকরো। তাতে গোলমতো আঁকাবাঁকা রেখা। দুর্বোধ্য।

ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল। সেই চামড়ার টুকরোটা কোথায়?

আমার কাছেই আছে। ওটা দেখেই তো সন্ধান চালিয়েছিলাম।

ওটা দেখতে পারি?

দেখতে দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান পেলে সব আমার। তুমি কিন্তু কিছুই পাবে না। এন্তানো বলল।

আমি তো আগেই বলেছি। স্বর্ণভাণ্ডারের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

বেশ। তাহলে দেখো। এই বলে এন্তানো পোশাকের ভেতর থেকে চামড়ার টুকরোটা বের করে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস দেখল একটা কালচে হয়ে যাওয়া চামড়ার টুকরো। একপিঠে আঁকাবাঁকা গোলমতো দাগ। নীচে মনে হল মাত্র দুটো শব্দ আরবী অক্ষরে লেখা।

নীচে কী লেখা? ফ্রান্সিস দেখতে দেখতে বলল।

একজন আরবদেশীয় লোককে দিয়ে পড়িয়েছিলাম, সে বলেছিল ওতে নাকি দুটো শব্দ লেখা — সূর্য দর্শন।

নকশাটা দেখতে এরকম—
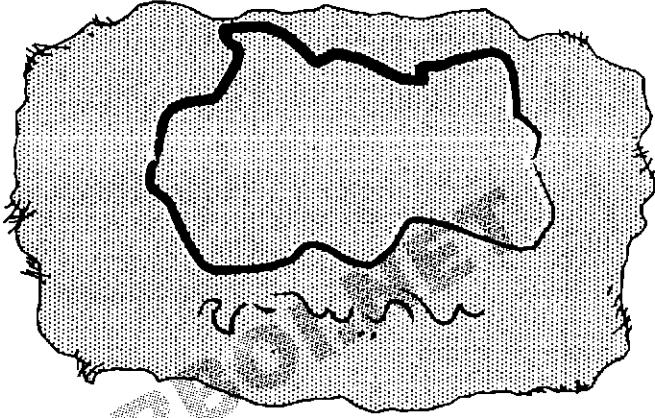
এই আঁকাবাঁকা রেখাগুলো কী মনে হয় আপনার? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

গুহামুখ এন্তানো বলল।

ঐ পাহাড়ে তাহলে একটা গুহা আছে।

হ্যাঁ। আর আছে একটা হ্রদমতো।

হ্রদ? পাহাড়ের মধ্যে? ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল।

হ্যাঁ। প্রকৃতির খেয়াল। এন্তানো বলল।

সব দেখতে হবে। নকশাটা আমি রাখব?

ঠিক আছে। ওটা হারিও না যেন।

না-না। আমি যত্ন করে রেখে দেব। এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। কোনোমতেই হারানো চলবে না। কিন্তু একটা কথা, কয়েদঘরে বসে তো এই নকশার রহস্য সমাধান করা যাবে না। আমাদের চলাফেরায় স্বাধীনতা দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

তোমরা যদি স্বর্ণভাণ্ডার খোঁজার নাম করে পালিয়ে যাও। এন্তানো বলল।

সঙ্গে দুজন সশস্ত্র প্রহরী দিন। তাহলে নিরস্ত্র আমরা পালাতে পারব না, প্রস্তাব দিল ফ্রান্সিস।

বেশ। তাহলে দুজন নয়, তিনজন সশস্ত্র প্রহরী তোমাদের পাহারা দেবে।

তাহলে আজ দুপুর থেকেই কাজে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

কোনো আপত্তি নেই। প্রহরীদের বলে দিচ্ছি। এন্তানো বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দুপুরে খেতে বসল। এবেলা খাবারের পরিমাণ বেশি। ফ্রান্সিস হাসল। শাঙ্কো বলল, তুমি হাসছ?

খাবার কত বাড়িয়ে দিয়েছে দেখেছ! সোনার লোভ বড় সাংঘাতিক।

তুমি এত নিশ্চিত হয়ে বললে, না পারলে ভীষণ বিপদে পড়ব।

আগে সব দেখি শুনি। এই চামড়ার টুকরোয় আঁকা নকশার রহস্যের সমাধান

নিশ্চয়ই করতে পারব। তাহলেই সুলতান হানিফের স্বর্ণভাণ্ডার হাতের মুঠোয়।

আজ থেকেই কাজ শুরু করবে?

হ্যাঁ। দেরি করব না। আমাদের দেরি দেখলে বন্ধুরা চিন্তায় পড়বে। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল।

খাওয়া শেষ হলে একজন প্রহরী এগিয়ে এল। সে বলল, চলো। তোমরা নাকি সোনা খুঁজতে যাবে? আমরা তিনজন তোমাদের পাহারা দেব।

হ্যাঁ। সেই কথাই হয়েছে। দুটো মশাল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে কয়েদঘরের বাইরে বেরিয়েএল। সবাই পাহাড়মুখো চলল। প্রহরীর একজনের হাতে দুটো নেভানো মশাল।

পাহাড়ের কাছে এসে গুহামুখটা দেখতে পেল ফ্রান্সিস। সে কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা চামড়ার টুকরোটা বের করল। গুহামুখের সঙ্গে মেলাল। মাথা নেড়ে বলল, এন্তানো ভুল দেখেছে। গুহামুখের সঙ্গে আঁকাবাঁকা রেখার কোনো মিল নেই।

তাহলে এই আঁকাবাঁকা রেখা কীসের? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

প্রহরীর একজন চকমকি ঠুকে মশাল দুটো জ্বালাল। তারা সবাই ঢুকল অন্ধকার গুহার ভেতরে। মশালের আলোয় দেখল চারপাশে এবড়ো-খেবড়ো পাথর। ছাদ এত নিচু যে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কিছুটা গিয়েই অবশ্য ছাঁদ উঁচু হল। তখন সোজা হয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

হঠাৎই আলোর ঝলকানি। সামনেই একটা ছোট জলাশয়। এটাকে হ্রদ বলা যায় না। তেমন বড় কিছু নয়। জলাশয়ের তীরে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকাতেই ফ্রান্সিস অবাক। ওপরটায় বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ফাঁকা। আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্য অবশ্য সরে গেছে। তবে তার আলো আসছে। তাই জলাশয় এলাকাটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপর থেকে কি অতীতে কখনও বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে পড়েছিল? তাই কি ওপরটা ফাঁকা? ফ্রান্সিসের ভাবনার মধ্যে শাঙ্কো বলে উঠল, গুহা তো এরপরেই শেষ। এখানে কি আর কিছু দেখার আছে?

না। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, এবার পাহাড়ের ওপরটা দেখব, চলো।

শাঙ্কো প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো, ওপরে ওঠা যাক।

সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পাথরে পা রেখে রেখে ওপরে উঠতে লাগল। বেশ কিছুটা উঠতেই সেই ফাঁকা জায়গাটায় এল। ফ্রান্সিস পাথরে ভর রেখে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচে জলাশয়টার দিকে তাকাল। জলাশয়টা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঠে আসবে হঠাৎ জলাশয়ের চারপাশের পাড়টা কেমন পরিচিত মনে হল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা চামড়ার টুকরোটা বের করল। আঁকাবাঁকা রেখা।

আশ্চর্য! জলাশয়ের পাড়ও তো এমনি আঁকাবাঁকা। ও আবার পাথরে ভর

রেখে ফাঁকা জায়গাটায় ঝুঁকে পড়ল। জলাশয়ের আঁকাবাঁকা পাড়টা দেখল। নকশার সঙ্গে মেলাল। হুবহু এক। জলাশয়টির পাড়ই নকশাটাতে আঁকা হয়েছে। ও গলা চড়িয়ে ডাকল, শাঙ্কো। শাঙ্কো তখন আরও ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস ওর হাতে নকশাটা দিল। বলল, ঝুঁকে পড়ে নীচের জলাশয়টার দিকে তাকাও। দেখ ওটার আঁকাবাঁকা পাড়ের সঙ্গে নকশার আঁকাবাঁকা রেখা মেলে কিনা!

শাঙ্কো পাথরে ভর রেখে ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে জলাশয়টার দিকে তাকাল। তারপর নকশাটা বের কর জলাশয়ের আঁকাবাঁকা পাড়ের সঙ্গে মেলাল। ও অবাক হয়ে গেল। দুটো হুবহু মিলে যাচ্ছে। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলল, ও হো হো—

ফ্রান্সিস হেসে ভাইকিংদের ভাষায় বলল, ঐ জলাশয়েই আছে সুলতান হানিফের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার।

—কিন্তু সূর্য দর্শন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

তার মানে সূর্য যখন মাথার ওপরে আসবে, উজ্জ্বল রোদ পড়বে, নীচে জলাশয় স্পষ্ট দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে কী করবে এখন?

ফিরে যাব। এখন সূর্য সরে গেছে।

জলাশয়ের জলে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাবে না। কাল জলাশয়ে নামব যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকবে।

ফিরে আসার সময় ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে বলল, তোমাদের দলপতি এন্তানো তো আমাদের জাহাজে যেতে পারবে না। অথচ প্রায় কুড়ি হাত লম্বা শক্ত দাড় চাই। তোমরা দিতে পারবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কয়েদঘরেই দড়ি রাখা আছে। প্রহরীটি জানাল।

প্রহরীদের সঙ্গে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ফিরে এল।

শাঙ্কো, দেখো তো এখানে দড়ি আছে কিনা। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়তে পড়তে বলল। শাঙ্কে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দড়ি পেল। দড়িটা টেনেটুনে বুঝল শক্ত দড়ি। ওরা অভিজ্ঞ, সহজেই দড়ি কত শক্ত বুঝতে পারে।

পরদিন দুজনে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। তারপর প্রহরীদের পাহারায় ওরা যখন জলাশয়ের ধারে পৌঁছল তখন সূর্য প্রায় মধ্যগগনে।

ওরা অপেক্ষা করতে করতেই সূর্য ফাঁকা জায়গাটার মাথায় এল। চড়া রোদ পড়ল জলাশয়ে।

শাঙ্কো দড়ি চেপে ধরল। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে জলাশয়ে নামল। জলের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারদিক।

এবার চিন্তা—কোথায় থাকতে পারে সেই গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার। ফ্রান্সিস এবড়ো খেবড়ো পাথুরে দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে দেখে দেখে খুঁজতে লাগল কোনো গোপন গহ্বর পায় কিনা।

হঠাৎ কী যেন সাঁৎ করে সরে গেল।

ফ্রান্সিস ঘুরে তাকাল। হাঙর! ভীষণভাবে চমকে উঠল ফ্রান্সিস। দড়ি ধরে সে মারল এক হ্যাঁচকা টান। ওপরে শাঙ্কো তার সংকেত পেয়ে তাড়াতাড়ি দড়িটা গোটাতে শুরু করল। ফ্রান্সিস দড়িটা দু'পায়ে জড়িয়ে ধরল, ফলে দড়ির সঙ্গে সেও উঠতে লাগল ওপরে। ওদিকে হাঙরটা ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস প্রায় তখন পৌঁছে গেছে। সে এক লাফ দিয়ে পাড়ে উঠে পড়ল। ভয়ে উত্তেজনায় সে তখন হাঁপাচ্ছে।

কী হল, লাফিয়ে উঠে পড়লে যে? শাঙ্কোর স্বরে রাজ্যের বিস্ময়।

হাঙর, কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল ফ্রান্সিস।

বলো কী? এখানে! শাঙ্কো স্তম্ভিত।

হ্যাঁ। দেখছো না সমুদ্র একেবারে পাহাড়ের ধারেই। নিশ্চয় এই জলাশয়ের সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে।

নির্ঘাত আছে, নইলে এখানে হাঙর আসবে কোথা থেকে? তা এখন কী করবে?

আবার নামব। হাঙরটাকে মারতে হবে। প্রহরীদের কাছ থেকে একটা তরোয়াল চেয়ে আনো।

শাঙ্কো প্রহরীদের কাছে গিয়ে হাঙরের ব্যাপারটা বলল। শুনে তারাও কম আশ্চর্য হল না। তারপর যখন শুনল ফ্রান্সিস তরোয়াল নিয়ে জলে নামবে তখন তাদের মুখে আর কথা যোগায় না। এই বিদেশিটা জলের মধ্যে একা হাঙরের সঙ্গে লড়াই করবে? সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে একজন তার তরোয়াল তুলে দিল শাঙ্কোর হাতে।

তরোয়াল পেয়ে আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস। আস্তে আস্তে নামতে লাগল নীচে। দাঁত দিয়ে তরোয়াল চেপে ধরে আছে। ওই তো হাঙরটা! দড়ি ছেড়ে এবার হাত ও পায়ে আস্তে জল ঠেলে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল সে। ভয়াল বিভীষিকা তার চারপাশে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এক কোনার দিকে গিয়েই সেটা ছুটে এল ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে। হাঙরটা যে এভাবে আক্রমণ করবে ফ্রান্সিস সেটা আগেই আঁচ করেছিল তাই সে দ্রুত জল ঠেলে আরও কিছুটা নীচে নেমে গেল। তরোয়াল নিল হাতে। হাঙর তখন তার মাথার ওপর এসে গেছে। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে তরোয়ালটা হাঙরের পেটে ঢুকিয়ে দিল। নরম শরীর ভেদ করে সেটা প্রায় অর্ধেকটা ঢুকে গেল। জল উঠলো লাল হয়ে। ফ্রান্সিস তরোয়াল টেনে বার করেই দড়ি ধরে ঝাঁকানি দিতে শুরু করল। শাঙ্কো তৈরি ছিল। তাড়াতাড়ি দড়ি টেনে ফ্রান্সিসকে তুলে নিল ওপরে।

হাঙরটা মরেছে? শাঙ্কো জিগেস করল।

এখুনি মরবে। ওর হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছি। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল।

এখন কি ফিরে যাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস ওপারের দিকে তাকাল। সূর্য সরে গেছে। তবে উজ্জ্বল রোদ এখনও আসছে। না। আবার নামব। এখনও আলো আছে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফ্রান্সিস আবার দড়ি ধরে জলে নামল। নীচে নামতেই দেখল তিনটে হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বড়, দুটো ছোট। মৃত হাঙরের চিহ্নমাত্র নেই। ওরা খেয়ে ফেলেছে।

ফ্রান্সিসকে আবার ওপরে উঠে আসতে হল। শাঙ্কো বলল, কী হল, উঠে এলে যে?

ফ্রান্সিস বলল তিনটে হাঙর এসেছে। এখন আর নামা যাবে না। আলোও কমে আসছে। ফিরে চলো। কালকে এ সময় আসতে হবে।

দড়ি তুলে নিয়ে ওরা ফিরল।

জলের লাল রং দেখে প্রহরীরা বুঝেছিল হাঙরটা তরোয়ালের ঘা খেয়ে মারা গেছে। ওরা বেশ সমীহ নিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখতে লাগল। একা একটা তরোয়াল দিয়ে হাঙর মেরে ফেলল?

বিকেলের দিকে এন্তানো কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। ফোকর দিয়ে তাকিয়ে বলল, ওখানে জলে নাকি হাঙর আছে।

হ্যাঁ। একটাকে মেরেছি। এখনও তিনটে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

বুঝেছি। সমুদ্রের সঙ্গে এই জলাশয়ের যোগ আছে। একটা সুড়ঙ্গ মতো আছে সমুদ্রের দিক থেকে।

এটা আগে বলেননি।

তুমি ঐ জলাশয়ে নামবে তা তো আমি জানতাম না। যাক গে, স্বর্ণভাণ্ডারের হদিস পেলে কিছু?

এখনও সন্ধান পাইনি। কালকে যাব। দেখি।

দেখো চেষ্টা করে। তোমাদের মাংস-টাংস খেতে দিতে বলেছি। এন্তানো হেসে বলল।

হ্যাঁ। এখন খাবারটাবার ভালোই পাচ্ছি। শাঙ্কো বলল।

এন্তানো চলে গেল।

ফ্রান্সিস ডাকল, শাঙ্কো!

বলো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

এন্তানো ভালো করেই জানে ঐ জলাশয়ে হাঙর আসে। হয়তো সারা পাহাড় খুঁজেছে। কোনো হদিস না পেয়ে কতকটা আন্দাজে ঐ জলাশয়ে লোকজন নামিয়েছিল। হাঙরের মুখ থেকে কেউ বেঁচে ফেরেনি। এন্তানো সব জানে। শুধু জানে না গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার কোথায় আছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

পরের দিন ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। আবার প্রহরীদের পাহারায় চলল পাহাড়ের দিকে।

গুহার কাছে এসে এবার ফ্রান্সিস ভালোভাবে চারদিকে দেখল। পাহাড়ের বাঁপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। সুড়ঙ্গ থাকলে ওখানেই আছে। ডানপাশে সুলতান হানিফের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ওরা গুহায় ঢুকল। মাথা নিচু করে কিছুটা জায়গা পার হল। সামনেই জলাশয়। এখানে আলো আছে।

শাঙ্কো দাঁড়ির একটা মাথা জলে ফেলে অন্য মাথাটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে বলল, শাঙ্কো, তুমি একা ঠিক পারবে না। ওদেরও সময়মতো দড়ি ধরে টানতে বলো।

শাঙ্কো প্রহরীদের কাছে ডাকল। তিনজন এগিয়ে এলে শাঙ্কো বলল, আমি বললে দড়ি ধরে টানতে শুরু করবে।

আবার তোমার বন্ধু হাঙরের পাল্লায় পড়বে নাকি? একজন প্রহরী বলল

দেখা যাক। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল। তারপর দড়ি ধরে জলে নামল। সূর্যের আলো তখন সরাসরি জলাশয়ের ওপর পড়ল। ফ্রান্সিস ডুব দিয়েই দেখল হাত কয়েক দূরে হাঙর তিনটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিল। চারজন মিলে দড়ি টানতে লাগল। ফ্রান্সিস এবার বেশ দ্রুতই উঠে এল।

এখনও হাঙর আছে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

হ্যাঁ। তিনটেই আছে।

কী করবে?

ওগুলোকে এখান থেকে তাড়াতে হবে।

কী করে?

ফ্রান্সিস শক্ত পাথরের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, ভাবছি।

কিছু পরে ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল, ছক কষা হয়ে গেছে। ও একজন প্রহরীকে বলল, আমরা তো বন্দী। তুমি বাজার এলাকা থেকে মাংস নিয়ে এস।

কীসের মাংস?

শুয়োর, ঘোড়া, ভেড়া—যে কোনো মাংস। তিনটে ঠ্যাং আনবে। ফ্রান্সিস বলল।

দাম? প্রহরী হাত বাড়াল।

শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। প্রহরীরা স্বর্ণমুদ্রা দেখে একটু অবাকই হল। একজন প্রহরী চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে প্রহরী তিনটে ভেড়ার ঠ্যাং নিয়ে এল। ফ্রান্সিস ঠ্যাং তিনটে নিয়ে বলল, চলো, সমুদ্রের দিকে যাব।

সবাই চলল। পাথরের ওপর পা রেখে রেখে সবাই সমুদ্রের ধারে এল। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে ভেঙে পড়ছে। জল ছিটকে উঠছে। ফ্রান্সিস ঠ্যাং তিনটে কোমরে গুঁজল।

তারপর জলাশয় কোন দিকটায় সেটা বুঝে নিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। জলের তলাটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পাথরের গা। ডুব সাঁতার কাটতে গিয়ে হঠাৎই দেখল একটা প্রায় গোল মুখমত। ও বুঝল এখান দিয়েই সুড়ঙ্গের শুরু। জলের ওপর ভেসে উঠল ফ্রান্সিস। একটু দুরেই প্রহরীরা আর শাঙ্কো দাঁড়িয়ে আছে। বুকভরে দম নিয়ে ফের ডুব দিল। প্রায় অন্ধকার গুহামুখ দিয়ে ঢুকে পড়ল। দ্রুত জল ঠেলে ডুব সাঁতার দিয়ে সুড়ঙ্গের অনেকটা ভেতরে ঢুকে

গেল। তারপর কোমরের ফেট্টি থেকে তিনটে ঠ্যাং বের করে একটু দূরে দূরে ঠ্যাংগুলো সুড়ঙ্গের এবড়ো-খেবড়ো মেঝেয় রেখে দিল।

দম ফুরিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ডুব সাঁতার কেটে সুড়ঙ্গমুখে ফিরে এল। তারপর জল ঠেলে ওপরে ভেসে উঠল খোলা হাওয়ায়। মুখ হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল সে।

একটু ধাতস্থ হতে ধীরে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগিয়ে গেল ফ্রান্সিস। তীরের পেছল পাথরে পা রেখে রেখে উঠে এল।

ফ্রান্সিস, ঠ্যাং তিনটে কী করলে? শাঙ্কো বলল।

সুড়ঙ্গের মধ্যে রেখে এসেছি মাংসের গন্ধে এবার হাঙর তিনটে ওখানে চলে আসবে। তখন জলাশয় নিরাপদ। চলো, গুহার মধ্যে যাই। মাথার ওপর সূর্য থাকতে থাকতে জলাশয়ে নেমে খোঁজ শেষ করতে হবে।

সবাই গুহামুখ দিয়ে আবার জলাশয়ের কাছে এলো।

একটু বিশ্রাম করে নাও। শাঙ্কো বলল।

না-না, আলো চলে যাবে। দড়ি ধর ফ্রান্সিস বলল।

আবারও ফ্রান্সিস দড়ি ধরে জলাশয়ের জলে নামল। জলের মধ্যে দেখল হাঙর তিনটে নেই। দেরি করা যাবে না। যদি ওরা মাংস খাওয়া শেষ করে ফিরে আসে।

ফ্রান্সিস জল ঠেলে একেবারে নীচে নেমে এল। পাথুরে দেয়াল ধরে ধরে ডুব সাঁতার দিয়ে চলল।

না! পাথর ছাড়া কিছু নেই।

জল ঠেলে ওপরে উঠল। হাঁ করে শ্বাস ফেলল। দম নিল। আবার ডুব দিল। এবার অন্যদিকে। হাতড়ে চলল পাথরের দেয়াল।

হঠাৎ একটা প্রায় চৌকোনো পাথর হাতে ঠেকল। ফ্রান্সিস পাথরটা ধরে টানল। নড়ল পাথরটা। আবার প্রাণপণ জোরে টানল। চৌকোনা পাথর সবটা খুলল না।

খোঁজ পেলে? শাঙ্কো বলে উঠল।

প্রায়।

দম নিয়ে আবার ডুব দিল ফ্রান্সিস দ্রুত চৌকোনা পাথরের কাছে এল। আবার প্রাণপণে টানল। পাথরটা এবার খুলে এল। প্রায় অন্ধকার খোঁদল একটা। ভালো করে তাকাতে দেখল খোদলভর্তি সোনার চাকতি। অল্প আলোতেও চকচক করছে। ও দ্রুত হাতে দু'মুঠো সোনার চাকতি তুলে নিল। কোমরের ফেট্টিতে চেপে চেপে গুঁজতে গুঁজতে ওপরে উঠে আসতে লাগল।

দম ফুরিয়ে এসেছে। দ্রুত জল ঠেলে ওপরে উঠে আসতে লাগল। তখনই আবছা দেখল বড় হাঙরটাকে।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। হাঙরটা যে ছুটে আসছে! দড়িতে জোর হ্যাঁচকা টান দিল সে। ওপর থেকে শাঙ্কো আর প্রহরীরা দড়ি ধরে প্রাণপণে টেনে ওকে

তুলতে লাগল। হাঙরও ধেয়ে আসছে পিছন পিছন। একেবারে শেষ মুহূর্তে তার দাঁতের ঘষা লাগল ফ্রান্সিসের হাঁটুতে। মাংস খুবলে এল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ততক্ষণে ওরা জল থেকে টেনে তুলে ফেলেছে ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিস পাড়ে উঠে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো ঝুঁকে পায়ের ওপর পড়ল। দরদর করে রক্ত পড়ছে ক্ষত দিয়ে। ফ্রান্সিস ডান হাতটা কপালের ওপর রেখে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল।

শাঙ্কো নিজের কোমরের ফেট্টি খুলে ফেলল। ছোরাটা পড়ে গেল। খুঁড়িয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজে নিল। পাথরের ওপর টং টং শব্দ করে সাত-আটটা স্বর্ণমুদ্রা পড়ে গেল। একটা গড়িয়ে গেল জলে। শাঙ্কোর সেদিকে খেয়াল নেই। ও ক্ষতস্থানে ফেট্টিটা চেপে ধরল। রক্ত পড়া একটু বন্ধ হল। শাঙ্কো এবার ফেট্টিটা হাঁটুতে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধল। ফ্রান্সিস একটু ককিয়ে উঠল। শাঙ্কো গড়িয়ে পড়া সোনার চাকতি ক'টা কোমরে গুঁজল।

শাঙ্কোর আর জিগ্যেস করতে মন হল না ফ্রান্সিস স্বর্ণভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছে কিনা। সে তখন আহত ফ্রান্সিসকে নিয়ে উদ্বেগে কাতর। প্রহরীরাও এই আকস্মিক ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

শাঙ্কো কোলের ওপর ফ্রান্সিসের মাথা তুলে নিল। ফ্রান্সিস চোখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করছে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। মুখে কথা নেই। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। তবু ওর চোখ দিয়ে জল পড়ল না। ও কাঁদলে ফ্রান্সিসের মন দুর্বল হয়ে পড়বে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে তিনটে সোনার চাকতি বের করল। হেসে আস্তে আস্তে দুর্বলস্বরে বলল, শাঙ্কো, সুলতান হানিফের—স্বর্ণভাণ্ডারের—সন্ধান-পেয়েছি।

ওসব কথা থাক। এখন কোনো কথা বলো না। কষ্ট বাড়বে। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে শাঙ্কো বলল।

চোখ খুলে ফ্রান্সিস ওপরের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকাল। মৃদুস্বরে বলল, সূর্যদর্শন।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে বলল, জাহাজে চলো। ফ্রান্সিস আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, না। এন্তানোর কাছে চলো। স্বর্ণভাণ্ডারের হদিসটা দিয়ে আসি।

বেশ চলো। হেঁটে যেতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

দেখি। চেষ্টা করি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে বসল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের ডান হাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

সবাই চলল। গুহার-এবড়ো-খেবড়ো মেঝের ওপর দিয়ে আহত ফ্রান্সিসের হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। শাঙ্কো প্রহরীদের বলল, ভাই তোমরাও ওকে ধরো। প্রহরীরা দুজন এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে সবাই আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। চলল এন্তানোর বাড়ির দিকে।

বেশ সময় লাগল ওদের পৌঁছতে কয়েদঘরের সামনে এলে একজন প্রহরীকে ফ্রান্সিস বলল, এন্তানোকে খবর দাও। প্রহরীটি চলে গেল।

এন্তানো প্রহরীটির কাছেই সব শুনেছিল। প্রায় ছুটে এল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব চলল। এন্তানো খুব খুশি। এবার শাঙ্কো বলল, আমরা জাহাজে ফিরে যাব। আপনার দুজন প্রহরীকে সঙ্গে যেতে বলুন।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। এন্তানো বলে উঠল। যে দুজন প্রহরী ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের বলল, ওদের জাহাজে পৌঁছে দিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে বেশ কিছু সোনার চাকতি আস্তে আস্তে বের করল। সেগুলো এন্তানোর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এই নিন। এন্তানো লাফিয়ে এগিয়ে এল। শাঙ্কোও পোশাকের মধ্যে থেকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো রেখে সোনার চাকতিগুলো এন্তানোর হাতে দিল। এন্তানো খুশিতে প্রায় লাফাতে লাগল।

ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে সবাই চলল। জাহাজঘাটের দিকে। ফ্রান্সিস খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

পথে শাঙ্কো লক্ষ্য করল ফ্রান্সিসের পায়ে বাঁধা ফেট্টির কাপড়টা রক্তে ভিজে উঠেছে। রক্ত-পড়া বন্ধ হয়নি।

শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরীদের বলল, কাঁধে করে নিয়ে চলো। বেশ রক্ত পড়ছে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। রক্ত পড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়বে।

না না, হেঁটে যেতে পারব। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

চুপ করে থাকো। শাঙ্কো প্রায় ধমকের সুরে বলল। তিনজনে ফ্রান্সিসকে কাঁধে তুলে নিল।

শেষ বিকেলে জাহাজঘাটে পৌঁছল ওরা। পাটাতন দিয়ে উঠছে, হ্যারি রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। ও চেঁচিয়ে উঠল, এসো সবাই। ফ্রান্সিস আহত।

বন্ধুরা ছুটে এল ডেক-এ। হ্যারির কথা মারিয়া অস্পষ্ট শুনল। ও বুঝল না ঠিক কী হয়েছে। ও এ সময় সূর্যাস্ত দেখতে যায়। তাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তখনই ফ্রান্সিসের বন্ধুদের গুঞ্জন শুনল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আহত ফ্রান্সিসকে কাঁধে নিয়ে বন্ধুরা দরজার সামনে এল। মারিয়া কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে বিছানায় শুইয়ে দিল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের রক্তমাখা পা দেখে মারিয়া হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ফ্রান্সিস তাকে অভয় দিয়ে বলল,

কেঁদো না। সামান্য কেটেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাব। একথায় মারিয়া সান্ত্বনা পেল না। ও একইভাবে কাঁদতে লাগল।

ততক্ষণে শাঙ্কো ভেনকে ডেকে এনেছে। ভেন ওর বদ্যি-ঝোলা ও বয়াম নিয়ে এসে লেগে পড়ল ফ্রান্সিসের চিকিৎসায়। শাঙ্কো, বিস্কো, সিনাত্রা ফ্লেজার আর সব বন্ধুরা নিশ্চুপ হয়ে দেখতে লাগল। মনে মনে বিশ্বাস, ভেন থাকতে ফ্রান্সিসের বিপদ হবে না। ও ঠিক সেরে উঠবে। সূর্য বিদায় নিলেও কাল নতুন আশার আলো নিয়ে সে উদয় হবে। বন্ধুরা সব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল।

——